গোবিন্দ দাসের করচা

গোবিন্দ দাসের করচা

[illegible]ব সংস্করণ)

রায়বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডি. লিট., কবিশেখর,

এবং

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল গোস্বামী

সম্পাদিত

"The supplement is an excellent specimen of literary controversy in which Dr. Sen convincingly champions the authenticity of the Karcha by Govinda Das."
From a review of Dr. Sen's "Glimpses of Bengal" in Luzac's Oriental List. London, January—March 1926.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৯২৬

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুথিশালার প্রায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলের পুথি—নং ৫০৩।
পঞ্চম ছত্রের ডান দিকে চৈতন্য-সহচর গোবিন্দ-কর্ম্মকারের নাম আছে।

প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যে গোবিন্দ দাসের উল্লেখ।

"নীলাচল উদ্ধারিয়া, গোবিন্দরে সঙ্গে লৈয়া, দক্ষিণদেশেতে যাব আমি।"

৩৭৫ বৎসরের প্রাচীন কবি বলরামদাসের পদ।

গৌরপদতরঙ্গিনী, সাহিত্যপরিষৎ সংস্করণ, ৪০৪ পৃঃ।

"মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্ম্মকার। মোর সঙ্গে আইসহ কাটোআ গঙ্গাপার॥"

৪০০ বৎসরের প্রাচীন জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল।

সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ, বৈরাগ্যখণ্ড, ৮৩ পৃঃ।

"নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, সংহতি। গোবিন্দ পশ্চাতে আগে কেশব ভারতী॥"

৪০০ বৎসরের প্রাচীন বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্য, দ্বিতীয়।

"তারপর নিত্যানন্দ, গদাধর সঙ্গে। ভারতীকে লইয়া চলিলেন নানা রঙ্গে॥

পিছনে পিছনে আমি খড়ি লয়ে যাই।" করচা ১২ পৃঃ।

"সুনি শ্রীগোবিন্দ আনন্দিত হঞা। অদ্বৈতের স্থানে চলে মনেতে চিন্তিঞা॥"

প্রেমদাস কর্ত্তৃক ১৬৩৪ শকে রচিত চৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় ২১৪৫ নং পুথি, ১৪৮ পত্র।

উৎসর্গ

যে শিবকল্প পুরুষবরের জটিল সাধনা-বিমুক্ত
ভগবৎ প্রেম
নবদ্বীপধামকে দ্বিতীয় হরিদ্বারে পরিণত করিয়া
মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল,
ভক্তি-সুসমাচারের অগ্রদূত—মাধবেন্দ্র পুরীর প্রিয় শিষ্য—
সেই জগৎ পাবন শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর
বংশধর
অশেষ নিগ্রহ ও অকৃতজ্ঞতা-লাঞ্ছিত, সত্যে প্রতিষ্ঠিত,
প্রভুপাদ স্বর্গীয় জয়গোপাল গোস্বামী মহাভাগ,
—যিনি তদীয় পুণ্যশ্লোক পিতৃপুরুষের
ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া
ভক্তিগঙ্গার ক্ষুদ্র শাখাস্বরূপ—বিস্মৃতির বালুকাস্তরে
লুক্কায়িত—গোবিন্দ দাসের করচা
আবিষ্কার পূর্ব্বক গৌরাঙ্গ-ঠাকুরের নরলীলার
চিত্রালেখ্য উন্মোচন করিয়া দেখাইয়াছেন,—
তাঁহারই পবিত্র নামে
করচার এই নব সংস্করণ খানি
উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন

———

গোবিন্দ দাসের করচা উদ্ধারের ইতিহাস

প্রায় ৪৫ বৎসর গত হইল একদিন শান্তিপুর নিবাসী কালিদাস নাথ কয়েক খানি বৈষ্ণব গ্রন্থ (পুথি) আমার পিতৃদেব ৺জয়গোপাল গোস্বামীর নিকট লইয়া আসেন *। এই পুস্তকগুলির মধ্যে একখানি 'গোবিন্দদাসের করচা' ও একখানি 'অদ্বৈত বিকাশ' গ্রন্থ ছিল। বাবা এই দুইখানি পুস্তক অপ্রকাশিত প্রাচীন পুস্তক মনে করিয়া পড়িবার নিমিত্ত গ্রহণ করেন। কালিদাস প্রথমতঃ পুস্তক দুইখানি প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করেন, পরে বাবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কয়েক দিনের জন্য প্রাচীন পুথি দুইখানি তাঁহার নিকট রাখিয়া যান। পিতৃদেব অতি সত্বর লিখিতে পারিতেন, তিনি কয়েক দিনের মধ্যে এই পুথি দুইখানি নকল করিয়া ফেলেন।

কয়েক বৎসর পরে পিতৃদেব ঐ পুথির দুই তিনটি ফরমা (তাঁহার স্বহস্তলিখিত) শিশির বাবুর নিকট লইয়া আসেন। শিশির বাবুর সঙ্গে বাবার পুর্ব্বে আলাপ ছিল না। তিনি পরম গৌরাঙ্গ-ভক্ত একথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে দেখাইবার নিমিত্ত উৎসুক হন। যে আম খাইতে ভাল বাসে এবং আমের মর্য্যাদা উপলব্ধি করে, তাহাকে আম খাওয়াইবার নিমিত্ত বাগানের মালিক ব্যগ্র হইয়া উঠে। গোস্বামী মহাশয় শিশিরকুমারকে গৌরাঙ্গপ্রেমরসের রসিক মনে করিয়াই তাঁহার নিকট এই চৈতন্যগুণগাথা লইয়া গিয়াছিলেন। শিশির বাবুগুণ-গ্রাহী ছিলেন, তিনি করচার কয়েক পৃষ্ঠা পড়িয়াই মুগ্ধ হন। এবং পিতৃদেবকে সমস্ত পুথিখানি তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু পিতৃদেব বলেন 'আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, এই পুস্তক খানি নিজেই প্রকাশ করিব সঙ্কল্প করিয়াছি। আমার কোন কোন গৌরাঙ্গ-ভক্ত সুপণ্ডিত বন্ধু বলেন, এই পুস্তক প্রকাশ করিলে কিছু অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা।' শিশির বাবু তদুত্তরে বলেন 'তবে ইহা আপনিই প্রকাশ করুন। যে কয়েক পৃষ্ঠা আপনি আনিয়াছেন, তাহা রাখিয়া যান। আমি পড়িয়া সাত দিনের

---

* এক খানি চিঠিতে বনোয়ারীলাল আমাকে আরও কয়েকটি কথা বেশী লিখিয়াছেন—তাহা এই "আমার মনে আছে কালিদাস বলিয়াছিলেন 'করচার ভাষা অতি নির্ম্মল, কোথাও অতিরঞ্জিত হয় নাই, প্রসাদগুণে পুস্তকখানি পূর্ণ। একে প্রাচীন অপ্রকাশিত গ্রন্থ, তাহার উপর ভাষার সারল্য-তারল্য, ইহা পিতৃদেবকে একান্ত আকৃষ্ট করিল। তখনই গোবিন্দদাসের করচায় অধ্যয়ন আরম্ভ হইল। কয়েক পৃষ্ঠা অধ্যয়নের পরই স্বর্গীয় মদন গোস্বামী মহাশয় সে স্থানে উপস্থিত হইলেন, বাবা আগ্রহের সহিত বলিলেন "মদন, এক অপূর্ব্ব পুস্তক—আবার গোড়া হইতে পড়ি, শুনিয়া যাও।"

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

মধ্যে ইহা আপনাকে রেজেষ্টারী ডাকে পাঠাইয়া দিব।' সাত দিন আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। যথাসময়ে পুস্তক আসিল না। বাবা একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কারণ এই ঘটনার ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে আদত পুথিখানি তিনি কালিদাস নাথকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। বাবা শিশির বাবুকে কয়েক খানি পত্র লিখেন। শিশির বাবু ছিলেন কাজের লোক। বহু কাল উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া অবশেষে নিরাশ হইয়া তিনি স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়া শিশির বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। শিশির বাবু বাবাকে দেখিবা মাত্র বলেন 'আপনার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই, আপনার নিকট বিশেষ লজ্জিত। আমি গোবিন্দ দাসের করচার সেই কয়েক পৃষ্ঠা শম্ভু বাবুকে পড়িতে দিয়াছিলাম, তিনি উহা হারাইয়া ফেলিয়াছেন।' বাবা বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন এবং কালিদাস নাথের নিকট প্রাচীন পুথিখানি পুনরায় পাইবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু কালিদাস নাথ বলিলেন 'আমি যাঁহার নিকট হইতে এই পুস্তক খানি আনিয়াছিলাম, তাহা তাঁহাকে ফেরৎ দিয়াছি, তাহা ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা নাই।'

ইহার কিছু দিন পরে বাবা জানিতে পারিলেন শান্তিপুরের পাগলা গোস্বামীদের বাড়ীতে হরিনাথ গোস্বামীর নিকট গোবিন্দদাসের করচার আর এক খানি পুথি আছে। ঐ পুথিখানি অত্যন্ত পাঠ বিকৃতি দোষে দুষ্ট এবং অসম্পূর্ণ ছিল। পিতাঠাকুর মহাশয়ের নিকট যে কিছু কিছু নোট ছিল, তাহার সহিত ঐ পুথির লেখা মিলাইয়া কষ্টে সৃষ্টে নষ্ট পত্রগুলির পুনরুদ্ধার করা হয়, পরে সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারির অধ্যক্ষদিগকে এই পুস্তক প্রকাশ করিতে দেওয়া হয়। গোবিন্দ দাসের করচা এই ভাবে ১৮১৭ শকে (১৮৯৫ খৃঃ) প্রকাশিত হয়।

শিশির বাবু গোবিন্দ দাসকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল প্রকাশিত হইবার পরে সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিল যে গোবিন্দ কায়স্থ ছিল না, মুদ্রিত পুস্তকে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই, অর্থাৎ খাটি 'কর্ম্মকার'। এই ব্যাপারে শিশির বাবু কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন কিনা, বলিতে পারি না। পিতৃদেব তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া পুস্তক খানি তাঁহার হাতে অর্পণ করিতে পারেন নাই, ইহাতেও সম্ভবত তিনি কিছু ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। যে কোন কারণেই হউক তিনি গোবিন্দ-দাসের মুদ্রিত করচার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠার মৌলিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বে ও অমিয়-নিমাইচরিতের মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করচাকে অবলম্বন করিয়াই লিখিয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ভ্রাতা মতিবাবু শ্রীবিষ্ণু পত্রিকায় করচার গুণগরিমা ও ঐতিহাসিকত্ব বারংবার কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ নানাবিধ জটিল কারণে প্রথম কয়েক কয়েক পৃষ্ঠা সম্বন্ধে যে একটু সন্দেহ জন্মিয়াছিল, এখন বহু দিন পরে তাহাই সমগ্র পুথি খানিকে অগ্রাহ্য করিবার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অমৃত বাজার হইতেই এই আন্দোলন সুরু হইয়াছিল।

করচাখানি প্রকাশ-কল্পে পণ্ডিতকুলাগ্রগণ্য শান্তিপুর নিবাসী পরম ভাগবত ৺ মদন গোপাল গোস্বামী মহাশয় বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। তখন অনেকেই প্রাচীন পুথিখানি দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন। স্থানান্তরে রায় বাহাদুর শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং পণ্ডিতপ্রবর লক্ষ্মীকান্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পত্র মুদ্রিত হইল। ইহাঁরা স্বচক্ষে সেই প্রাচীন পুস্তকখানি দেখিয়াছিলেন। আমি স্বর্গীয় জয় গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার বয়স এখন ৭০। কিছু কালের জন্য প্রাচীন পুঁথি খানি আমাদের বাড়ীতে ছিল। আমি ও তাহা দেখিয়াছিলাম।

গোবিন্দদাস কায়স্থ কিম্বা কর্ম্মকার হউক, আমাদের তাহাতে কোন স্বার্থ নাই। এই পুস্তকে দক্ষিণাপথের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে, তাহা আজীবন কেহ দক্ষিণাত্য ঘুরিয়া না আসিলে কল্পনা করিতে পারে না। যে সকল গ্রামের উল্লেখ আছে তাহার কোন কোনটি সার্ভে আফিসের ম্যাপে পর্য্যন্ত উল্লিখিত নাই। যাঁহারা আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবকে নিতান্ত অন্যায় ভাবে আক্রমণ করিতেছেন, এবং প্রতারক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিতে-ছেন তাঁহাদের এই ঘোর বৈষ্ণব নিন্দাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই। এইরূপ অন্যায় এবং মিথ্যা অভিযোগে যে আমাদের অন্তঃকরণে কি কষ্ট হইতেছে, তাহা আর কি লিখিব ?

পুস্তকের কোন কোন স্থানে প্রাচীন জটিল শব্দ তিনি সম্পাদন কালে পরিবর্ত্তন করিয়া ছিলেন। হয়তঃ কখনও কোন কীটদষ্ট ছত্রাংশ লুপ্ত হওয়াতে তাহা তিনি পূরণ করিয়াছেন ! প্রাচীন পুথি সম্পাদন কালে সকলেই এইরূপ করিয়া থাকেন॥

আমি যাহা লিখিলাম, তাহা সরল সত্য। এই ঘোর কলিযুগে রাত্রিকে দিন প্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষীর অভাব হয় না। সুতরাং এরূপ প্রমাণও আসিতেছে যে পুথিখানি জাল করিবার অপরাধে আমরা 'এক ঘরে' হইয়াছিলাম। আমাদের সমাজ যদি আজ এত বড় জাগ্রত হইত তবে দেশের দুর্দ্দিন কাটিয়া যাইত। জ্ঞাতি বিরোধে এ দেশে কতই না কাণ্ড হইতেছে। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যাঁহারা আমাদিগের প্রতি এই সকল অত্যাচার করিতেছেন, তাঁহাদিগকে যেন তিনি মার্জ্জনা করেন।

কোথায় সেই বৈষ্ণব বিনয় আর কোথায় সেই ভক্তির উচ্ছ্বাস ? চৈতন্যকে আমার পূর্ব্বপুরুষ অদ্বৈতাচার্য্য কঠোর সাধনা দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন। চৈতন্য আমাদের বংশের আত্মীয় হইতে ও আত্মীয়—আমাদের বংশের ধ্যান ও ধৃতি। চৈতন্যকে হীনপ্রভ তুমি করিতে পার, কিন্তু অদ্বৈতের বংশধর এমন কাজ করিতে কখনই ধাবিত হইবে না। করচার মধ্যে এমন কোন স্থান নাই, যাহা গৌর-গরিমার হন্তারক। তাহা হইলে পিতৃদেব এই করচা প্রকাশ করিতেন না।

শ্রীবনোয়ারী লাল গোস্বামী।

ভূমিকা

ভূমিকা

১। করচার প্রাচীন পাণ্ডুলিপি

এই পুস্তকের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বনোয়ারী লাল গোস্বামী মহাশয় করচা সংগ্রহের বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। তাঁহার রচিত 'খিচুড়ি' 'পোলাও' প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। গোস্বামী মহাশয়ের বয়স এখন ৭০। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা ইঁহার সরল প্রকৃতি ও তেজস্বিতা সম্বন্ধে অবহিত আছেন। কঠোর সত্য কথা বলিতে যাইয়া তিনি সময় সময় মনুক্ত সাবধানতাও রক্ষা করিতে পারেন না।

শ্রীযুক্ত বনোয়ারী লাল গোস্বামী মহাশয়ের পিতা শান্তিপুর নিবাসী ৺ জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় গোবিন্দ দাসের করচা প্রকাশিত করেন। তখন বনোয়ারী লালের বয়স প্রায় ৪০ ছিল এবং তিনি সর্ব্বকার্য্যে পিতার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন, সুতরাং তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সমস্তই চাক্ষুস ঘটনা। করচার দুইখানি প্রাচীন পুঁথি জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় পাইয়াছিলেন। প্রথমখানি অতি জীর্ণ ও কীটদষ্ট ছিল। ৺ কালিদাস নাথ মহাশয়ের নিকট তিনি ইহা প্রাপ্ত হইয়া তাহার একখানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। সেই পাণ্ডুলিপির কয়েক পত্র 'রিজ্ এণ্ড রায়েট' পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ শম্ভু মুখোপাধ্যায় মহাশয় হারাইয়া ফেলেন। তাহার বহুপূর্ব্বে গোস্বামী মহাশয় প্রাচীন পুথিখানি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। কালিদাস নাথ মহাশয়ের নিকট পুনরায় চাহিয়া তিনি তাহা পান নাই। উক্ত নাথ মহাশয় সেই পুথি তাহার মালিককে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন এবং তাহা ফিরিয়া পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিলনা, সুতরাং অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিখানি কয়েক বৎসর গোস্বামী মহাশয়ের নিকট পড়িয়া ছিল। তৎপর দৈবক্রমে শান্তিপুর নিবাসী ৺ হরিনাথ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট করচার আর একখানি পুথি পাওয়া যায়, উহা খণ্ডিত ও ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ ছিল। জয় গোপাল গোস্বামী মহাশয় এই খণ্ডিত এবং ভ্রমাত্মক পুথির পূর্ব্বভাগ এবং তাহার নিজের নিকট যে প্রাচীন পুথি খানির নোট ছিল তাহা হইতে অতি কষ্টে তাহার নষ্টাংশের পুনরুদ্ধার করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে (১৮১৭ শক) গোবিন্দ দাসের করচা কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

"প্রাচীন পুথি বাহির কর"

যাঁহারা এই করচার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন "করচার প্রাচীন পুথি বাহির কর, তবে বিশ্বাস করিব।" দুইখানি

পুথি দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় করচা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার উভয়খানি মালিক-দিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এবং এখন তাহা পাওয়া অসম্ভব।

একথা নিশ্চিত যে এ দেশের বহু স্থানে ভূনিম্নে রত্নরাজি নিহিত আছে, কিন্তু বলা মাত্র কি কেহ তাহা খোঁজ করিয়া বাহির করিতে পারিবেন? এই সকল পুথি নিউম্যান কিংবা থ্যাকারের বাড়ীতে চিঠি লিখিলে পাওয়া যাইবে না। যাহাদের বাড়ীতে প্রাচীন পুথি আছে, অনেক সময় তাহারাই সে সকলের খোঁজ জানে না। হস্ত-লিখিত প্রাচীন পুথি উদ্ধার করা খুব সহজ ব্যাপার নহে। বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহের কার্য্য অতি সামান্যরূপ আরব্ধ হইয়াছে। করচাতেই এরূপ একটা আভাস আছে যে পুস্তকখানি কোন কারণে গোবিন্দ দাস গোপন করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহার প্রাচীন পুথি খুব সুলভ হইবে না, একথা নিশ্চয়। তাহার উপর আবার এই পুথির বিরুদ্ধে বিষম ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

প্রাচীন বাঙ্গলা পুথি প্রায়ই নিম্ন শ্রেণীর লোকদের ঘরে রক্ষিত আছে। খড়ো ঘরের চালের ফুটা দিয়া বর্ষার দিনে যে অজস্র জলধারা বর্ষিত হয় তাহাতে বৎসর বৎসর শত শত পুথি নষ্ট হইতেছে। তাহা ছাড়া অগ্নিদাহ, বন্যা এবং শিশুদের দৌরাত্ম্য তো আছেই। অনেকে আবার প্রাচীন পুথি মাঝে মাঝে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। যে সকল গ্রন্থকার দেশ-বিখ্যাত, অনেকস্থলে তাঁহাদের রচিত পুস্তকেরই প্রাচীন পাণ্ডুলেখা পাওয়া যাইতেছে না। কৃত্তিবাসের সুদীর্ঘ আত্ম-বিবরণ সম্বলিত একখানি প্রাচীন রামায়ণের পুথি সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় ছিল, তাহা আমি দেখিয়াছিলাম এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত প্রমুখ অনেকেই দেখিয়াছিলেন। সে পুথিখানি এখন পাওয়া যাইতেছে না। উক্ত আত্মবিবরণ সম্বলিত ১৫০১ খৃষ্টাব্দে লিখিত আর একখানি রামায়ণ হুগলী বদনগঞ্জ নিবাসী ৺হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের বাড়ীতে ছিল, রায় বাহাদুর যোগেশ চন্দ্র রায় মহাশয়, সেই পুথিখানি দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা আর পাওয় যাইতেছে না। সাহিত্য পরিষদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় শতাধিক কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীন পুথি আছে, তাহার কোনটিতেই সেই আত্মবিবরণ নাই এবং তাহা আর কোথাও মিলিতেছে না। কেহ কি চাহিলেই তাহা বঙ্গদেশ হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেন? এই না পাওয়ার অপরাধে কি আত্মবিবরণ বাতিল করিতে হইবে?

প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাস পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন, যে তিনি একখানি বৃহৎ নিত্যানন্দ-জীবনী লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেই পুস্তকের প্রাচীন পুথি পাওয়া যাইতেছে না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্য খণ্ডের ২৫ পরিচ্ছদের ৮ম শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি "পঞ্চতত্ত্বাখ্যান" নামক একখানা বৃহৎ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত তাহার কোন হদিস্ পাওয়া যায় নাই। লালা জয়নারায়ণ সেনের রচিত "হরিলীলা" গ্রন্থ ঢাকা অঞ্চলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়ছিল। তাহার একখানি প্রাচীন পুথি বহু চেষ্টায় ফরিদপুরের ইতিহাস লেখক

শ্রীযুক্ত আনন্দ নাথ রায় মহাশয়ের নিকট হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৲ মূল্য ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা চুরি গিয়াছে। তাহার আর একখানি কিছুতেই সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আমার নিকট একখানি ২০০ বৎসরের প্রাচীন স্মৃতির বঙ্গানুবাদের পুথি ছিল, তাহা ঠাণ্ডা লাগিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এত দিন চেষ্টা করিয়াও তাহার জোড়া মিলাইতে পারিলাম না। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকারগণের প্রায় সকলেই বঙ্গসাহিত্যে লব্ধ প্রতিষ্ঠ। তাঁহাদের পুস্তকগুলির সমধিক প্রচার ছিল, তথাপি যখন তাঁহাদের পুথিই দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে, তখন বিরল-প্রচার গোবিন্দ দাসের করচার পুথি চাওয়ামাত্রই পাওয়া যাইবে এরূপ দুরাশা কেহ করিবেন না। হঠাৎ দৈবে মিলিয়া যাইতে পারে এই পর্য্যন্ত। প্রাচীন হস্ত লিখিত পুথি তো দূরের কথা, একশত বৎসর পূর্ব্বের ছাপা কত পুস্তক এখন একবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে,—তাহাদের তো হাজার—দুই হাজার কপি ছাপা হইয়াছিল!

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। এখনও একদল লোক আছেন যাঁহারা বলেন, সেক্ষপীয়র নামে কোন কবি ছিলেন না। যে সমস্ত নাটক তাঁহাকে আরোপ করা হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে বেকনের লেখা। এতৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, "সেক্ষপীয়রের হাতের লেখা কোন পুথি পাওয়া যায় না। তিনি ভেনাস এডোনিস্ এবং লুক্রেস্ এই দুইখানি পুস্তক আর্ল অব্ সাউদ্দামটনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে "কিন্তু সেই আদৎ উৎসর্গ-পত্র কোথায়?"

এই প্রশ্নের উত্তরে জি. এল. পাগ (G. L. Pugh) সাহেব ঠাট্টা করিয়া লিখিয়াছেন "হস্তলিপি নাই, সুতরাং কোন লিপিই লিখিত হয় নাই।"

"হস্তলিখিত পুথি নাই, সুতরাং কোন পুথিই লিখিত হয় নাই।" *

পাড়াগাঁয়ের ঘোঁট।

করচার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঢেউ যখন শান্তিপুরে প্রবেশ করিল, তখন পাড়াগাঁয়ে যাহা সাধারণতঃ হয় তাহাই ঘটিল, অর্থাৎ জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের শত্রুদের কেহ কেহ এ কথাটা লুফিয়া নিয়া রটনা করিলেন যে তিনি গোস্বামী মহাশয়কে বসিয়া বসিয়া এই পুস্তক কল্পনাবলে রচনা করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং এই পুস্তক রচনা করার অপরাধে তিনি শান্তিপুরে 'এক ঘরে' হইয়া ছিলেন।

বনোয়ারীলাল গোস্বামী তাঁহার পিতার বিরুদ্ধে এই অভিযোগের উত্তরে লিখিয়াছেন "এরূপ প্রমাণও আসিতেছে যে পুথিখানি জাল করিবার জন্য আমরা 'এক ঘরে' হইয়াছিলাম। আমাদের সমাজ যদি আজ এত বড় জাগ্রত হইত, তবে দেশের দুর্দ্দিন কাটিয়া যাইত।"

---

* "No letters preserved, therefore none were written." No Mss preserved, therefore none were written."

Statesman, February 10, 1926.

এ সম্বন্ধে শান্তিপুর নিবাসী বর্দ্ধমান ডিভিসনের অবসর প্রাপ্ত স্কুল ইন্‌পেক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল মহাশয়ের নিকট আমরা সন্ধান লইয়াছিলাম। সান্যাল মহাশয়ের বয়স এখন ৬৪ বৎসর। তাঁহার ইংরেজী পত্রের মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল। * "প্রিয় ডাক্তার সেন, গোবিন্দ দাসের করচা জাল করিবার অভিযোগে শান্তিপুর নিবাসী পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় তথাকার বৈষ্ণব সমাজে 'এক ঘরে' হইয়াছিলেন কিনা আপনি জানিতে চাহিয়াছেন। আমি শান্তিপুরে বৈষ্ণব সমাজের একজন। গোস্বামী মহাশয়ের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের বংশ পরম্পরা ঘনিষ্ঠতা চলিয়া আসিয়াছে। আমার বয়স এখন ৬৩ বৎসর। শান্তিপুরে তিনি 'একঘরে' হইয়াছিলেন একথা তো আমি কখনও শুনি নাই। আমি বিশ্বাস করি গোবিন্দ দাসের করচা একখানি উৎকৃষ্ট প্রমাণিক গ্রন্থ।

ভবদীয়
শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল
২৬শে মার্চ্চ, ১৯২৫।

সান্যাল মহাশয়ের চিঠি ছাড়া আমি আরও কয়েকখানা চিঠি পাইয়াছি। পাদটীকায় তাহার কতক কতক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। † পরবর্ত্তী একটি পৃষ্ঠায় রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র উদ্ধৃত করিব। এই সমস্ত পত্র পড়িলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে এই আন্দোলনটি শান্তিপুরে প্রবেশ করিয়া পাড়াগেঁয়ে দলাদলির সৃষ্টি করিয়াছে, সুতরাং ইহা লইয়া আমাদের গলদ্‌ঘর্ম্ম হইবার কোন কারণ

---

* My Dear Dr. Sen, You have asked me to let you know if the late Pandit Joy Gopal Goswami was boycotted by the Vaisnava community of Santipur for having published the Karcha of Govinda Das alleged to have been forged by the Pandit. I belong to the Vaisnava community of Santipur and am now 63 years old. My family and the venerable Pandit's family were in close touch with each other for genrations. I never heard of his being boycotted at Santipur. I believe the Karcha published by him to be a genuine historical work of great merit.

Yours sincerely,
(Sd) Nalini Mohan Sanyal
26th. March, 1925.

† এ সম্বন্ধে শান্তিপুর বাসী প্রায় আশী বৎসর বয়স্ক পণ্ডিত হরিলাল গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন "পূজনীয় জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় গোবিন্দ দাসের করচার জন্য কখনও 'একঘরে' হইয়াছিলেন একথা বহু অনুসন্ধানেও জানিতে পারিলাম না, বরং কখনও 'একঘরে' হন নাই এই কথাই সকলে বলিল।" শান্তিপুরবাসী শ্রীযুক্ত কীর্ত্তীশচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন। "শ্রদ্ধাস্পদেষু, আপনার ৫।৪।২৫ তারিখের পত্র পাইয়াছি, পূজ্যপাদ জয় গোপাল গোস্বামী মহাশয় গোবিন্দ দাসের করচা বাহির করিয়া জালিয়াতীর অপরাধে সামাজিক দণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন বা 'একঘরে' হইয়া ছিলেন, ইহা অমূলক সংবাদ। আমি নিজে এরূপ সংবাদ কখনও শুনি নাই বা কাহারও নিকট জানিতেও পারিলাম না। স্থানীয় মিউনিসিপিলিটির ভাইস্ চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়কে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি এমন সংবাদ জানেন না বলিলেন।

নাই। যদিই বা একথা সত্য হইত যে জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় 'একঘরে' হইয়াছিলেন, তাহা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার একটা অপরাধের প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইত না, যেহেতু পাড়াগাঁয়ের 'একঘরে' হওয়ার ব্যাপারটা প্রায় সব সময়েই শত্রুতামূলক।

প্রাচীন পুথি যাঁহারা দেখিয়াছিলেন

করচা প্রকাশের প্রায় ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে ঐ পুথি গোস্বামী মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছিল। সে আজ ৪৫।৪৬ বৎসরের পূর্ব্বের কথা। সে সময় কালিদাস নাথ মহাশয়ের প্রদত্ত পুথিখানি অনেকেই দেখিয়াছিলেন। তখনকার অনেক লোকই এখন জীবিত নাই, কিন্তু সুখের বিষয় এখনও দু-চার জন শিক্ষিত কৃতবিদ্য ব্যক্তি আছেন যাঁহারা পুথিখানি দেখিয়াছিলেন। বাকলার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কচূড়ামণির নাম অনেকের নিকটই বিদিত। ইঁহার বয়স এখন ৮০। ইঁনি আমাকে নিম্নলিখিত চিঠিখানি লিখিয়াছেন।

"৪৫।৪৬ বৎসর পূর্ব্বে হুগলীর সন্নিহিত কেওটায় আমার অবস্থান কালে ৺ গোরাচাঁদ চক্রবর্ত্তী নামক কোন হরিভক্তি পরায়ণ ব্রাহ্মণের নিকট গোবিন্দ দাসের করচার পুথি দেখিয়াছিলাম। ঐ পুথিখানি কীটদষ্ট ও জীর্ণ ছিল। তিনি ঐ খানি নকল করিতেন এবং অনেক সময় অস্পষ্ট পদ উদ্ধারের জন্য আমাকে ডাকিতেন, সেইজন্য উহার অনেক কথা আমার মনে আছে। বর্ত্তমান সময়ে ৺ জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্কলিত গোবিন্দ দাসের করচা খানি মুদ্রিত দেখিতে পাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট যে পুথি দেখিয়াছিলাম তাহা ও এই ছাপা পুথি এক বলিয়া মনে করি। জয়গোপাল গোস্বামী সঙ্কলিত পুস্তকখানি যতই পড়িতেছি, ততই আমার পূর্ব্বের লিখিত সংস্কারগুলি জাগিয়া উঠিতেছে।

বশংবদ
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

আর একখানি পত্র আমরা পাইয়াছি রংপুরের অবসরপ্রাপ্ত সরকারী উকিল,—হাই কমিসনার সিভিলিয়েন স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের সহোদর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম. এ, বি. এল. মহাশয়ের নিকট হইতে। ১৯২৫ সনের ২৪ শে মার্চ্চ তিনি আমাকে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল এবং তাহারে কতকাংশের মর্ম্ম নীচে দেওয়া যাইতেছে। *

---

* Dear Dr. Sen, Your much esteemed favour of the 19th inst. Yes, I know the late Pandit Joy Gopal Goswami of Santipur, rather intimately in my young days and I had the honour and the privilege of enjoying his confidence too. I remember to have seen an old Ms. of Govinda Das's Karcha with him, which he was then engaged in making a copy of, for

"প্রিয় মহাশয়, আপনার ১৯ তারিখের অনুগ্রহ-লিপি পাইলাম। আমি শান্তিপুর নিবাসী ৺ পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়কে বিশেষরূপেই চিনিতাম। এক সময়ে আমি তাঁহার সৌহার্দ্দাভিমানী ছিলাম। আমি গোবিন্দ দাসের করচার একখানি প্রাচীন পুথি তাঁহাকে নকল করিতে দেখিয়াছি। তিনি উহা প্রকাশ করিবেন বলিয়া নকল করিতে ছিলেন। সে আজ ৪০ বৎসরের উপরে হইবে। তখন পুথিখানি অতি জীর্ণ অবস্থায় ছিল এবং তজ্জন্যই বোধ হয় তিনি তাহার প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতে ছিলেন।"

শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিলাল গোস্বামী মহাশয়ের চিঠিতে জানা যাইতেছে যে করচার পাণ্ডুলেখা যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শান্তিপুরে এখনও জীবিত আছেন। তাহা ছাড়া বনোয়ারীলাল গোস্বামী, যাঁহার বয়স এখন ৭০ এবং তদীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মোহনলাল গোস্বামী যাঁহার বয়স এখন ৬০, তাঁহারা তো এই পুথি দেখিয়া ছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে সমস্ত ঘটনাই বিদিত আছেন।

তবে কুরুক্ষেত্রের সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত জ্ঞাতি-বিরোধ আমাদের সমাজে সমানভাবে চলিয়া আসিতেছে। গোস্বামী মহাশয়ের জ্ঞাতি শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় এক প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছেন যে তিনি নিজে জানেন যে জয়গোপাল গোস্বামী গোবিন্দ দাসের করচা জাল করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য শান্তিপুরে 'একঘরে' হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে যে সকল ঝগড়া ঝাটির কথা হইয়াছে তাহা এস্থানে বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে পণ্ডিত বনোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয় আমাকে লিখিয়াছেন—এবং শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল প্রভৃতি কয়েকজন শান্তিপুরবাসী তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছেন—যে যখন করচা সংগৃহীত হয় তখন রাধাবিনোদ গোস্বামী জন্মগ্রহণই করেন নাই; যদিও করিয়া থাকেন, তখন তিনি স্বগৃহের আঙ্গিনায় হামাগুড়ি দিতেছিলেন।

---

the purpose of editing and publishing it. It is over 40 years now that I saw it with him and it was then in a very worn out condition and that is why I believe he was making a copy of it.

I never heard of his having been boycotted by the Vaisnava community of Santipur for his having edited and published the Karcha. His family and our family were in very intimate terms at the time and we were also close neighbours, and if any such thing had happened at the time, we must have known of it. Somehow or other I lost touch with the Pandit Mahashaya and Santipur for nearly 25 years now. If, however, you want any definite information for the subsequent period I will refer you to Babu Nalini Mohan Sanyal, M.A. (Bhasatattwaratna, Retired Inspector of Schools) now residing at 1, Gopal Banerjee's street, Bhownipur, Calcutta, who was also a close neighbour of the Pandit Mahashaya and was in close touch with him and his family all the time.

Yours sincerely
(Sd) Sarat Chandra Chatterjee
24 March, 1925.

শান্তিপুরবাসী আর এক মহোদয় বলিতেছেন "গোস্বামী মহাশয় পুথির কয়েক পৃষ্ঠা হারাইয়া বহুকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন, আমিই তাঁহাকে সে কয়েক পাতা জাল করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম।" বালক যেরূপ ময়রার দোকানের মিঠাই পাইলে তখনই তাহা গলাধঃকরণ করে, গোস্বামী মহাশয়ও নাকি সেই সুপরামর্শটি তখনই গ্রহণ করিয়া ঐ কয়েক পৃষ্ঠা জাল করিয়া ফেলেন।

যদি পুস্তক খানি গোস্বামী মহাশয় নিজেই রচনা করিয়া থাকিবেন, তবে কয়েকটি পৃষ্ঠা হারাইয়া গেলে এত বৎসর বসিয়া থাকিবার কারণ কি? তিনি তো নিজেই তাহা অবিলম্বে পূরণ করিতে পারিতেন।

এই দলাদলি কণ্টকিত, জ্ঞাতি বিরোধ-দুষ্ট শান্তিপুরের বাদানুবাদ প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের পক্ষে অনুমাত্র সাহায্য করিবে না। এই জন্য এ বিষয়ে আলোচনা ত্যাগ করিলাম।

২। বিরুদ্ধবাদীদের আন্দোলনের ইতিহাস

বিরোধী দলের আন্দোলন সর্ব্ব প্রথম শান্তিপুরে আরব্ধ হয় নাই। ইহা সুরু হইয়াছিল অমৃতবাজার আফিসে। করচার পাণ্ডুলিপি * পাঠ করিয়া ৬ শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় পুস্তকখানির বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তিনি পাণ্ডুলিপির দুই ফর্ম্মা গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে কয়েক দিনের জন্য চাহিয়া রাখেন। তাঁহার নিকট হইতে ডাক্তার শম্ভু মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহা লইয়া গিয়া হারাইয়া ফেলেন। সেই দুই ফর্ম্মার অস্পষ্ট স্মৃতি লইয়া শিশির বাবু করচার বিষয় 'অমিয় নিমাই চরিতে' লিখিতে আরম্ভ করেন এবং সেই পুস্তকে তিনি স্মৃতি ভ্রমের দরুণ গোবিন্দ দাসকে কায়স্থ বলিয়া উল্লেখ করেন। তারপর কয়েক বৎসর পরে যখন করচা প্রকাশিত হয়, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে মুদ্রিত পুস্তকে গোবিন্দ দাসকে কর্ম্মকার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এদিকে তাঁহার অমিয় নিমাই চরিতের সেই খণ্ড মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনি তাঁহার লিখিত কথার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য বলিলেন যে করচার প্রথমাংশ অপ্রামাণিক। প্রথম সংস্করণে করচার মোট মুদ্রিত সংখ্যা ২২৭। তন্মধ্যে ৫১ পৃঃ "হাটু ধরি রাম রায় করেন ক্রন্দন।" ছত্র পর্য্যন্ত (অর্থাৎ যে অংশ হারাইয়া গিয়াছিল) তাহার মৌলিকতা সন্দেহের বিষয়। এ সম্বন্ধে সরলচিত্ত বৃদ্ধ জয় গোপাল গোস্বামীর বিরুদ্ধে যে একটা কাণ্ড হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে আমি আপাতত নীরব থাকিব। সেই সময় গোস্বামী মহাশয় আমার শ্যামপুকুর লেনস্থিত ১২নং বাসা বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া করুণ-ভাবে সমস্ত কথা

---

* আমি ভ্রম বশতঃ লিখিয়াছিলাম যে শিশির বাবুরা করচার প্রাচীন পুথি দেখিয়াছিলেন, কিন্তু বনোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট জানিলাম যে তাঁহারা আদত পুথি দেখেন নাই, নকল দেখিয়াছিলেন।

জানাইয়াছিলেন। পাণ্ডুলিপি খোয়া যাইবার কয়েক বৎসর পরে কিরূপে তিনি শান্তিপুর বাসী ৺হরিনাথ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত আর এক খানি খণ্ডিত পুথি দৃষ্টে এবং তাঁহার নিজ কৃত নোট হইতে বহু কষ্টে লুপ্ত পত্র গুলির পাঠোদ্ধার করিয়া ছিলেন, তাহা তিনি আমাকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু শিশির বাবুর ন্যায় ব্যক্তি যখন বলিলেন যে পাণ্ডুলিপিতে 'কায়স্থ' পাঠ ছিল—'কর্ম্মকার' পাঠ ছিলনা, তখন একদল লোক খুব জোরের সহিত করচায় এই ৫১ পৃষ্ঠা জাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন, সুতরাং এই বিরোধের উৎপত্তি জাতি-মূলক বিষয় লইয়া।

আর একটা কারণে সম্ভবতঃ এই প্রতিবাদ উৎপন্ন হইয়াছিল। বনোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয় তাহারও আভাস দিয়াছেন। যখন জয় গোপাল পণ্ডিত মহাশয় করচার পাণ্ডুলিপি লইয়া শিশিরবাবুর নিকট উপস্থিত হন, তিনি তখন এই পুস্তক খানি স্বয়ং অমৃতবাজার পত্রিকা অফিস্ হইতে বাহির করিবেন এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তাহা পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট চাহিয়াছিলেন, পণ্ডিত মহাশয় তাহা দেন নাই। যদি তিনি দিতেন এবং অমৃত-বাজার পত্রিকা-আফিস্ হইতে পুস্তক খানি বাহির হইত, তবে ইহার বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ কোন আন্দোলন হইত না।

সুতরাং কি ভাবে এই পুস্তকের বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণ আরব্ধ হয় তাহার একটা ইতিহাস পাওয়া গেল। এদেশে একটা কিছু আরম্ভ হইলে তাহার ঢেউ অনেক দিন চলিতে থাকে, কারণ বাঙ্গালীর বাজে কাজ করিবার সময় যথেষ্ট আছে। সুতরাং সেই যে আন্দোলন সুরু হইল, এখনও তাহা চলিতেছে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কথা কিছুই নাই।

কিন্তু ধর্ম্মের ঢাক শীঘ্রই বাজিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গল' নামক এক খানি সুপ্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। কয়েক খানি প্রাচীন পুথি দেখিয়া শ্রীযুক্ত প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র নাথ বসু এবং ৺কালিদাস নাথ মহাশয়দ্বয় বইখানি সম্পাদন করেন। এই পুস্তকের বৈরাগ্য খণ্ডে স্পষ্ট-ই লিখিত আছে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সহচর ছিলেন "গোবিন্দ কর্ম্মকার"। এই আবিষ্কারের ফলে প্রতিবাদীর দল নিরস্ত হইয়া গেলেন। তথাপি তাঁহারা একবার চেষ্টা পাইয়া ছিলেন—গোটা জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলের পুথি খানি জাল বলিয়া উড়াইয়া দিতে। কিন্তু সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ৫ম খণ্ডে প্রকাশিত নগেন্দ্র বাবুর একটা অব্যর্থ উত্তরে তাঁহাদের চেষ্টা পণ্ড হইয়া গেল; এবং ইহার পরে যখন নগেন্দ্র বাবু স্বয়ং দেওঘরে যাইয়া শিশির বাবুকে জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলের ২০০।৩০০ বৎসরের প্রচীন পুথির পাঠ দেখাইলেন, তখন তাঁহার অবিশ্বাস করিবার আর কোন কারণ রহিল না। জয়গোপাল গোস্বামী যে 'কায়স্থ' পাঠ কাটিয়া 'কর্ম্মকার' পাঠ কল্পনা বলে স্থাপন করেন নাই—ইহা তখন সকলেই বুঝিলেন। ইহার পর প্রায় ২৭। ২৮ বৎসর কাল প্রতিবাদিগণ একেবারে নীরব হইয়া ছিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতি অযথা অভিযোগের উৎসাহ দীর্ঘ-কালের জন্য প্রশমিত ছিল।

আন্দলনের পুনরুদ্ভব—'গোটা করচা খানিই জাল'।

মদ্‌রচিত বিবিধ ইংরেজি ও বাঙ্গালা পুস্তকে আমি বৈষ্ণব ইতিহাস-ক্ষেত্রে গোবিন্দ-দাসের করচার অতি উচ্চ স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছি, এমন কি চৈতন্য ভাগবত এবং চৈতন্য-চরিতামৃত হইতেও ঐতিহাসিক প্রামাণিকতায় করচাকে বড় মনে করিয়াছি। গোঁড়া বৈষ্ণবেরা পূর্ব্বোক্ত দুই খানি পুস্তককে—বিশেষ চৈতন্যচরিতামৃতকে বেদের তুল্য শ্রদ্ধেয় মনে করেন। গোঁড়া খৃষ্টানের নিকট বাইবেল যেরূপ, গোঁড়া বৈষ্ণবের নিকট চৈতন্য-চরিতামৃতও সেইরূপ; সুতরাং যখন আমি একজন মূর্খ কর্ম্মকার রচিত ক্ষুদ্রায়তন করচাকে চৈতন্য-চরিতামৃত এবং অপরাপর প্রসিদ্ধ গ্রন্থাপেক্ষাও কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, তখন বৈষ্ণবদের মধ্যে কেহ কেহ আমার প্রতি বিষম বিরক্ত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া শ্রীযুক্ত রসিক মোহন বিদ্যাভূষণের নাম করা যাইতে পারে। পূর্ব্ববর্ত্তী আন্দোলনকারীরা করচার কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র জাল প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু এখন সেই আন্দোলনের ২৭। ২৮ বৎসর পরে গোটা পুথি খানি গোস্বামী মহাশয়ের স্বকপোল কল্পিত, ইহাই প্রমাণ করিতে তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ২৭।২৮ বৎসর পূর্ব্বে অনেকেই প্রাচীন পুথি খানি দেখিয়াছিলেন, সুতরাং তখন এরূপ প্রতিবাদ টিকিতে পারিত না; এখন সেই সকল ব্যক্তির অনেকেই স্বর্গ-গত, সুতরাং সুবিধা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও যাঁহারা জীবিত আছেন, এবং বই খানি দেখিয়াছিলেন,—তাঁহাদের চিঠি পত্র পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

বস্তুত করচা তাঁহাদের ভাল না লাগিবার আর একটা বিশেষ কারণ আছে। যদিও চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য-চন্দ্রোদয়, চৈতন্য ভাগবত এবং চৈতন্য মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থোক্ত ঘটনার সব জায়গায় ঐক্য নাই, তথাপি মূলতঃ উহারা একছন্দে রচিত। এই সকল পুস্তকের সর্ব্বত্রই চৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া কথায় কথায় তাঁহার দেবলীলার অবতারণা করা হইয়াছে। সে কালের বৈষ্ণবেরা চৈতন্যের দেব-লীলা শুনিতেই ইচ্ছা করিতেন, তাঁহাকে মানুষের মত সহজ ভাবে দেখিয়া সুখী হইতেন না।

ইহা কেবল হিন্দুদের ধর্ম্মবিশ্বাসের বিশেষত্ব ছিল না, সমস্ত জগতে তখন অতি-প্রাকৃত ঘটনা সাধারণের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অবলম্বনীয় ছিল। খ্রীষ্টানেরা আজকাল মার্কলিখিত "সুসমাচারকেই" নূতন টেষ্টামেণ্টের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় মনে করিতেছেন—যেহেতু এই গ্রন্থে অতি-প্রাকৃত ঘটনা অল্প। কিন্তু এককালে এই কারণেই পুস্তকখানি হতাদৃত ছিল। *

---

* We may believe that its (of the Gospel of St mark) simple terms of what we may call its realistic interpretation of Christ were not altogether congenial to many of its early readers. Careful enquiry, however, shows that the grounds on which St Mark's Gospel has been depreciated add to rather than diminish its value. It deals less with

চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃতাদি গ্রন্থে আছে, চৈতন্য দেব কখনও কখনও বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন ("বরাহ আকার প্রভু হৈলা সেইক্ষণে। স্তব্ধ হৈলা মুরারি অপূর্ব্ব দরশনে॥"—চৈ, ভা, মধ্য, ৩য়) কখনও তিনি নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন, কখনও চতুর্ভুজ ("বীরাসনে বসিয়া আছেন বিশ্বম্ভর, চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদা পদ্মধর।"—চৈ, ভা, মধ্য ২য়) কখনও বা অতিথি ব্রাহ্মণকে তিনি অষ্টভুজ দেখাইতেছেন, (চৈ, ভা, মধ্য ৩য়), নবদ্বীপে নিত্যানন্দকে এবং পুরীতে সার্ব্বভৌমকে তিনি ষড়্ভুজ দেখাইয়াছিলেন (চৈ, ভা, মধ্য ৩য়)। এই সকল বৃত্তান্ত চৈতন্য চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাসও লিখিয়াছেন। মুরারি গুপ্তের করচায় লিখিত আছে চৈতন্য দেব আতুর ঘর হইতে অদ্বৈতচার্য্যের সঙ্গে নানারূপ দার্শনিক জটিল তত্ত্বের বিচার করিতেছেন। কখনও বা তাঁহার আদেশে বাঘ ও হাতী কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিয়া নৃত্য করিতেছে, (চৈ, চ, মধ্য, ১৭ পঃ ১২-১৩ শ্লোক) এবং বন্য শারী-শুকেরা উড়িয়া উড়িয়া তাঁহার হাতে পড়িতেছে এবং তাঁহাকে শুনাইয়া গোবিন্দলীলামৃত হইতে বিবিধ শ্লোক আবৃত্তি করিতেছে, (চৈ, চ, মধ্য ১৭ পঃ ৭৬ শ্লোক) *। লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গলে পাওয়া যায় লঙ্কা হইতে বিভীষণ আসিয়া প্রভুর সঙ্গে দেখা করিতেছেন। তিনি অনন্তশায়ী বিষ্ণু—ইহা প্রমাণ করিতে যাইয়া কোন লেখক বলিতেছেন অপোগণ্ড শৈশব অবস্থায় তিনি একটী ভীষণ কালসর্পের পিঠের উপর শুইয়া ছিলেন ("কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া, ঠাকুর রহিলা সর্প উপরে শুইয়া" চৈ, ভা, ৩য়)। কেহ কেহ তাঁহাকে "ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদর" প্রমাণ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, যে তিনি জগন্নাথ রূপে একা ৫৪ বার ভোগ প্রতিদিন খাইতেছেন, প্রতি বারে শত শত ভার অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন। অদ্বৈতাচার্য্য, চৈতন্যদেবকে বলিতেছেন "তিন জনের ভক্ষ্য তোমার এক এক গ্রাসে" উদরস্থ হয়, (চৈ, চ, মধ্য, ৩ পঃ, ৪৯ শ্লোক) ষাটীর মাতার অনুরোধে চৈতন্যদেব ১০।১২ জনের ভোজ্য একা খাইয়া ফেলিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার জামাতা অমোঘ বলিয়াছিল "এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশবার জন। একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন॥" (চৈ, চ, ১৫ পঃ, ৯০ শ্লোক)। এ সকল কেবল তাহাকে 'ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর' প্রমাণ

Christ as the Son of God in Christian faith than the Christ who is the Son of Man, bound by the limitations of human life, going about doing good with the devotion of one, who in heart and mind, seeks to do the will of God. We must not forget that Christians of St Mark's day thought of Christ chiefly as in the heavenly places—the Lord of glory who had ascended to the right hand of God and would return in the splendour of divine majesty. St. Mark's Gospel on the other hand calls its readers to think of what Christ did when He lived on earth and was limited by the conditions of human life" See Statesman June 6, 1926.

* বৃদ্ধ কবিরাজ মহাশয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে তৎকৃত "গোবিন্দলীলামৃত" চৈতন্যদেবের তিরোধানের বহু পরে রচিত হইয়াছিল।

করিবার জন্য। তিনি রুদ্ররূপী ভগবান—ইহা প্রমাণ করিতে যাইয়া কোন কোন লেখক বর্ণনা করিয়াছেন যে তিনি ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া একাকার করিতেছেন এবং এরূপ ভীষণ হইয়া দাঁড়িয়াছেন যে নিজ জননীকেও মারিয়া মুর্চ্ছিত করিয়া ফেলিতেছেন (চৈ, চ, আদি ৩য়, পঃ, এবং ঐ আদি ১৪ পঃ ৬ শ্লোক)। এরূপও বর্ণিত আছে যে তিনি বাজি-করের মত কখনও বা জামিরের গাছে কদম্ব ফুল উৎপন্ন করাইতেছেন (অন্ত্য, ৫ম) এবং " এক আম্র বীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল। তৎক্ষণে জন্মিল বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল॥ দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত। পাকিল অনেক ফল সবাই বিস্মিত॥" (চৈ, চ, অদি, ১৭ পঃ ৬৫ শ্লোক)। এরূপ উদাহরণ কত দিব? এই সব প্রসিদ্ধ গ্রন্থ খুঁজিলে পাঠক এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত পাইবেন।

গোঁড়া বৈষ্ণব দলের মধ্যে কেহ কেহ শিক্ষিত হইলেও এই সকল সংস্কারের হাত এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহারা চৈতন্যের এই বিভূতি—এই ঐশ্বর্য্য সকলই প্রামাণিক মনে করেন। কিন্তু গোবিন্দদাসের করচায় এই সকলের কিছুই নাই। "শ্রীকৃষ্ণের যত খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা"—করচা-অঙ্কিত চৈতন্য দেবের মূর্ত্তিতে নরলীলার মহিমাই প্রচুর পাওয়া যায়, সুতরাং যাঁহারা ঐ সকল অতি-প্রাকৃত কাহিনী শুনিয়া চৈতন্যদেবের মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন তাঁহাদের কাছে করচার অনাড়ম্বর মনুষ্য-দেবটিকে একটু বেথাপ্পা ঠেকিবে। এই জন্য তাঁহাদের মতে যে সকল গ্রন্থ প্রামাণিক, তাহাদের মধ্যে যদি গরমিল থাকে তবে তাহারা চক্ষু বুজিয়া চলিয়া যান, কিন্তু করচার চৈতন্য যে অনেকটা নূতন আদর্শ। ইহাতে তাঁহার অলৌকিকত্বের কথা অতি অল্পই আছে। মথুরার রাজরাজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যদি হঠাৎ তাঁহার প্রজাদের মধ্যে পাচনবাড়ি হাতে এবং গরু বান্ধিবার দড়ি লইয়া রাখালবেশে দেখা দিতেন, তবে হয়ত তাহারা তাহাকে চিনিতেই পারিত না। অতি প্রাকৃতের চিরসংস্কারে অভ্যস্ত গোঁড়া বৈষ্ণবের কেহ কেহ করচার চৈতন্য মূর্ত্তিকে অপরিচিত মনে করিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

কিন্তু এখানে একটি কথা বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে। চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধায় আমি কাহারও কাছে পিছু হটিবনা। যাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি ইহা বুঝিতে চাহিবেন, তাঁহাদের পক্ষে চরিতামৃত অনন্যগতি। এই মহাগ্রন্থকে বাদ দিয়া যাঁহারা এদেশের বৈষ্ণবধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে চাহিবেন, তাঁহাদের প্রচেষ্টা ভেলা দিয়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টার মত বিফল হইবে। কবিরাজ গোস্বামীর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ভক্তি এই গ্রন্থের সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। জগতের অন্য কোথায়ও আর কোন সম্প্রদায়ের এরূপ দর্শনাত্মক ধর্ম্ম-গ্রন্থ আছে কি না জানি না। কিন্তু তাই বলিয়া ইতিহাস হিসাবে ইহার দাবীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে পারা যায় না। ভগবতী, গণেশ, বাসুদেব প্রভৃতি দেব-বিগ্রহের কাহারও দশভুজ, কাহারও গজমুণ্ড, কাহারও চতুর্ভুজ সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। কিন্তু ভাস্কর বা চিত্রকরগণ যখন ইহাঁদের পার্শ্বচরগণের মূর্ত্তি নির্ম্মান করেন, তাঁহারা তখন

একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই পরিকল্পিত হন। সেইরূপ ঐ সকল ধর্ম্ম-গ্রন্থে অনেক সময় চৈতন্যদেব অতিপ্রাকৃত ভাবে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও যখন লেখকেরা পারিপার্শ্বিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তখন তাহা যথাযথ ও স্বাভাবিক ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং সাময়িক ইতিহাস হিসাবেও যে একল পুস্তকের অনেকটা মূল্য না আছে, তাহা আমি বলিতে চাহিনা। কিন্তু মহাপ্রভুর যে সকল চিত্র এসকল পুস্তকে পাই তাহার অনেকগুলিই অতি প্রাকৃত ও অতি-রঞ্জিত, সুতরাং সে সমস্তই ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব।

যাঁহারা অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী তাঁহাদের বিশ্বাসের উপর আমরা হানা দিতে চাই না, বরঞ্চ ভক্ত বলিয়া তাঁহাদিগকে আমরা শ্রদ্ধাও করিতে পারি। কিন্তু এ সকল অলৌকিক ব্যাপারে আস্থাস্থাপন ভাবরাজ্যের কথা। যদি কেহ সেগুলিকে ঐতিহাসিক বলিয়া প্রমাণ করিতে চান, তবে আমরা কখনই তাহাদের সহিত একমত হইতে পারিব না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই গোঁড়ার দলের কেহ কেহ ঐ সকল ধর্ম্ম গ্রন্থের অনুস্বার বিসর্গ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু করচার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া ঘোর ঐতিহাসিক তর্ক-জাল বিস্তার করিতেছেন। ইহাঁদের মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তিরাও আছেন, তাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থের যাহা কিছু আছে শুধু তাহাই অকাট্য সত্যরূপে দাঁড় করাইতে চাহেন না, সেই সকল অলৌকিক চিত্রের আদর্শ যাহাতে না পান, সেরূপ পুস্তকের ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়া পড়েন। ইহা হইতে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে যে যাহারা মুরারি-গুপ্ত এক ব্রাহ্মণ-পরিবারের সম্মুখে লেজ বাহির করিয়া তাহার অঙ্গদত্ব প্রমাণ করিয়াছিলেন "মুরারি গুপ্ত বন্দো অঙ্গদ বিক্রম। সপরিবারে লেজ যার দেখিল ব্রাহ্মণ॥" এবং চৈতন্য দেব সুদর্শনচক্রকে আহবান করিয়া জাগাই মাধাইকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলে উক্ত চক্র তাঁহার আদেশে আকাশে ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতেছিল "চক্র চক্র চক্র প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে। আথে পাথে চক্র আসি উপসন্ন হৈল॥" (চৈ-ভা-মধ্য ১৬ শ্লোক)। এই সকল কথা অবাধে বিশ্বাস করিতে পারেন, তাঁহারা চৈতন্যদেব মুখের দ্বারা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন (নাসারন্ধ্র দিয়া নহে) করচার এই কথা বিশ্বাস করিতে চান না, এবং অনুচরটী পেটের অসুখ হইলে তাহার গায়ে তিনি শ্রী হস্ত বুলাইয়াছিলেন, এই কথা অসম্ভব মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ও অবিশ্বাস উভয়েরই সীমা পাওয়া যায় না। গোবিন্দদাসের করচার উপরে তাঁহারা যে প্রকার অনুসন্ধানের তীক্ষ্ণ রশ্মি পাত করিতেছেন, তাহাতে পৃথিবীর যে কোন প্রসিদ্ধ ইতিহাসের ভিত্তি কাঁপিয়া উঠিতে পারিত। প্রতিছত্র লইয়া কতই না তর্ক উঠিতেছে। অথচ চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে অলৌকিক ঘটনা ছাড়াও এরূপ সকল কথাও আছে যাহা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। সম্ভঃ কৈশোরাতিক্রান্ত চৈতন্যদেব রুদ্ররূপে নবতিবর্ষ বয়স্ক অদ্বৈতাচার্য্যের কি দুর্গতি করিতেছেন দেখুন "পিঁড়া হইতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া। স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া॥" (চৈ-ভা-মধ্য ১৩ শ্লোক)। চৈতন্যপ্রভুর এই রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে যাঁহারা রুদ্রাবতার

বলিয়া গণ্য করিবেন তাঁহাদিগকে আমরা দূর হইতে নমস্কার করিতেছি। এই কি প্রেমময় চৈতন্যদেবের মূর্ত্তি? ইহা যদি তাঁহার বিকৃতি না হয়, তবে আর বিকৃতি কাহাকে বলিব? চৈতন্যদেব সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বরাত্রে তাঁহার দুটী সহচর লইয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, লোচন দাস কিন্তু লিখিয়াছেন তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে সে রাত্রি বাস করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, উভয়ের দাম্পত্য মিলন প্রসঙ্গে যে সকল কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা বৈরাগ্য-প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি চৈতন্যদেব সম্বন্ধে সন্ন্যাসের পূর্ব্বক্ষণে নিতান্ত অশোভন, অবিশ্বাস্য ও অসঙ্গত। অথচ এই সমস্ত নিতান্ত কাল্পনিক উপাখ্যান এবং অলৌকিক লীলা যাঁহারা ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারাই গোবিন্দদাসের অতিক্ষুদ্র খুঁটি নাটি কথার অপ্রামাণিকতা লইয়া নৈয়ায়িকের মত সূক্ষ্ম তর্ক উত্থাপন করিতেছেন। ইঁহাদের বিশ্বাসকেও বলিহারি, অবিশ্বাসকেও বলিহারি।

প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে গৌরগণোদ্দেশ এবং দিগদর্শনী নামক অনেকগুলি সংস্কৃত ও প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি পাওয়া যায়। তাহাতে মহাপ্রভুর পার্শ্বচরগণ কে কাহার অবতার তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই অবতার ব্যূহের * কিঞ্চিৎ নিদর্শন পাদটীকায় দেওয়া গেল। যে সকল শিক্ষিত বৈষ্ণব গোবিন্দদাসের বিরোধী তাঁহাদের অনেকেই এই অবতার-বাদ

* নাম	অবতার	নাম	অবতার
১। মাধবেন্দ্র পুরী	কল্পবৃক্ষ।	৫১। মাধব	লীলাবতী।
২। ঈশ্বর পুরী	উজ্জ্বল অবতার।	৫২। বাসুদেব ঘোষ	গুণবতী।
৩। কেশব ভারতী	সন্দীপনি মুনি।	৫৩। শ্রীজীব	বিলাস মঞ্জরী।
৪। গঙ্গাদাস ও সুদর্শন	বশিষ্ঠ।	৫৪। কৃষ্ণদাস কবিরাজ	কস্তুরি মঞ্জরী।
৫। শচীদেবী	যশোমতি।	৫৫। সুকৃতি (শিবানন্দ সেনের স্ত্রী)	বিন্দুমতী।
৬। হাড়াই পণ্ডিত	বাসুদেব।	৫৬। পরমানন্দ	উদ্ধব।
৭। মালিনী	অম্বিকা, ধাত্রী জননী।	৫৭। জগদানন্দ	সত্যভামা।
৮। বনমালী আচার্য্য	বিশ্বামিত্র।	৫৮। দামোদর	শৈব্যাদেবী।
৯। বিষ্ণুপ্রিয়া	রুক্মিণী।	৫৯। শঙ্কর	সুভদ্রা।
১০। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র	শ্রীকৃষ্ণ।	৬০। দময়ন্তী	গুণমালা।
১১। নিত্যানন্দ	বলদেব।	৬১। রাঘব পণ্ডিত	ধনিষ্ঠা।
১২। বসুধা ও জাহ্নবী	সদাশিব।	৬২। শুক্লাম্বর	যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ।
১৩। অদ্বৈত গোসাঞি	সদাশিব।	৬৩। জগদীশ ও হিরণ্য দাস	যাজ্ঞিক পত্নী।
১৪। শ্রীরঘুনন্দন	অপ্রাকৃত কন্দর্প।	৬৪। ভগবান আচার্য্য	প্রভুর কলা।
১৫। বক্রেশ্বর পণ্ডিত	চতুর্ব্যূহ।	৬৫। বনমালী পণ্ডিত	মালা মুসলধারী
১৬। শ্রীবাস	নারদ।	৬৬। গরুড় পণ্ডিত	গরুড়।
১৭। মুরারিগুপ্ত	হনুমান।	৬৭। গোপীনাথ	অক্রুর।
১৮। পুরন্দর	অঙ্গদ।	৬৮। বদনানন্দ	বংশী।
১৯। গোবিন্দদাস	সুগ্রীব।		

বিশ্বাস করেন সুতরাং এই বৈষ্ণব পণ্ডিতদের ঐতিহাসিক জ্ঞান যে খুব প্রখর, তাহা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারা যায় না। অথচ ইহাঁরা গোবিন্দদাসের করচার বিচার কালে নানারূপ অস্ত্র সস্ত্র শানাইয়া ঐতিহাসিক জ্ঞান-গভীরতার পরিচয় দিতে ব্যস্ত হইয়া

* নাম	অবতার	নাম	অবতার
২০। পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি	বৃষভানু।	৬৯। শ্রীধর	সুদামা।
২১। অভিরাম	শ্রীদাম।	৭০। শঙ্কর	গুণসাগর।
২২। সুন্দর ঠাকুর	সুদাম।	৭১। ভাস্কর স্বামী	লীলাধর।
২৩। ধনঞ্জয়	বসুদাম।	৭২। মকরধ্বজ	ইন্দুমুখ (গায়েন)।
২৪। গৌরীদাস	সুবল।	৭৩। লোকনাথ কবিচন্দ্র রামনাথ শ্রীনাথ	
২৫। নীলাম্বর	গর্গমুনি।		সনকাদির অবতার।
২৬। কমলাকর পিপলাই	মহাবল।	৭৪। কাশীমিশ্র	কুব্জা।
২৭। পুরুষোত্তম	স্তোক কৃষ্ণ।	৭৫। মুকুন্দ	মধুকর।
২৮। উদ্ধারন দত্ত	সুবাহু।	৭৬। বাসুদত্ত	মধুব্রত।
২৯। কৃষ্ণদাস ঠাকুর	লবঙ্গ কালিয়া।	৭৭। প্রতাপরুদ্র	ইন্দ্রদ্যুম্ন।
৩০। বৃন্দাবন দাস	মধুমঙ্গল।	৭৮। সার্ব্বভৌম	বৃহস্পতি।
৩১। গদাধর দাস	লক্ষ্মী ও রাধিকা।	৭৯। বনমালী	বিদুর।
৩২। নরহরি দাস	মধুমতী।	৮০। কালীদাস	পুলিন্দা দুহিতার অবতার
৩৩। মুকুন্দ	বৃন্দাদেবী।	৮১। মাধবী	মাধব্য সখী।
৩৪। চিরঞ্জীব	সুলোচনা।	৮২। শিখিমাইতী	মালতী।
৩৫। সদাশিব	চন্দ্রাবলী।	৮৩। কাশীশ্বর	শঙ্কর (বৃন্দার দূত)
৩৬। স্বরূপ	ললিতা।	৮৪। গোবিন্দ	ভৃঙ্গ (ঐ)
৩৭। রামানন্দ	বিশাখা।	৮৫। বড় হরিদাস	রক্তক।
৩৮। বনমালী কবিরাজ	চিত্রা।	৮৬। ছোট হরিদাস	পত্রক।
৩৯। গদাধর ভট্ট	সুদেবী।	৮৭। রযামাই	বারিধা।
৪০। সারঙ্গ	রঙ্গদেবী।	৮৮। নন্দাই	পুরিধা।
৪১। প্রবোধানন্দ সরস্বতী	তুঙ্গবিদ্যা।	৮৯। গোপীনাথ আচার্য্য	রত্নাবতী।
৪২। রাঘব	চম্পক-লতা।	৯০। জগদীশ পণ্ডিত	নান্দীমুখী।
৪৩। কাশীশ্বর	ইন্দুরেখা।	৯১। রামানন্দ	কলাবতী।
৪৪। ভূগর্ভ	প্রেমমঞ্জরী।	৯২। সত্যরাজ	ভানুমতী।
৪৫। শ্রীরূপ	রূপমঞ্জরী।	৯৩। আচার্য্যরত্ন	চন্দ্র।
৪৬। সনাতন	লবঙ্গমঞ্জরী।	৯৪। বিশ্বেশ্বর	দিবাকর।
৪৭। রঘুনাথ দাস	রতিমঞ্জরী।	৯৫। গোবিন্দ আচার্য্য	বড়াই।
৪৮। রঘুনাথ ভট্ট	রসমঞ্জরী।	৯৬। শ্রীকান্ত সেন	কাত্যায়নী।
৪৯। লোকনাথ	লীলামঞ্জরী।	৯৭। জগন্নাথ পণ্ডিত	দুর্ব্বাসা
৫০। গোবিন্দ	কলাবতী।	৯৮। দেবানন্দ	গর্গমুনি।

পড়িয়াছেন। যদি করচার ভুল তাহারা বাহির করিতে চান, তবে একবার তাঁহাদের "প্রামাণিক" গ্রন্থ গুলির ঐতিহাসিক সত্যতার পরিচয়ও ভাল করিয়া লউন। সেখানে যে শত শত ছিদ্র গর্ত্তের মত হাঁ করিয়া আছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুথিশালায় এই অবতার-বাদ প্রচারক বহু প্রাচীন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে। যে চৈতন্য প্রভুর সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন "নিরবধি দাস্য ভাবে প্রভুর বিহার। মুই কৃষ্ণদাস বই না বলায় আর॥ হেন কার শক্তি নাই সম্মুখে তাহানে। ঈশ্বর করিয়া বলিবেক দাস বিনে॥" (চৈ-ভা, অন্ত্য-১০ শ্লোক) তিনি কখনও এই অবতারবাদের পক্ষপাতী হইতে পারিতেন না।

রায়বাহাদুর রসময় মিত্র লিখিয়াছেন * যে তিনি বহুদিন যাবত চৈতন্যচরিতামৃতের সঙ্গে করচার ভাব ও ভাষার অনৈক্য দেখিয়া উহা জাল প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় ছিলেন। দৈব-ক্রমে জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় তাঁহার একখানি পুস্তক পাঠ্য করিবার চেষ্টায় তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন। এই সুযোগ পাইয়া তিনি গোস্বামী মহাশয়ের পুস্তক পাঠ্য করিবার লোভ-প্রদর্শন পূর্ব্বক করচার অন্তত প্রথমাংশ যে জাল তাহা কবুল করিতে অনুরোধ করিলেন এবং তদুত্তরে তিনি গোস্বামী মহাশয়ের যে যে আকার ইঙ্গিত পাইলেন তাহাতে তাঁহার স্পষ্ট ধারণা হইল যে করচার কতকাংশ তিনি জাল করিয়াছেন। পুস্তক পাঠ্য করিবার লোভ দেখাইলে গ্রন্থকারদের নিকট হইতে ঐরূপ আকার ইঙ্গিত পাওয়া খুব কঠিন নহে। এসম্বন্ধে বনোয়ারী বাবুর পত্র হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি "রসময় আমা অপেক্ষা বয়সে ছোট, সুতরাং যে সময় করচা বাহির হয় তখন তিনি green horn। তাঁহার বংশের সহিত আমাদের বংশে কোন কালে সখিত্ব ছিল না। বাবার বন্ধুগণকে আমি প্রায়ই চিনিতাম। রসময় যে তাঁহার হৃদয়ের বন্ধু ছিলেন, তাহা আমি জানিতাম না। যদি পণ্ডিত মহাশয় জাল করিয়া করচা বাহির করিতেন, তাহা হইলে সে কথা পথের আলাপী, গাড়ীর সহযাত্রী রসময়ের নিকট রসোদ্গার অবশ্যই করিতেন না। পাপগোপন লোকের স্বভাব, স্বকৃত পাপ প্রচার করিবার জন্য প্রবীন গোস্বামী রসময়-ডঙ্কা গলায় বাঁধিয়া কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় বাহির হইয়াছিলেন, এমন কথা কাহারও বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি হইবে না।"

যাঁহারা শিক্ষিত হইয়াও এরূপ ভাবে করচাকে মিথ্যা প্রমাণ করিতে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের উপর আমার বিশেষ অশ্রদ্ধার কারণ নাই—যেহেতু তাঁহারা সংস্কারান্ধ হইলেও

---

* রসময় মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন "আমি তাঁহাকে (জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়কে) বলিলাম "গোস্বামী মহাশয়! যদি অকপট ভাবে আমাকে একটি প্রকৃত কথা বলেন, তাহা হইলে আমি আহ্লাদ সহকারে আপনার বইখানি হেয়ার ও হিন্দু স্কুলে পাঠ্য তালিকা ভুক্ত করিয়া দিব। করচা সম্বন্ধে প্রকৃত কথা কি তাহা আমাকে বলুন—আমার উহার সম্বন্ধে একটা বিশেষ সন্দেহ আছে।"

আনন্দ বাজার পত্রিকা ৩রা ফাল্গুন, ১৩৩১।

কোনরূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়া এরূপ করিতেছেন না। চিরাগত যে সকল বিশ্বাস তাঁহাদের মস্তিষ্ক অধিকার করিয়া বসিয়াছে তাহাদের হাত তাঁহারা এড়াইতে পারিতেছেন না। কিন্তু ইহাদের সংস্কারান্ধতা এক এক সময় কিরূপ উৎকট ভাবে দেখা দেয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখাইব। করচা ৩১ পৃষ্ঠায় এক কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণকায় সন্ন্যাসীর কথা আছে। চৈতন্যদেবকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় প্রেমে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, গোবিন্দ তাহার সম্বন্ধে এই উপলক্ষে লিখিয়াছেন "প্রেমে যেন পোড়া কাষ্ঠ ফুলিয়া উঠিল" কিন্তু গোঁড়া বৈষ্ণব পণ্ডিতটী ভাল করিয়া না পড়িয়াই ভাবিলেন, চৈতন্য দেবকেই "পোড়া কাষ্ঠ" বলা হইয়াছে। তখন তাঁহার কবিত্বময় ক্রোধের উচ্ছ্বাস উছলিয়া উঠিল। যে চৈতন্যদেবের বর্ণ চম্পক-গৌর, যাঁহার কাছে বিদ্যুত হার মানে ও অতসী লজ্জিতা হয়, তাহাকে হতভাগ্য লেখক "পোড়া কাঠ" বলিয়াছে! এইজন্য রাগে গর গর হইয়া তিনি দুই ফরমা ব্যাপক এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা লিখিয়া ছাপাইয়া ফেলিলেন। দৈবাৎ আমার সঙ্গে দেখা হইলে, তিনি তাঁহার ফরমা দুটিতে যে নিতান্ত ভুল বুঝিয়া ক্রোধের অভিব্যক্তি করিয়াছেন তাহা আমি করচা আনিয়া দেখাইয়া দিলাম। তিনি আমার নিকট হইতে ছুটিয়া পালাইয়া সেই দুটি ফর্ম্মা পোড়াইয়া ফেলিলেন, তাহা আর প্রকাশিত হইল না।

কিন্তু অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন দু-চারজন লোক ছাড়া আরও একশ্রেণীর লোক দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা কখনই প্রশ্রয়যোগ্য নহেন, কারণ তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া সত্যের অপলাপ করিতেছেন।

ইহাঁরা পত্রিকার স্তম্ভে, বাজারে ও নানাবিধ সভা সমিতিতে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন যে গোবিন্দ দাসের করচায় লিখিত আছে—মহাপ্রভু বেশ্যাসক্ত ছিলেন। তাঁহারা আরও বলিতেছেন যে চৈতন্যদেবকে গোবিন্দ দাস রমণীসঙ্গলিপ্সু সহজিয়া রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। এমন সকল কথা শুনিলে নিরীহ ভক্তবৃন্দের অবশ্যই নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইবার কথা। এমন অনেক অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত বৈষ্ণব ধনকুবের আছেন যাঁহারা এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন। গোবিন্দ দাসের করচা পড়িবার অনেকেরই সুবিধা হয় নাই। কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তির কথায় প্রতারিত হইয়া শুনিয়াছি যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের আবর্জ্জনা দূর করিবার জন্য তাঁহারা টাকা তুলিয়া একটা ফণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ প্রকাশ্য ভাবে শুধু জয়গোপাল গোস্বামীকে নহে,—আমাকেও জালীয়াত্ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। ইহাঁদের কাহারও কাহারও সততার অভাব দিবালোকবৎ স্বপ্রকাশ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে গোবিন্দ কর্ম্মকার চৈতন্যের বৈরাগ্যের সঙ্গী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন এবং উক্ত চৈতন্যমঙ্গলগ্রন্থ সাহিত্য পরিষদ হইতে নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালীদাস নাথ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩৩১ সালের ২৬ মাঘ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় "কোন বিশিষ্ট বৈষ্ণব" কর্ত্তৃক লিখিত একটী প্রবন্ধে কথিত হইয়াছে যে জয়ানন্দের মাত্র একখানি প্রাচীন পুঁথি ছিল এবং সেই

পুথিখানি নগেন্দ্রবাবুর প্রাচীন পুথিশালায় রক্ষিত ছিল। পুথিখানির পাঠ ছিল "গোবিন্দানন্দ আর" প্রবন্ধকার লিখিতেছেন "দীনেশ বাবুর ঐ পুথিশালায় অবাধ গতিবিধি ছিল" এবং তিনি "গোবিন্দানন্দ আর" পাঠ কাটিয়া "গোবিন্দ কর্ম্মকার" করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং নগেন্দ্রবাবু গয়রহ সম্পাদিত চৈতন্যমঙ্গলে উক্ত ছত্রের পাঠ "গোবিন্দ কর্ম্মকার" রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই "বিশিষ্ট বৈষ্ণবের" লেখা অনুসরণ করিয়া আরও কতকগুলি প্রবন্ধ ভিন্ন ভিন্ন লোক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে,—তাহাতেও আমাকে জালীয়াত প্রমাণিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিস্তর প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুইখানি চৈতন্যমঙ্গলে গোবিন্দ কর্ম্মকারের নাম রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্রাজুয়েটের আর্ট বিভাগের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডাঃ গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ., পি.এইচ্.ডি. মহাশয়ের চিঠিখানি নিম্নে প্রদত্ত হইল। এতৎ সহ সেই প্রাচীন পুথিদ্বয়ের পত্র দুটির ও প্রতিলিপি দেওয়া যাইতেছে। ডাঃ গৌরাঙ্গের চিঠিখানি এইরূপ,—"আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীস্থ বঙ্গীয় প্রাচীন পুথি বিভাগের জয়ানন্দকৃত চৈতন্যমঙ্গলের (নং ৫৪৪ ও ৫৪৫) পুথি দুইখানি দেখিলাম। পুথি দুইখানি প্রায় আড়াই শত বৎসরের পুরাতন। ৫৪৪ নং পুথির ৬২ পৃষ্ঠায় এবং ৫৪৫ নং পুথির ৪২ পৃষ্ঠায় গোবিন্দ কর্ম্মকারের নাম উল্লিখিত দেখিলাম। ইতি শ্রীগৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫।"

"বিশিষ্ট বৈষ্ণব" লিখিয়াছিলেন "নগেন্দ্রবাবু মাত্র একখানি পুথি (যাহাতে তাঁহার কথায় "গোবিন্দানন্দ আর" পাঠ ছিল) দেখিয়া পুস্তকখানি সম্পাদন করেন, তাহাতে আমি "গোবিন্দ কর্ম্মকার" জাল করিয়া নগেন্দ্রবাবুকে প্রতারিত করিয়াছিলাম। প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই অভিযোগের উত্তরে আমাকে নিম্নলিখিত চিঠিখানি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

"সুহৃদ্‌বরেষু, গোবিন্দ দাসের করচার সম্বন্ধে দেখিতেছি আপনার বিরুদ্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। গত ৮ ফাল্গুনের আনন্দবাজার পত্রিকায় "ঐতিহাসিক গবেষণা না ইন্দ্রজাল" প্রবন্ধে লেখক লিখিয়াছেন যে জয়ানন্দের প্রাচীন পুথিতে "নিত্যানন্দ প্রভু গোবিন্দানন্দ আর" এই পাঠ ছিল। "পরে এই পুথি যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে ছাপা হইল, তখন এই পাঠের ভিতরে অপূর্ব্ব সৃষ্টিরহস্য ব্যক্ত হইয়া পড়িল। পাঠ হইয়া পড়িল "নিত্যানন্দ প্রভু গোবিন্দ কর্ম্মকার *" এই সৃষ্টি-রহস্যের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিবে কে?"

---

* লেখক দেখিতেছি প্রকাশিত জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল খানিও দেখেন নাই। তাহার পাঠ "নিত্যানন্দ প্রভু গোবিন্দ কর্ম্মকার" নহে পাঠ "মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য আর গোবিন্দ কর্ম্মকার।"

"সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল আমি ও ৺ কালিদাস নাথ উভয়ে সম্পাদন করি। লেখক মহাশয় এক মাত্র পুথির সাহায্যে উক্ত সম্পাদনের কথা লিখিয়াছেন, বাস্তবিক তাহা নহে। চৈতন্যমঙ্গলের আমি বহু পুথি দেখিয়াছি এবং তাহাতে "গোবিন্দ কর্ম্মকার" পাঠই আছে, কোথাও গোবিন্দানন্দের পাঠ কাটিয়া "গোবিন্দ কর্ম্মকার" বসান হয় নাই। লেখক যে মিথ্যা লিখিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। ভবদীয় শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু ২২।২।২৫ সন।"

চৈতন্যদেব বেশ্যাসক্ত ও সহজিয়া ছিলেন এরূপ কথা করচায় লিখিত আছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা সত্যের আর একটি ঘোর অপলাপ। গোবিন্দের করচায় যেখানে সত্যবাই নামক বেশ্যার কথা আছে (২৪-২৬ পৃষ্ঠা) তাহা নিম্নে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পাঠক বিচার করিবেন, মহাপ্রভুর চরিত্র এই লেখায় উজ্জ্বল হইয়াছে কিম্বা মলিন হইয়াছে। কথিত আছে এক সময় পাবনী গঙ্গার ধারায় ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল। মহাপ্রভুর উদ্দাম ভক্তি গঙ্গাধারায় যে কত পাপীতাপী সেরূপ ভাসিয়া গিয়া তাঁহার পুণ্য প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। নিম্নলিখিত ছত্রগুলি পাঠ করিলে পাঠক সেই ভক্তি গঙ্গার অনাবিল সৌন্দর্য্যের আভাস পাইবেন। ইহা হইতে যাহারা এরূপ উৎকট কদর্থ বাহির করিতে পারেন, তাঁহারা নিজের হৃদয়ের নিকট অকপট, একথা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাঁহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক লোককে উত্তেজিত করিবার জন্য সত্যের অপলাপ করিতে-ছেন ইহাই মনে হয়। করচার লেখা এইরূপ :—

"প্রসাদ পাইনু মুহি অমৃত সমান। হেনকালে আইলা সেথা তীর্থ ধনবান॥ দুইজন বেশ্যা সঙ্গে আইলা দেখিতে। সন্ন্যাসীর ভারিভুরি পরীক্ষা করিতে॥ সত্যবাই লক্ষ্মীবাই নামে বেশ্যাদ্বয়। প্রভুর নিকটে আসি কত কথা কয়॥ ধনীর শিক্ষায় সেই বেশ্যা দুই জন। প্রভুরে বুঝিতে বহু করে আয়োজন॥ তীর্থ রাম মনে মনে নানা কথা বলে। সন্ন্যাসীর তেজ এবে হরে লবে ছলে॥ কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবালা হাসে। সত্যবালা হাসি মুখে বসে প্রভুর পাশে॥ কাচুঁলী খুলিয়া সত্য দেখাইলা গুণ। সতেরে করিলা প্রভু মাতৃ সম্বোধন॥ থরথরি কাঁপে সত্য প্রভুর বচনে। ইহা দেখি লক্ষ্মী বড় ভয় পায় মনে॥ কিছুই বিকার নাই প্রভুর মনেতে। ধাইয়া গিয়া সত্যবালা পরে চরণেতে॥ কেন অপরাধী কর আমারে জননি। এইমাত্র বলি প্রভু পড়িলা ধরণী॥ খসিল জটার ভার ধূলায় ধুসর। অনুরাগে থরথর কাঁপে কলেবর॥ সব এলোথেলো হল প্রভুর আমার। কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্য নাহি দেখে আর॥ নাচিতে লাগিলা প্রভু বলি হরি হরি। লোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দর দরি॥ গিয়াছে কৌপিন খসি কোথা বহির্ব্বাস। উন্মাদ হইয়া নাচে ঘন বহে শ্বাস॥ আছাড়িয়া পড়ে নাহি মানে কাঁটা খোঁচা। ছিঁড়ে গেল কণ্ঠ হইতে মালিকার গোছা॥ না খাইয়া অস্থি চর্ম্ম হইয়াছে সার। ক্ষীণ অঙ্গে বহিতেছে শোনিতের ধার॥ হরি নামে মত্ত হয়ে নাচে গোরারায়। অঙ্গ হইতে অদ্‌ভুত তেজ বাহিরায়॥ ইহা দেখি

সেই ধনী মনে চমকিল। চরণ-তলেতে পড়ি আশ্রয় লইল॥ চরণে দলেন তারে নাহি বাহ্য জ্ঞান। হরি বলে বাহু তুলে নাচে আগুয়ান। সত্যেরে বাহুতে ছান্দি বলে বল হরি। হরি বল প্রাণেশ্বর মুকুন্দ মুরারি॥ কোথা প্রভু কোথায় বা মুকুন্দ মুরারি। অজ্ঞান হইলা সবে এই ভাব হেরি॥ হরি নামে মত্ত প্রভু নাহি বাহ্য জ্ঞান। ঘাড়ি ভাঙ্গি পড়িতেছে আকুল পরাণ॥ মুখে লালা অঙ্গে ধুলা নাহিক বসন। কণ্টকিত কলেবর মুদিত নয়ন॥ ভাব দেখি যত বৌদ্ধ বলে হরি হরি। শুনিয়া গোরার চক্ষে বহে অশ্রু বারি॥ পিচকিরি সম অশ্রু বহিতে লাগিল। ইহা দেখি তীর্থরাম কান্দিয়া উঠিল। বড়ই পাষণ্ড মুঁহি বলে তীর্থরাম। কৃপাকরি দেহ মোরে প্রভু হরি নাম॥ তীর্থরাম পাষণ্ডেরে করি আলিঙ্গন। প্রভু বলে তীর্থরাম তুমি সাধুজন॥ পবিত্র হইনু আমি পরশি তোমারে। তুমিত প্রধান ভক্ত কহে বারে বারে।"

সে সময়ে তিনি একেবারে ভাবাবেশে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন কি ধনশালী তীর্থরামের দেহকেও তিনি পদ-দলিত করিয়াছিলেন। "চরণে দলেন তারে নাহি বাহ্য জ্ঞান।"

"সত্যকে বাহুতে ছান্দি বলে বল হরি" এই ছত্রটী উদ্ধৃত করিয়া একজন করচা-বিরোধী লেখক লিখিতেছেন "এই স্থলে আরও অশ্লীলতা দুষ্ট কথা আছে। তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম না।" (আনন্দ বাজার ১২ মাঘ, ১৩৩১)। কথাগুলির যথাসম্ভব দুষ্টার্থ করিয়াও লেখক তৃপ্ত হন নাই, পাঠকগণকেও আরও মিথ্যা বিভীষিকা দেখাইতেছেন। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিয়া এমন কেহ নাই যে মহাপ্রভুর পরম নির্ম্মল ভগবৎভক্তির ভিন্নার্থ করিতে পারেন। তিনি যে ভক্তি-গঙ্গাদ্বারা তাপদগ্ধ জীবকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলেন, সেই কথাই উদ্ধৃতাংশে দেদীপ্যমান হইয়াছে। যে নির্ম্মল সুধারসে মাতৃস্তন্য, শিশুর ন্যায় নির্ম্মল হইলে তাহা পান করিবার অধিকার জন্মে,—এখানে জলৌকা-বৃত্তির অবকাশ নাই।

একদল সংস্কারান্ধ, অপর দল নানারূপ নিন্দিত উপায় অবলম্বনশীল। এই দুই দলের চেষ্টায় করচার বিরুদ্ধে আন্দোলনটি নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

বর্ত্তমান বৈষ্ণব সাহিত্যে করচার বিশিষ্ট স্থান।

কিন্তু আন্দোলন যতদূরই ব্যাপক হউক না কেন, একথা আমি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছি যে করচাকে ধ্বংস করা এখন কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। একটি মুষ্টিমেয় দল এই আন্দোলনটি বাজে লোকের মধ্যে ফাঁপাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু উদার বৈষ্ণব-মণ্ডলী এই পুস্তককে চৈতন্যদেবের জীবনী সম্বন্ধে অন্যতম প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। যদিও করচার ৫১ পৃষ্ঠা (বর্ত্তমান সংস্করণে ২১ পৃঃ পর্য্যন্ত লেখার সত্যতা সম্বন্ধে অমৃতবাজারের শিশির কুমার ঘোষ

এবং মতিলাল ঘোষ মহাশয়দ্বয় সন্দিহান হইয়াছিলেন, (এবং যে কারণে হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।) তথাপি তাঁহারা ছিলেন গুণগ্রাহী লোক। করচার অনন্যসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব উভয় ভ্রাতাই বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। ৪০৭ গৌরাঙ্গাব্দে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় করচা সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকশিত করেন, তাহাতে এই গ্রন্থের প্রতি তাহার উচ্চ ধারণা প্রতীয়মান হয়। ৪১০ গৌরাঙ্গাব্দে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় শ্রদ্ধাস্পদ মতিলাল ঘোষ মহাশয় করচা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা সংক্রান্ত এরূপ উপাদেয় ও ঘটনাপূর্ণ গ্রন্থ অতি বিরল। * * প্রভুর ভ্রমণকালে গোবিন্দ বরাবরই তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, এবং তাঁহার সমস্ত কার্য্য তিনি স্বচক্ষে দর্শন করেন। * * সুতরাং তাঁহার বিবরণ গুলি যে বিশেষ জীবন্ত ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত, তাহা বলা বাহুল্য। বস্তুত গোবিন্দের বর্ণনাগুলি পাঠ করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে প্রভুর কার্য্য গুলি তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছিলেন। চক্ষুর দর্শন ভিন্ন এরূপ বর্ণনা করা দুঃসাধ্য * * বাঙ্গালী মাত্রেরই এ গ্রন্থপাঠ করা কর্ত্তব্য; এবং যিনি ইহা পাঠ করিবেন তাঁহাকেই স্বীকার করিতে হইবে যে কল্পনা দ্বারা এরূপ বর্ণনা করা অসম্ভব। * * কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায় যে কেবল কৃষ্ণদাসই প্রভুর সহিত দক্ষিণে গমন করেন, গোবিন্দের নাম গন্ধ ও উহাতে নাই। এমন স্থলে গোবিন্দের করচা কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে যদিও চৈতন্যচরিতামৃতে গোবিন্দের নাম দেখা যায় না, কিন্তু তাহাই বলিয়া প্রভুর সহিত যে গোবিন্দ দক্ষিণে গমন করিয়াছিলেন না, ইহা প্রমাণিত হয় না। * * কৃষ্ণদাস কবিরাজ অন্যের মুখে শুনিয়া অনেক পরে কৃষ্ণদাসের কথা তাহার গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন। * * এতদ্ভিন্ন দক্ষিণ-ভ্রমণের পর প্রভুর জীবনীতে এত বৃহৎ বৃহৎ ঘটনা ঘটিয়াছিল যে দক্ষিণে তাহার সঙ্গে কে কে গিয়াছিলেন এ সমস্ত সামান্য বিষয় বলিয়া (কৃষ্ণদাস কবিরাজের উপকরণ-দাতা) দাস-গোস্বামী প্রভৃতির এ সম্বন্ধে ঠিক বিবরণ দেওয়ার তত উদ্যোগ না হওয়ারই কথা। * * জনশ্রুতি দ্বারা তিনিও এই বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ দক্ষিণ হইতে প্রভুর প্রত্যাগমন বার্ত্তা কৃষ্ণদাস নদীয়ায় লইয়া আসেন বলিয়া লোকের মনে বিশ্বাস হয় যে তিনিই মাত্র দক্ষিণে প্রভুর সঙ্গী ছিলেন। ** সে যাহাহউক গোবিন্দের করচা অবিশ্বাস করা যায় না * * এরূপ গ্রন্থ চোখে না দেখিয়া লিখিত হইয়াছে এরূপ মনে ধারনাই করা যাইতে পারে না।"

আধুনিক বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ করচাকে অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। (১) স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার অমিয় নিমাইচরিতের গোটা ষষ্ঠ খণ্ডটা গোবিন্দদাসের করচাকে আশ্রয় করিয়া লিখিয়াছেন। (২) শ্রীখণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর তাঁহার লিখিত "শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই পুস্তক হইতে

বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন (৩) আধুনিক বৈষ্ণবসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা গৌরবে যে সংগ্রহ-পুস্তকখানি অগ্রগণ্য, স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র কৃত সেই সুপ্রসিদ্ধ "গৌরপদতরঙ্গিনী" গ্রন্থে করচা প্রামাণ্যপুস্তক বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে। (৪) প্রভুপাদ মুরারি লাল গোস্বামী (অধিকারী) তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'বৈষ্ণব দিগ্দর্শনী' গ্রন্থে করচা-লেখক গোবিন্দদাসকে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয়ের এই দিগ্দর্শনী বিজ্ঞান-সঙ্গত ভাবে রচিত এবং ইনি প্রত্যেক কথাই বিবিধ প্রমাণের সহিত তন্ন তন্ন করিয়া লিখিয়াছেন। (৫) শ্রীহট্টের বর্ত্তমান কালের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লেখক এবং বৈষ্ণব ইতিহাসের অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় তদ্‌রচিত নানা প্রবন্ধে করচার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন *। অচ্যুত বাবুর শ্রীহট্টের বিরাট ইতিহাস যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাহারা জানেন ইনি গোঁড়া বৈষ্ণব হইয়াও কিরূপ উদার মতাবলম্বী। (৬) "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" পত্রিকা সম্পাদক নবদ্বীপ বুড় শিবতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিদাস গোস্বামী অধুনা বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার বিরাট গ্রন্থ "নীলাচল লীলার" তৃতীয় খণ্ডে তিনি গোবিন্দদাসের করচাকেই মূলতঃ অবলম্বন করিয়া মহাপ্রভুর বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা আমার বিরুদ্ধে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া করচাকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এই হরিদাস গোস্বামীর নাম ও ছিল। কিন্তু শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় আমাকে জানাইয়াছেন "শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের পত্র এই মাত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া তাঁহার নাম দেওয়া হয় নাই।" বস্তুতঃ তিনি করচার কিরূপ অনুরাগী তাহা তাহার "নীলাচল লীলা" পড়িলেই বুঝা যাইতে পারে। (৭) বৈষ্ণব জগতের অন্যতম ঐতিহাসিক শ্রীপাট পানিহাটী নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয়ের সুবৃহৎ "শ্রীগৌরাঙ্গের ভারত ভ্রমণ" নামক পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রেসে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। এই গ্রন্থে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সর্ব্বৈব তিনি করচাকে অবলম্বন করিয়াই লিখিয়াছেন †। (৮) বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত রাধা-গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের একখানি মানচিত্র প্রকাশিত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি উডরফ্ সাহেবপ্রমুখ বহু পণ্ডিত এই মানচিত্রের উচ্চপ্রশংসা করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের করচাই মানচিত্রখানির মূল অবলম্বন। (৯) স্বর্গীয় হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় বৈষ্ণব সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত বহু প্রবন্ধে করচার সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে।

---

* বিশেষরূপে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকার তৃতীয় বৎসরের পঞ্চম সংখ্যায় তৎকৃত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† এই গ্রন্থকারের রচিত 'বৃহৎ বৈষ্ণব চরিতাভিধান' 'দ্বাদশ গোপালের ইতিবৃত্ত' প্রভৃতি গ্রন্থেও করচা মূলতঃ অবলম্বিত হইয়াছে।

(১০) আর একটা কথা এই, যে যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় করচার বিরুদ্ধে নানা-স্থলে সভা করিয়া বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন, তিনিও তাঁহার রচিত "শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার ধর্ম্মগৌরব" পুস্তকে করচা হইতে অনেক কথা প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এখন তিনি মুখ ফিরাইয়া অন্যরূপ কথা বলিতেছেন কেন? অচ্যুতবাবু "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" পত্রিকার তৃতীয় বৎসরের ৫ম সংখ্যায় লিখিয়াছেন "কৈ সে গ্রন্থ ত তিনি এ যাবৎ বাতিল করেন নাই! কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কি জানি কেন করচা এখন তাঁহার কাছে হতাদৃত।"

বর্ত্তমান বৈষ্ণবসাহিত্যের গণ্ডীর বাহিরে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত করচাকে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। (১১) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বঙ্গদেশের ইতিহাসে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় করচাকে অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন। তিনি স্বয়ং দাক্ষিণাত্যের বহু স্থান ঘুরিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং গোবিন্দদাস তথাকার যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়াছেন তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া তিনি বিশেষরূপে এই পুস্তকের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। (১২) হাইকোর্টের স্বর্গীয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তদীয় মহাপ্রভুর উৎকলে ভ্রমণ বিষয়ক পুস্তকে করচাকে বিশেষভাবে আশ্রয় করিয়াছেন।* (১৩) সম্প্রতি শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দাস মহাশয় তাঁহার ইংরেজীতে লিখিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে করচাকে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছেন। (১৪) এই সকল গণ্যমান্য লোকদিগের মধ্যে এই ভূমিকা লেখকের নামটিও জুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। (১৫) সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ অভিধানেও করচার মৌলিকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। যদিও এস্থানে এ কথাটি উল্লেখযোগ্য যে উপরি-উক্ত লেখকদিগের মধ্যেও দুই একজন বর্ত্তমান আন্দোলনের হিরিকে কতকটা ভীত হইয়া পড়িয়া করচার প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াও প্রথম সংস্করণের ভাষার উপর কিছু কিছু কটাক্ষপাত করিয়াছেন। সেরূপ কটাক্ষপাতের কোন কারণ ছিল না, তাহা আমরা পরে দেখাইব।

(১৬) রাণাঘাটনিবাসী শ্রীযুক্ত কুমুদ মল্লিক মহাশয় বিরচিত "নদীয়া-কাহিনীতে" করচার প্রমাণ গৃহীত হইয়াছে।

(১৭) নদিয়া জেলার রিফাইৎপুর গ্রাম-বাসী শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্প্রতি "বৈষ্ণব সাহিত্য" নামক প্রায় চারিশত পৃষ্ঠা ব্যাপক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহাতে করচার প্রমাণ অবলম্বন করিয়া তিনি অনেক কথা লিখিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন "গোঁড়া বৈষ্ণবদিগের নিকট করচার বিশেষ আদর নাই। তাঁহাদের গোঁড়ামির অনুকূল ও সমর্থক নহে বলিয়া করচার প্রতি তাঁহারা তাদৃশ শ্রদ্ধাবান নহেন। সাহিত্যসেবীর পক্ষে এই করচা অতি মূল্যবান সামগ্রী।"

(১৮) ১৩৩৩ বাং জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা "শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ" পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায়

---

* উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় গোবিন্দ দাসের করচা হইতে প্রমাণ স্বরূপ পয়ার উদ্ধৃত করিয়া "গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য" নামক প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

ইহা ছাড়াও ছোট বড় অনেক পুস্তকে ও প্রবন্ধে করচা প্রমাণ স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে।

এই বহুজনাদৃত পুস্তকখানিকে উক্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের সঙ্গে আমিও শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু দৈবদোষে আমিই যেন ইহার একমাত্র পক্ষপাতী এইরূপ ভাবে বিরোধীদল আমার পুস্তক সমূহ আক্রমণ করিতেছেন,—ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? ইহার প্রকাশক ছিলেন পণ্ডিত-প্রবর জয়গোপাল গোস্বামী। তাঁহার সহায়তা করিয়া ছিলেন মদন গোপাল গোস্বামী মহাশয়। ইঁহারা উভয়েই তদানীন্তন বৈষ্ণব সমাজের মুকুট-মণি স্বরূপ ছিলেন। পূজ্যপাদ অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত চৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থে এই দ্বিতীয় মহানুভবকে "কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশাবতংস পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীপাদ মদন গোপাল গোস্বামী প্রভু" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং দুই একটি অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তির বাজে বক্তৃতা এবং সংস্কারান্ধ পণ্ডিতের কথা শুনিয়া যেন কেহ মনে না করেন, যে উদার বৈষ্ণব সমাজ এই মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থের আদর করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। আধুনিক বৈষ্ণব-সাহিত্য করচার মাধুরী ও সুরভিতে ভরপুর।

পর্য্যটকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন।

পর্য্যকদের টিকি ধরিয়া নাড়া দিয়া তাঁহাদের গ্রন্থ মিথ্যা প্রমান করিবার চেষ্টা জগতে এই নূতন নহে। মেনডেজ পিণ্টো (Mendez Pinto) নামক পর্ত্তুগালবাসী পর্য্যটক করচার প্রায় সমকালে (১৫৩৭-১৫৫৮ খৃঃ) দক্ষিণ ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত একবারে অবিশ্বাস্য বলিয়া এক সময়ে কতকগুলি লোক খুব হৈ চৈ করিয়াছিলেন, এমন কি কংগ্রেভ তাঁহার "প্রেমের প্রতিদানে প্রেম" (Love for Love) নামক নাটকে জনৈক মিথ্যাবাদীকে নিন্দাচ্ছলে লিখিয়াছিলেন "হে মিথ্যুকের শিরোমণি! তুমি ফার্ডিনাণ্ড মেণ্ডেজ পিণ্টোরই দ্বিতীয় অবতার।" (২য় অঙ্ক ৫ম দৃশ্য) এই উক্তির দ্বারা পিণ্টোর একটা ব্যাপক দুর্ণামের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এখন তাঁহার সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থের শেষ সংস্করণের সম্পাদক (১৮৫৫) এম্, এ ভ্যাম্ব্রের ভূমিকা পাঠ করিলে তাহার বর্ণনা গুলির সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

মারকো পোলো পর্য্যটকদিগের মধ্যে রাজ-চক্রবর্ত্তী, কিন্তু ভ্যাম্ব্রে বলিতেছেন "এই পর্য্যটক-চূড়ামণি প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে একটু উদাসীন ছিলেন, এই জন্য অনেক কাল পর্য্যন্ত তিনি ইটালীর লোকদের ঘৃণা ও পরিহাসের পাত্র হইয়াছিলেন।" তাঁহার লিখিত বৃত্তান্তগুলি সেই সময়ের মূল্যবান খাটিচিত্র; অথচ বহুকাল তিনি মিথ্যাবাদী বলিয়া অনাদৃত ছিলেন। *

---

* The voyages and adventures of Mendez Pinto.
M. A. Vambray's edition.

করচার বিশেষত্ব।

এখনকার দিনে অতি-প্রাকৃত ঘটনাগুলি ইতিহাসের প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে না। এখন 'শতস্কন্ধ রাবণ বধ', 'হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন' প্রভৃতি তথ্য ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গণ্য হইবে না। চৈতন্যকে এখন তিলক ও তুলসীর পত্রের চাপে লুকাইয়া রাখিবার সময় চলিয়া গিয়াছে। এখন তাঁহার বরাহ মূর্ত্তি সভ্য জগত স্বীকার করিবেন না। শিক্ষিত সম্প্রদায় এখন শুনিতে চান না যে তিনি সুদর্শন চক্রদ্বারা পাপীকে ভীত করিয়াছিলেন, বরঞ্চ প্রেমের কি অমোঘ সন্ধানে পথহারা, কূপে পতিত, দুর্গতির চরমদশা প্রাপ্ত পান্থ তাহার কৃপায় সরল নীতির পথে ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহাই তাঁহারা জানিতে চান। করচায় তদ্রূপ উদাহরণ প্রচুর আছে।

করচার প্রধান গুণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথ্যের সমাবেশে চিত্রগুলি ফুটাইয়া তোলা। যে সকল ঘটনা নিজের কাণ দিয়া শোনা এবং নিজের চোখ দিয়া দেখা, সেইরূপ স্বকর্ণশ্রুত এবং চাক্ষুষ কথায় করচার সমস্ত বর্ণনা সরস ও জীবন্ত হইয়াছে। চৈতন্যপ্রভুর বাড়ীর বর্ণনা উপলক্ষে—"গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর। পাঁচখানি বড় ঘর দেখিতে সুন্দর।" (৪ পৃঃ) —শচী দেবী সম্বন্ধে, "শান্ত মূর্ত্তি শচীদেবী অতি খর্ব্বকায়। নিমাই নিমাই বলি সদা ফুকরায়।" (৪ পৃঃ)—বিষ্ণুপ্রিয়া সম্বন্ধে "লজ্জবতী বিনয়িনী মুখে মৃদু হাস। মুঞি হইলাম গিয়া চরণের দাস।" —অদ্বৈতাচার্য্য সম্বন্ধে "পক্ককেশ পক্কদাড়ী বড় মোহনিয়া। দাড়ী পড়িয়াছে তার হৃদয় ছাইয়া।"(৪ পৃঃ)—খঞ্জনাচার্য্য সম্বন্ধে, "খঞ্জন আচার্য্য আসে গাঢ় অনুরাগে। খোঁড়া বটে তবু আসে সকলের আগে।" (৮৪ পৃঃ)—বলরামদাস সম্বন্ধে "রাম শিঙ্গা বাজাইতে বড়ই পণ্ডিত। বলরাম দাস আসে হয়ে পুলকিত।" (৮৪ পৃঃ) রামদাস সম্বন্ধে "বড় পটু রামদাস ভেরী বাজাইতে। এইজন্য নিত্য আসে কীর্ত্তনের ভিতে।" (৮৬ পৃঃ) নারায়ণ গড়ে "গণ্ডা পাঁচ লাড্ডু খেয়ে উদর পুরিল।"—কাশীমিত্রের বাড়ীতে "অষ্টখানি করলার ভাজা খাই সুখে।" (১৪ পৃঃ) এবং চণ্ড-পুরের নিকট "দুইটী নারিকেল ভিক্ষা" (৪৮ পৃঃ) প্রাপ্তি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণনা বাস্তবরাজ্যের কথা বহিয়া আনিতেছে। এইজন্য মতিবাবু লিখিয়াছেন, "চক্ষুর দর্শন ভিন্ন এরূপ বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।" এবং মুন্সেফ শ্রীযুক্ত মন্মথ কুমার রায় বি, এল মহাশয় ফরওয়ার্ড কাগজে লিখিয়া-ছিলেন, "Such a book full of so many and so varied geographical and historical details could not be written by any man unless he personally visited and witnessed the happening of the events recorded in the Karcha" ("কোন ব্যক্তি করচার বর্ণিত ঘটনারাশি এবং স্থান সমূহ স্বয়ং প্রত্যক্ষ না করিয়া এরূপ বহু ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বৃত্তান্ত সম্বলিত পুস্তক লিখিতে পারেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।") চৈতন্যপ্রভু কোথায় কখন গিয়াছেন এবং কতদিন রহিয়াছেন তাহা তদীয় সহচর পথে চলিতে চলিতে নোট করিয়া গিয়াছেন। "বৈশাখের সপ্তম দিবসে" চৈতন্যদেব

পুরী হইতে রওনা হন (২১ পৃঃ)। "আশ্বিনের শেষদিনে বরদা নগরে। ফিরিয়া আসিয়া প্রভু হরিনাম করে॥" (৭৬ পৃঃ) "মাঘী পূর্ণিমার দিনে" তিনি তাম্রপর্ণীতে স্নান করেন। (৪২ পৃঃ) "পহিলা আশ্বিনে মোরা দ্বারকাতে যাই।" (৭৩ পৃঃ) এবং "মাঘের তৃতীয় দিনে মোর গোরা রায়। সাঙ্গপাঙ্গ সহ মিলি পুরীতে পৌছায়।" (৮৪ পৃঃ) এরূপ বর্ণনা দুটী একটি নহে,. বহু। প্রত্যক্ষদর্শীর কথা বলিবার ভঙ্গী দেখিলে তাহাতে কাহারও ভুল হইবার সম্ভাবনা হয় না।

যাঁহারা চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িয়াছেন, তাঁহারা চৈতন্যদেবের বরাহরূপে গর্জ্জন এবং ধরারূপী কলসীকে দন্তাগ্রে ধারণ, সিংহরূপে কাজীর বক্ষে নখাঘাত, দামোদররূপে বহুলোকের ভক্ষ্য একাকী ভোজন, অনন্তশায়ী কৃষ্ণরূপে অপোগণ্ড শৈশবাস্থায় করাল কালসাপের পৃষ্ঠে শয়ন—প্রভৃতি নানারূপ অদ্ভুত লীলার পরিচয় পাইয়াছেন, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বৈষ্ণবদিগের ইহার সমস্তই মানিয়া লইতে হইবে। না মানিয়া লইলে কবিরাজ গোস্বামীর অভিশাপ আছে। "অলৌকিক লীলায় যার না হয় বিশ্বাস ইহলোক পরলোক হয় তার নাশ॥" "বিশ্বাস করিয়া শুন তর্ক না করিহ চিত্তে।" (চৈ চ মধ্য, সপ্তম পঃ ৭৮ শ্লোক এবং ৮ম পঃ ১৯২ শ্লোক) চৈতন্য ভাগবত শুধু পরলোকের ভয় দেখাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, ইহলোকের শাস্তির ভারও কতকটা নিজের হস্তে নিয়াছেন। যে ব্যক্তি তৎবর্ণিত অলৌকিক লীলায় অবিশ্বাস করিবে, তাহার জন্য তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন "তবে লাথি মারি তার মাথার উপরে।"

এই সকল লাথি-গুতা খাইয়া এবং ইহলোক পরলোক নাশ করিয়াও ঐতিহাসিককে একটু সাবধান হইয়া চলিতে হইবে বৈকি? কিন্তু মহাপ্রভুর উৎকট ভৈরব লীলার পার্শ্বে করচা-অঙ্কিত ছবিটিকে দাঁড় করুন। গোবিন্দদাস তাহাকে এই অতি-প্রাকৃতের মহিমা বিভূতিতে অদ্ভুত করিয়া চিত্রিত করেন নাই। কোথায়ও "ছিন্ন এক বহির্বাস পাগলের বেশ।" (৬১ পৃঃ) কোথায়ও "ধূলা মাখা জটা বাঁধা অন্য কথা নাই। পথে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি চলিছে নিমাই॥" (৩৩ পৃঃ) এবং অন্যত্র "ক্ষেপা হরিবোলা বলে প্রভুরে সকলে। ক্ষেপাইতে কত লোক হরিবোল বলে॥" (৩৯ পৃঃ) রসালকুণ্ডে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ "ভণ্ড দুরাচার" বলিয়া গালি দিতেছে, অথচ তিনি উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ পাইয়াও পাপীদলনের জন্য সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করেন নাই। কোন স্থানে "ত্রিরাত্র চলিয়া গেল বৃক্ষের তলায়। অনাহারে উপবাসে কিছু নাহি খায়॥ বহিছে হৃদয়ে দর দর অশ্রুধারা। শত ডাকে কথা নাই পাগলের পারা॥" (২৯ পৃঃ) "অনাহারে শীর্ণ দেহ চলিতে না পারে। তবু প্রভু হরিনাম দেন ঘরে ঘরে॥ সে দেশের লোক সব করে কাই মাই। তথাপি বিলান নাম চৈতন্য গোসাই॥ যেইজন প্রভুকে দেখয়ে একবার। চলিয়া যাওয়ার শক্তি না হয় তাহার॥" (২৯ পৃঃ) এবং যখন তিনি কৃষ্ণনাম দিতেছেন, তখন "ছুটিল পথের গন্ধ বিমোহিত করি। অজ্ঞান হইয়া নাম করে গৌরহরি॥ প্রভুর মুখের পানে সবার নয়ন।

ঝরঝর করি অশ্রু পড়ে অনুক্ষণ॥ বড় বড় মহারাষ্ট্রী আসি দলে দলে। শুনিতে লাগিল নাম মিলিয়া সকলে॥ পশ্চাত ভাগেতে মুঞি দেখি তাকাইয়া। শতশত কুলবধূ আছে দাঁড়াইয়া। অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্ন্যাসী আসিয়া। হরিনাম শুনিতেছে নয়ন মুদিয়া॥ ভক্তিভরে হরিনাম শুনিছে সকলে। নারীগণ অশ্রুজল মুছিছে আঁচলে॥" (৫১ পৃঃ)

এই অনশন-ক্লিষ্ট শীর্ণ-দেহ চৈতন্যদেব কি বহুভোজী দামোদর ও প্রলয়ঙ্কর নৃসিংহের অবতার হইতে মাধুর্য্যের হিসাবে আমাদের প্রিয়তর নহে? করচা চৈতন্যজীবনের একটি মুষ্টি ভিক্ষা হইতে পারে, কিন্তু তাহা স্বুবর্ণ মুষ্টি।

বৈষ্ণব ভক্তগণ ছাড়া যাঁহারা মাঝে মাঝে মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করিতেন, তাঁহাদের নাম প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিতে বর্জ্জিত হইয়াছে; কারণ পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণব সমাজে সেই সকল লোকের নাম মনে রাখিবার মত কাহারও দরকার হয় নাই। গোবিন্দদাস সেই সকল উপলক্ষে উপস্থিত থাকায় তখন তখন তাহাদের নাম টুকিয়া রাখিয়াছেন। চৈতন্যপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের সময় বৈষ্ণব ভক্তদের সঙ্গে সঙ্গে "পণ্ডিতের শিরোমণি চণ্ড চণ্ডেশ্বর", শম্ভুচন্দ্র, কাশীশ্বর ন্যায়রত্ন, সিদ্ধেশ্বর, রামরত্ন, পঞ্চানন বৈদান্তিক প্রভৃতি কয়েকজন অজ্ঞাতনামা অথচ বড় পণ্ডিতের নাম পাওয়া যাইতেছে। (১২ পৃঃ) দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণের সময় তিনি যে সকল স্থানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা চক্ষে না দেখিয়া অপরে কিরূপে জানিতে পারিবে? পূর্ণনগরের (পুনা) নাম অবশ্য মানচিত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু তথায় যে 'অচ্ছ সরো বর' আছে তাহা ত ম্যাপে নাই। অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি যে গোবিন্দ বর্ণিত 'অচ্ছ সরোবর' এখনও তথায় আছে। খাণ্ডবা দেবতা যে আছেন, তাহাই বা কে জানিতে পারিত? তথাকার সেবাদাসী হতভাগিনী মুরারিদের কথাই বা না দেখিয়া কে লিখিতে পারিত? অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে সেবাদাসী মুরারিরা এখনও খাণ্ডবার মন্দিরে বাস করিতেছে। ভীলপন্থ, নারোজী, ভর্গদেব, ভবভূতি শেঠ, আদি নারায়ণ, ঢুণ্ডীরাম, বালাজী, তল্ল মহারাজ, মাধবেন্দ্র-ভূজা, ডাকোরজী, রণছোড়জী প্রভৃতি অদ্ভুত অদ্ভুত নাম কি মাথা হইতে তৈয়ারী করা স্বাভাবিক? যে সকল স্থান সম্বন্ধে ঐ সকল নামের উল্লেখ হইয়াছে তৎ তৎ স্থলে উক্ত প্রকারের নাম এখনও প্রচলিত।

কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা যে করচায় আছে যাহা চোখের দেখা না হইলে লোকে লিখিতে পারে না—তাহার ইয়ত্তা নাই—"দেখিলে সে ঝারি খণ্ড কাঁপয়ে শরীর। বহুদূর গিয়া পাই ক্ষুদ্র এক খাল। সেই খানে স্নান করে শরীর জুড়াল।" (৭২ পৃঃ) একটা বন্য ফলের প্রসঙ্গে "চৌশিয়া সিজ সম যেই গাছ শোভে। কামরাঙ্গা সম হয় ফলের গঠন।" (৭১ পৃঃ), কিঞ্চকাঞ্চীতে "নিত্য দুইমণ ক্ষীরে পায়সান্ন হয়," (৩২ পৃঃ) ত্রিকাল ঈশ্বর প্রসঙ্গে "চারি হস্ত পরিমিত গৌরীপট্ট তার" (৩২ পৃঃ) ভদ্রা নদীর তীরে "চাম্পিফল খাই যাহা পাই ভিক্ষা করি।" (৩২ পৃঃ) ত্রিপাত্রপুরের শিব মন্দিরে—"করিলে ববোম্ শব্দ তাহার মন্দিরে। প্রতিধ্বনি করি শব্দ দণ্ডকাল ফিরে॥" (৩৭ পৃঃ)

চন্দ্রপুর ছাড়িয়া "দুই দিবা রাত্রি যাই পর্ব্বত ভেদিয়া। তার মধ্যে গ্রামপুরী না পাই খুঁজিয়া॥ বড়ই দুর্গম পথ চলিতে না পারি। কেবল কদম্ব বৃক্ষ দেখি সারি সারি।" (৪৮ পৃঃ) ইত্যাদি বর্ণনা কল্পনা হইতে উদ্ভূত বলিয়া কিছুতে মনে হইবে না।

করচার প্রথম পৃষ্ঠায়ই লিখিত আছে যে গোবিন্দ দাসের স্ত্রী ঝগড়া করিয়া তাঁহাকে নির্গুণ ও মূর্খ বলিয়া গালাগালি দেয়। এই ভাবে স্ত্রীর নিকট অপমানিত হইয়া গোবিন্দ দাস গৃহত্যাগী হন। সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে চৈতন্য যখন কাঞ্চননগরের পথ দিয়া যাইতে ছিলেন, তখন শশিমুখী সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া গোবিন্দের পায়ে পড়িল এবং করুণভাবে বিলাপ করিতে লাগিল। চৈতন্যদেব তাহাকে তত্ত্ব কথা দ্বারা নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু "শুনিয়া প্রভুর সেই কথা আচম্বিতে। চক্ষু চাপি আঁচলেতে লাগিলা কান্দিতে॥" সাধ্বীর করুণ ক্রন্দনে "প্রভুর দয়া উপজিল। অমনি ফিরিয়া মোরে কহিতে লাগিল॥ প্রভু কয় গোবিন্দেরে গৃহে থাক তুমি। অন্য ভৃত্য সঙ্গে করি পুরী যাই আমি।" (১৩ পৃঃ)

যে ব্যক্তি চৈতন্যসঙ্গের আস্বাদ পাইয়াছে, সে আবার সংসারে আবদ্ধ হইবে কিরূপে? গোবিন্দ দাস শশিমুখীর হাত এড়াইয়া স্বীয় বন্ধুবান্ধবগণের যুক্তিতর্ক ব্যর্থ করিয়া আবার চৈতন্যদেবের অনুবর্ত্তী হইলেন। তারপর যখন দুই বৎসর পরে চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণান্তর পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন শশিমুখী লোকমুখে অবশ্য তাঁহার খোঁজ লইয়াছিল। সে কালে পুরীর পথ সহজ ছিল না। প্রেমদাসকৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদীতে পুরীর পথে ঘাটিয়ালদের যে সকল দৌরাত্ম্যের কথা আছে তাহাতে মনে হয় সে সময় যে কোন ব্যক্তি বঙ্গদেশ হইতে পুরীতে যাইতে হইলে আতঙ্কিত হইতে। শিবানন্দসেনের মত প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তির আশ্রয়ের উপর নির্ভর করিয়া কয়েকজন বাঙ্গালী ভক্ত মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন। ঘাটিয়ালদের দৌরাত্ম্য এরূপ ভয়ানক ছিল যে একবার শিবানন্দ সেনও তাহাদের দ্বারা কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।

তৎসময়ে (ষোড়শ-শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে) পুরীর পথ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অতি দুর্গম ছিল। সুতরাং শশিমুখী সম্ভবতঃ লোকমুখে তাহার স্বামী সম্বন্ধে সংবাদ লইয়াছিল। একবার যেরূপ চৈতন্য গোবিন্দকে গৃহে ফিরিয়া যাইবার আদেশ করিয়াছিলেন, এবারও শশিমুখীর কাতরতা দেখিলে তিনি হয়ত তাহাই করিবেন, সম্ভবতঃ এইভয়ে গোবিন্দদাস আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। করচার প্রথমাংশে তাহার নিজ সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিচয় আছে, এবং অনেক পত্রেই তাহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং ধরা পড়িবার ভয়ে তিনি করচাখানি একবারে গুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, "করচা করিয়া রাখি অতি সঙ্গোপনে" অর্থাৎ করচা তিনি সাধ্যানুসারে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই জন্যই চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদীতে দৃষ্ট হয় যে কেহ তাঁহার বাড়ী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিতেন 'আমার বাড়ী উত্তর রাঢ়।' অবশ্য কাঞ্চন নগর উত্তর রাঢ়েরই অন্তর্গত, কিন্তু গ্রামের নাম ও আত্মপরিচয়ের

অনুল্লেখ দৃষ্টে যেন একটা সাবধানতা সূচিত হইতেছে বলিয়াই মনে হয়। শশিমুখীর চরিত্রের যে পরিচয় এই করচায় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সে যদি জানিতে পারিত যে তাহার স্বামী পুরীতে আছেন, তবে সে বনজঙ্গল অতিক্রম করিয়া নিশ্চয়ই পুরীতে আসিত এবং মহাপ্রভুর মন দ্রব করিয়া গোবিন্দদাসকে পুনরায় গ্রেপ্তার না করিয়া ফিরিত না।

করচা এই ভাবে গোবিন্দ দাস "অতি সঙ্গোপনে" রাখিয়াছিলেন এবং সে কথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। বহুকাল পর্য্যন্ত এই পুস্তক গুপ্ত ছিল। এইজন্য চৈতন্য ভাগবতকার, চৈতন্য চরিতামৃতকার প্রভৃতি গ্রন্থকারের এই পুস্তক সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি যে মহাপ্রভুর বৈরাগ্যের সময় ও তাহার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার সহচর ছিলেন এবং তাহার সঙ্গে দাক্ষিণ্যাতে গিয়াছিলেন, একথা কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের বৈরাগ্যখণ্ডে চৈতন্য-সহচর গোবিন্দ কর্ম্মকারের নাম উল্লিখিত আছে, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। এই জয়ানন্দ মহাপ্রভুর সমসাময়িক ব্যক্তি। প্রায় ৩৭৫ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ কবি বলরাম দাস তাহার এক পদে গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া যে চৈতন্য দাক্ষিণাত্য গিয়াছিলেন তাহা অতি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন (গৌরপদতরঙ্গিনী ৪০৪ পৃঃ) ১৩৩২ সালের শ্রাবণের প্রবাসীতে (৪২১ পৃঃ) একজন 'বিজ্ঞানসঙ্গত' প্রবন্ধ লেখক লিখিয়াছেন, বলরামদাস যখন মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণের সহচর স্বরূপ গোবিন্দের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তখন অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হইবে যে গোবিন্দ নামে কোন ব্যক্তি চৈতন্যদেবের সহিত তথায় গিয়াছিলেন। কিন্তু এই গোবিন্দই যে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের ইতিহাস অর্থাৎ করচা লিখিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ কি? (অবশ্য করচার প্রতি পত্রেই লেখা আছে গোবিন্দ মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সহচর ছিলেন) এই প্রশ্নের বিজ্ঞান কিছুতেই বোধগম্য হইল না। এক হয় প্রশ্ন পড়িয়া আমার মাথা ঘোলাইয়া গিয়াছিল, নতুবা প্রশ্ন করার সময়ে প্রশ্নকর্ত্তার মাথা ঠিক ছিল না।

এখন প্রাচীন গ্রন্থাদির সাক্ষ্যে প্রমাণিত হইল যে গোবিন্দ কর্ম্মকার নামক জনৈক ব্যক্তি চৈতন্যদেবের সঙ্গী ছিলেন এবং প্রভুর সহিত দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং সেই ভ্রমণ-কাহিনীর সমস্ত কথাই করচাখানিতে পাওয়া যাইতেছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সাক্ষ্য দিয়াছেন যে সেই করচার কীটদষ্ট জীর্ণ পুথি তাঁহারা দেখিয়াছিলেন। এখন প্রবাসীর লেখক বলিতেছেন যে কীটদষ্ট ও জীর্ণ হইলেই যে পুথি প্রাচীন তাহার প্রমাণ কি? লেখক নিশ্চই অত্যন্ত বিজ্ঞান-সঙ্গত হইতে চেষ্টা পাইতেছেন, তাঁহার সাবধনতায় আমাদের হাসি পায়। কিন্তু রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যিনি ৪০ বৎসরের উর্দ্ধকাল হইল জয়গোপাল গোস্বামীর নিকট এই পুথিখানি দেখিযাছিলেন, তিনি লিখিতেছেন 'old' অর্থাৎ প্রাচীন, 'worn out condition' অর্থাৎ অতি জীর্ণ অবস্থা। ইহার পরে উক্ত লেখক আবার গবেষণা-মূলক কি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করিবেন, তাহা ভাবিতে স্বভাবতই আতঙ্ক জন্মে।

অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে গোবিন্দ দাসের উল্লেখ

এই কয়েকখানি পুস্তকই সমস্ত নহে। 'চৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী'তে গোবিন্দ দাসের একটি বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই গোবিন্দই করচা-লেখক বলিয়া আমাদের ধারণা। উক্ত পুস্তকের যে পুথি আমরা পাইয়াছি, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার এবং তাহার নম্বর ২১৪৫। পুথি খানি ১৬০৪ শকে রচিত। করচায় দৃষ্ট হয়, চৈতন্য প্রভুর আদেশে তাঁহার চিঠি লইয়া গোবিন্দদাস শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট প্রেরিত হন। 'চৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী'তে গ্রন্থকার প্রেমদাস খুব সম্ভব গোবিন্দ দাসের পরবর্ত্তী কতকগুলি ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন। তাহাতে গোবিন্দদাস প্রথমতঃ শ্রীখণ্ডে যাইয়া নরহরি সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ পূর্ব্বক কিরূপে অদ্বৈতগৃহে গিয়াছিলেন এবং পরে কাঁচড়াপাড়া আসিয়া শিবানন্দ সেনের সঙ্গে পুরীতে মহাপ্রভুর নিকটে ফিরিয়া আসেন, তাহা লিখিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে আসিয়া তিনি আত্মগোপন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, সেই সাবধানতা এই কাহিনীতে দৃষ্ট হয়। তিনি নিজকে 'বিদেশী' এবং 'উত্তররাঢ় নিবাসী' বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন—কাঞ্চননগর অবশ্য উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত।

বৃন্দাবন দাসের সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্য ভাগবতে দৃষ্ট হয় চৈতন্যের সন্ন্যাসের সময় গোবিন্দ তাঁহার সঙ্গী ছিলেন, একথা অচ্যুত বাবুও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকায় ভাল করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। করচার লেখার সঙ্গে এস্থলে চৈতন্য ভাগবতের কথার ঐক্য দৃষ্ট হয়। "নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ সংহতি। গোবিন্দ পশ্চাতে আগে কেশব ভারতী" (অন্ত্য ১ম)। ১৩৩১ সনের ২৬শে মাঘের আনন্দবাজার পত্রিকায় 'বিশিষ্ট বৈষ্ণব' লিখিয়াছেন যে মহাপ্রভুর তৎকালীন সঙ্গী যে গোবিন্দের নাম চৈতন্য-ভাগবতে পাওয়া যায়, তিনি "গোবিন্দানন্দ।" কিন্তু এই গোবিন্দ যে বাসু ঘোষের ভ্রাতা 'গোবিন্দানন্দ' নহেন, তাহা চৈতন্য ভাগবতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "রমাই গোবিন্দানন্দ শ্রীচন্দ্রশেখর। বাসুদেব শ্রীগর্ভ শ্রীমুকুন্দ শ্রীধর॥ গোবিন্দ জগদানন্দ নন্দন আচার্য্য।" এখানে গোবিন্দ ও গোবিন্দানন্দ যে দুই পৃথক ব্যক্তি তাহা স্পষ্টই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চৈতন্য ভাগবতে আরও দুই একটি জায়গায় গোবিন্দের উল্লেখ আছে *। গোবিন্দ কর্ম্মকার যে বৈরাগ্যের সময় ও তৎপূর্ব্ব হইতে মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন, তাহা যখন প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে জয়ানন্দ স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন, এবং কিঞ্চিন্ন্যূন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ কবি বলরাম-দাসও জানাইয়াছেন এবং করচা সেই প্রমাণকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে, তখন চৈতন্য ভাগবতোক্ত এবং চৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদীর উল্লেখকে আমরা অন্যতম প্রমাণ স্বরূপ নিশ্চয়ই গ্রহণ করিতে পারি।

---

* "দেখি জিজ্ঞাসেন প্রভু গোবিন্দের স্থানে। এ বেটা আমাকে দেখি পলাইল কেনে?" (চৈ, ভা, আদি ৭ম পঃ)

অভিযোগের উত্তর

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গোবিন্দ দাসের করচাকে উড়াইয়া দিবার জন্য ইহাকে যেরূপ তোপের মুখে ফেলা হইয়াছে যে কোন ঐতিহাসিক দুর্গ তাহাতে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইতে পারিত। প্রত্যেকটি ছত্র লইয়া চুল চেরা বিচার ও তর্কবিতর্ক। যে কোন বিবরণীকে এ ভাবে আক্রমণ করিলে তাহাকে পাড়িয়া ফেলা যায়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই তোপের মুখটা একটু ঘুরাইয়া ধরিয়া গোঁড়া বৈষ্ণবদের প্রামাণিক গ্রন্থ সমূহের উপর লক্ষ্য সন্ধান করিলে তাহারা একদিনে উড়িয়া যাইত। সোয়া চারিশত বৎসর পূর্ব্বের কথা, সুতরাং অভিযোগগুলি অনেকই শুধু কল্পনা ও অনুমানের উপর দাঁড়াইয়া আছে। এই অভিযোগগুলির কয়েকটি নিতান্ত হাস্যাস্পদ। যাঁহারা করচার প্রথম সংস্করণের একান্ন পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত জাল মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জনৈক বিখ্যাত ব্যক্তি ৪১০ গৌরাঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় এইরূপ অভিযোগ করিয়াছেন।

১। করচায় লিখিত আছে যে গোবিন্দের পেট ফুলিলে চৈতন্যপ্রভু তাহার দেহে শ্রীহস্ত বুলাইয়াছিলেন। অভিযোগকারীর মতে ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। যেহেতু চৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান। তিনি একটি হীন ভৃত্যের দেহে হস্ত বুলাইতে যাইবেন, ইহা অসম্ভব।

২। করচাতে লিখিত আছে (অভিযোগকারীর মতে) যে কাশীমিত্রের বাড়ীতে "প্রভু উদর পূর্ত্তি করিয়া খাইলেন।" কিন্তু "উদর পূর্ত্তি" করিয়া খাওয়ার কথা ত করচায় নাই। তবে তিনি আহার করিয়াছিলেন ইহা লিখিত আছে, কিন্তু অভিযোগকারী বলেন "সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তিনি (মহাপ্রভু) অন্নভোজন একরূপ পরিত্যাগ করেন, কেবল নাসিকা দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন।"

এরূপ অদ্ভুত কথা ত এইখানে এই প্রথম শুনা গেল। এই সকল গোঁড়া বৈষ্ণবদলের নানারূপ আজগুবী সংস্কার সম্বন্ধে বাক্য ব্যয় করা অনাবশ্যক। করচা হইতে উক্ত স্থানটি উদ্ধৃত হইল। "প্রভু বলে এই চাউল বড় চিকণিয়া। ইহারে ডাকয়ে লোকে কি নাম ধরিয়া॥ মিত্র বলে জগন্নাথ ভোগ ইহার নাম। ভোগ লাগাইলে হয় পূর্ণ মনস্কাম॥ জগন্নাথ ভোগ শুনি প্রভু চমকিলা। অমনি প্রেমের ধারা বহিতে লাগিল॥" (১৪ পৃঃ) এই বর্ণনার সহিত চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত মহাপ্রভুর পুরীতে প্রসাদ ভক্ষণের কথার ঐক্য আছে, যথা:—"তার অল্প লঞা জীহ্বাতে যদি দিল * * কোটি অমৃতের স্বাদ পাইয়া প্রভুর চমৎকার। সর্ব্বাঙ্গে পুলক নেত্রে বহু অশ্রুধার॥ (চৈ, চ, অন্ত)

৩। আপত্তি কারক লিখিয়াছেন—গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট খাইতেন, তৎকৃত এই উক্তিও বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ তাঁহার উচ্ছিষ্ট খাওয়ার জন্য শত শত ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। এই তর্কের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

৪। প্রবাসী লেখকের (১৩৩২, শ্রাবণ) একটি অদ্ভুত মত এই যে করচাখানি ইদানীন্তন কালে জাল হয় নাই, ইহা জাল হইয়াছিল ১৫১২ কি ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে। তিনি বলেন যে খুব সম্ভব "প্রভুর প্রত্যাগমনের পর তাহার সঙ্গী কৃষ্ণদাসের (অথবা যে কেহ তাহার সঙ্গী ছিলেন) তাঁহার কাছে কোন ভক্ত দক্ষিণের তীর্থস্থানের নামগুলি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, কিংবা যখন পুরীতে আসিয়া প্রথম রাত্রে প্রভুর ভক্তেরা সেই সকল কথা শুনিয়া থাকিবেন, সেই সময় কেহ করচা করিয়া রাখিবেন।" অনুমান ও কল্পনা দ্বারা উপন্যাস রচনা করা যায়, কিন্তু ইতিহাস লেখা যায় না।

৪। প্রবাসীর লেখক জানাইতেছেন, গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে ভ্রমণের সময় বৃদ্ধ ছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ একটি ছত্র উদ্ধৃত হইল। গোবিন্দ লিখিয়াছেন "করচা করিয়া রাখি শক্তি অনুসারে।" তিনি লেখাপড়া জানিতেন না, এইজন্য চৈতন্যপ্রভুর দক্ষিণের পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচারের কথা ভাল করিয়া লিখিতে পারেন নাই। নিজের সামান্য শক্তি অনুসারে যাহা পারিয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন। ঐ ছত্রটির ত ইহাই সরল অর্থ, উহা গোবিন্দের বার্দ্ধক্যের প্রমাণ কিরূপে হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

৫। প্রবাসীতে লিখিত হইয়াছে দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে তণ্ডুলই প্রধান খাদ্য, কিন্তু করচা লেখক কোথাও মহাপ্রভুর তণ্ডুল ভিক্ষা পাইলেন, একথা লিখেন নাই। প্রবন্ধ লেখক করচাখানি ভাল করিয়া পড়িয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। চোরানন্দীবনে "কেহ কাষ্ঠ চিনি আনে কেহ বা তণ্ডুল। কেহ দুগ্ধ কেহ ঘৃত কেহ ফলমূল॥" (৫৬ পৃঃ) প্রভৃতি স্থানে তণ্ডুল ভিক্ষার উল্লেখ আছে।

এই সকল তুচ্ছ অভিযোগ লইয়া ব্যস্ত হওয়ার সময় আমাদের নাই। তবে অপর যে সকল সকল ভ্রান্ত ধারণার জন্য প্রতিবাদীরা খুব আন্দোলন করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

করচার ভাষা।

প্রতিবাদীরা বলিতেছেন, গোবিন্দ দাসের করচার ভাষা আধুনিক। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ইঁহারা চৈতন্য চরিতামৃতকেই ঐতিহাসিক প্রমাণ, ভাষাতত্ত্ব এবং ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে আদর্শ ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন এবং এই আদর্শের আলোকে তাঁহাদের ভাষার বিচার চলিয়াছে *। একথা তাঁহাদের জানা উচিত যে চৈতন্য-চরিতামৃতের ভাষা আদৌ খাটি বাঙ্গলা নহে। কবিরাজ গোস্বামী ষোড়শবর্ষ বয়সে

* রায় বাহাদুর রসময় মিত্র লিখিয়াছেন "চৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থের সহিত তুলনায় উহার (করচার) ভাষা প্রভৃতির তুলনা করিয়া উহা যে আধুনিক" তাহাই তিনি এবং তাঁহার কতিপয় বন্ধু সাব্যস্ত করেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩রা ফাল্গুন ১৩৩১।

বৃন্দাবন গিয়াছিলেন এবং সাতাশী বৎসর বয়সে চৈতন্য চরিতামৃতে প্রণয়নে নিযুক্ত হন। এই একাত্তর বৎসর এবং তাহার পরে আরও ছয় বৎসর তিনি ক্রমাগত বৃন্দাবনে থাকায় তাঁহার ভাষা হিন্দীর সঙ্গে মিশিয়া খিচুরী হইয়া গিয়াছিল। সে ভাষার নমুনা এইরূপ "কহে তাঁহা কৈছে রহে রূপ সনাতন। কৈছে করে বৈরাগ্য কৈছে ভজন॥ কৈছে অষ্ট প্রহর করে শ্রীকৃষ্ণ ভজন। তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ॥ অনিকেতন দুঁহে রহে যত বৃক্ষগণ। একৈক বৃক্ষের তলে একৈক রাত্রে শয়ন॥ করোয়াঁ মাত্র কাথা ছিঁড়া বহির্বাস। কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ নাম নর্ত্তন উল্লাস॥" (চৈ, চ, মধ্য ১৯ পঃ)।

ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রজবুলীতে বঙ্গীয় কবিরা যে সকল পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়াও অনেকেয় এই ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছে যে সেই সময়ের বাঙ্গালা ভাষা বুঝি ঐরূপ। বস্তুতঃ বাঙ্গালী কবিদের ব্রজবুলী সম্পূর্ণ কৃত্রিম ভাষা।

এদেশে পাড়া গেঁয়ের ভাষা ৪০০।৫০০ শত বৎসরে বড় বেশী তফাৎ হয় না। আমার পিতামহকে আমি দেখিয়াছি এবং আমার পৌত্রেরাও বর্ত্তমান আছে। পিতামহের ভাষা ও প্রপিতামহের ভাষাতে বিশেষ তফাৎ ছিল না, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। এই ছয় পুরুষে (প্রচলিত গণনানুসারে ২০০ বৎসর) ভাষার কিছু তফাৎ অবশ্যই হইয়াছে, কিন্তু তাহা খুব বেশী নহে। ৪০০ বৎসরে ভাষা খুব দুর্বোধ হইয়া পড়ে না। যদি কেহ খাটি বাঙ্গালায় পুস্তক রচনা করেন, তবে এখনকার ভাষা হইতে তাহার একটা বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হইবে না।

ভাষা কয়েকটি কারণে তফাৎ হয়। প্রথমতঃ ভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে ;—কোন কোন সংস্কৃতের পণ্ডিত এই বিংশ-শতাব্দীতে যেরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার দুরুহতা দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করিতে পারেন, যে উহা শ্রীহর্ষের সময়ের ভাষা। মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন "কোকিল কলালাপ বাচাল যে মলয়ানীল সে উচ্ছলাচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে"। মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ভাষা এবং রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকার ভাষায় বিস্তর প্রভেদ আছে, অথচ এই দুই পুস্তক একরূপ সমসাময়িক (ভাষার ইতিহাস গণনা কালে ৩০।৩৫ বৎসরের ব্যবধান গণনীয় নহে।)

ভাষা তফাৎ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ প্রাদেশিকতা। বেশী দিন গত হয় নাই বঙ্গদেশের এক স্থানে একটি ঔষধের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। যে দেশে নবীন চন্দ্র সেন পলাশীর যুদ্ধ লিখিয়া গিয়াছেন,— যে দেশে নবীন চন্দ্র দাস রঘুবংশের সুমধুর বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, এই বিজ্ঞাপনটিতে সেই দেশের ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। বিজ্ঞাপন হইতে একটি স্থান উদ্ধৃত হইল :—"ইবা দাবাই না? ইবা বড় গম দাবাই। আঁব খালতে ভাইর পোয়ার লাগ্গি একাআনা দি এক দুর্গা নিঃ খাবাইলাম যে, আজ্জের আন্দাজ চীর বাইর হইল। আর গুরা পোয়ারে খাবাইতে কোন ভয় নাই।" এই লেখাটা বার চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে

বঙ্গদেশের কোন এক প্রান্তে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা পড়িয়া এখনকার কোন আনাড়ি লেখক মনে করিতে পারেন, উহা অশোকের সময়ের প্রাকৃত।

কোন একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় ভাষা ৪০০।৫০০ শত বৎসরে বড় বেশী পরিবর্ত্তন হয় না। যে সকল স্থানে বানিজ্যের কেন্দ্র, সেখানে বহু বিদেশী লোকের আনা গোনা হয়, তথায় নানা ভাষা মিশিয়া একটা জটিল ভাষার সৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গের নিভৃত পল্লীগুলিতে সহস্র বৎসরেও ভাষার কোন দ্রুত কিম্বা আমূল পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না।

যে সকল লেখক পণ্ডিত, তাঁহাদের লেখায় অলক্ষিত ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থাদির ভাষা আসিয়া পড়ে। এই জন্য পণ্ডিত গ্রন্থকারদের ভাষায় মধ্যে মধ্যে শব্দগুলির প্রাচীন আকৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। গোবিন্দ দাসের বই-পড়া বিদ্যা সামান্যই ছিল। তিনি খাটি বাঙ্গালা কথা লিখিয়া গিয়াছেন এই জন্য তাহার ভাষা অতি সরল হইয়াছে।

চৈতন্যচরিতামৃতের হিন্দী-বহুল বাঙ্গলা এবং ব্রজবুলীর মৈথিল-মিশ্রিত বাঙ্গলা দেখিয়া যাঁহারা ষোড়শ শতাব্দীর ভাষার আদর্শ ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা পদে পদেই ভুল করিবেন। মুদ্রিত পুস্তকে অনেক সময় বানান ভিন্ন রূপ করাতে ভাষা সুপ্রাচীন মনে হইয়া থাকে। যথা 'পাইয়া' কথাটা যদি 'পাইঞা' অথবা 'প্যাঞা' ভাবে লিখিত হয়, তবে যেন মনে হয় শেষোক্ত আকার প্রাচীনতর। কিন্তু মূলতঃ এই বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে উচ্চারণ গত বিশেষ তফাৎ নাই। সেইরূপ 'এক' যদি 'য়েক' কিংবা 'লইয়া' যদি 'লঞা' এই ভাবে লিখিত হয় তবে চোখে ধাঁধা লাগে, বাস্তবিক এই ভিন্ন ভিন্ন রূপের মধ্যে কথা বলিবার সময় বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না।

আমাদের পণ্ডিত মহাশয়েরা যখন আগেকার দিনে প্রাচীন পুঁথি সম্পাদন করিতে লাগিয়া যাইতেন, তখন পুঁথির ঐরূপ 'ঞ' প্রভৃতির ব্যবহার পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিতেন। তাঁহাদের লক্ষ্য থাকিত যাহাতে লোকে বই পড়িতে কষ্ট না পায় সেই দিকে, ভাষা-বিজ্ঞান লইয়া তাহারা মাথা ঘামাইতেন না। কৃত্তিবাস প্রভৃতি কবির যে সকল প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়, তাহাদের সঙ্গে বটতলার মুদ্রিত পুঁথি মিলাইয়া দেখিলে এইরূপ পরিবর্ত্তনের চিহ্ন পত্রে পত্রে পাওয়া যাইবে। বর্ণবিন্যাসের প্রাচীন রীতিগুলি রক্ষা করিলে ভাষা এক থাকা সত্বেও পুস্তকখানি প্রাচীনতর মনে হইবে। কৃত্তিবাসাদি সম্বন্ধে প্রকাশকগণ যাহা করিয়াছেন, করচা সম্বন্ধেও জয়গোপাল গোস্বামী কতক পরিমানে সেই রীতিই অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না পুঁথিতে বেশী কোন পরিবর্ত্তন করা। মাঝে মাঝে প্রাচীন শব্দ বদলাইয়া তিনি পুস্তক খানি সহজ-বোধ্য করিয়াছিলেন।

চণ্ডীদাসের বর্ত্তমান কালে যে সকল পদ পাওয়া যাইতেছে গায়কেরা তাহা কতকটা সহজ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি সেগুলি চণ্ডীদাসের নামেই পরিচিত হইতেছে। কৃত্তিবাস, বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি লেখক সম্বন্ধে ও সেই একই কথা প্রযোজ্য।

গোবিন্দকর্ম্মকারের অন্ততঃ ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল পদ চণ্ডীদাস রচনা করিয়াছিলেন তাহা আমরা এইরূপ ভাবে পাইতেছি :—

(১) "বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে। দেখা না হইত মরণ হৈলে॥ দুঃখিনীর দিন দুখেতে গেল। তুমি ত মথুরায় ছিলে হে ভাল॥ আমি নিজ সুখ দুখ কিছু না জানি। তোমার কুশলে কুশল মানি।"

(২) "সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম। কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ॥ না জানি কতেক মধু, শ্যাম-নামে আছেগো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে। জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো, কেমনে পাইব সখী তারে॥"

(৩) "বধুঁ কি আর বলিব আমি। জীবনে মরণে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হইও তুমি॥ তোমার চরণে, আমার পরাণে, বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি। সব সমর্পিয়া, এক মন হৈয়া, নিশ্চয় হইলাম দাসী॥"

(৪) "কে বলে পিরীতি ভাল। হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া কান্দিয়া জনম গেল॥"

চণ্ডীদাসের কিছু পরে—চৈতন্যপ্রভুর জন্মের পূর্ব্বে—শ্রীখণ্ডের কবি নরহরি এইরূপ পদ রচনা করিয়াছিলেন :—"অঙ্গনে রহিল আমার হিয়ার হেম হার। পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥ রোপিনু মল্লিকা নিজ করে। গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইও তারে॥"

গোবিন্দ দাসের প্রায় সমসাময়িক বৃন্দাবন দাস তৎকৃত চৈতন্যভাগবতে এইরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন :—"নাচে বিশ্বম্ভর, সবার ঈশ্বর, ভাগিরথী তীরে তীরে। যার পদধূলী, হয়ে কুতূহলী, সবাই ধরিল শিরে॥ অপূর্ব্ব বিকার, নয়নে সুধার, হুঙ্কার গর্জ্জন শুনি। হাসিয়া হাসিয়া, শ্রী ভুজ তুলিয়া, বলে হরি হরি বাণী॥"

কৃত্তিবাসী রামায়ণ গোবিন্দ দাসের করচার অন্ততঃ ৬০।৭০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী। বটতলার ছাপা রামায়ণে তাহার ভাষা কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। তথাপি কয়েকটি নমুনা দিতেছি :—

(১) "মাঝে সীতা আগে পাছে দুই মহাবীর। দুই ক্রোশ পথ বাহি যান গঙ্গা তীর॥ শ্রীরাম বলেন ভরদ্বাজের নিকটে। আজি বাসা করিয়া থাকিবা নিঃশঙ্কটে॥ মুনিগণের বেষ্টিত বসিয়া ভরদ্বাজ। তারাগণ মধ্যে যেন শোভে দ্বিজরাজ॥ হেন কালে সেখানে গেলেন তিন জন। তিন জনে বন্দিলেন মুনির চরণ॥ শ্রীরাম বলেন শুন মুনি মহাশয়। তিন জন তব ঠাঞি করি পরিচয়॥ শ্রী দশরথের পুত্র মোরা দুই জন। শ্রীরাম আমার নাম কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ॥"

(২) "বন্ধুবান্ধবাদি কোথা কেবা আছে আর। মনে মনে চিন্তা করে দেখি একবার॥ স্বর্গে ছিল বীরবাহু মরিল আসিয়া। কারে পাঠাইব যুক্তি না পাই ভাবিয়া॥ ইন্দ্রজিৎ নাহি রণে যাবে কোন জন। অশ্রুধারা বহিতেছে বিংশতি লোচন॥ অভিমানে

শীর্ণ অঙ্গ মলিন বদন। ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে রাজা দশানন॥ ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হয়ে ভূমিতলে পড়ে। এত দিনে পার্ব্বতী শঙ্কর বুঝি ছাড়ে॥ রাবণের মাতা সে নিকষা নাম ধরে। কান্দিতে কান্দিতে গেল রাবণ গোচরে॥ সন্তানের স্নেহ বশে দুঃখিতা অন্তরে। রাবণে বুঝায় বুড়ী অশেষ প্রকারে॥ বিভীষণ ভাই তোর ধর্ম্মশীল অতি। এসেছিল বুঝাইতে তারে মার লাথি॥"

(৩) "ভূমে পড়ি বালীরাজা করে ছট্‌ফট্। ধাইয়া গেলেন রাম তাহার নিকট॥ মৃগ মারি ব্যাধ যেন ধাইলা উদ্দেশে। ধাইয়া গেলেন রাম সে বালীর পাশে॥ রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহে বালী। দন্ত কড়মড় করে দেয় গালাগালি॥ নিষেধিলা তারা মোরে বিবিধ বিধানে। করিলাম বিশ্বাস চণ্ডালে সাধু জ্ঞানে॥ রাজকুলে জন্মিয়াছ নাহি ধর্ম্মজ্ঞান। আমারে মারিলা রাম এ কোন বিধান॥ কোন দেশ লুটাইয়া দিলাম কারে ক্লেশ। কোন দোষে করিলা আমার আয়ুশেষ॥ আর বংশে জন্ম নহে জন্ম রঘুবংশে। ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা সকলে প্রশংসে॥ এ কোন ধর্ম্মের কাজ করিলা আপনি। অপরাধ বিনা বিনাশিলা মম প্রাণী॥ সবে বলে রামচন্দ্র দয়ার নিবাস। যত দয়া তোমার সব আমাতে প্রকাশ॥ তপস্বীর ছলে রাম ভ্রম বনে বনে। কাহার বধিবা প্রাণ সদা ভাব মনে॥"

শান্তিপুর-নিবাসী বৃদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিলাল গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, করচার প্রাচীন পুথি জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ছিল, তাহা অনেকেই জানেন। "কিন্তু করচার ষোল আনা মৌলিকতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হয়।"

তাঁহার কেন? আমি নিশ্চয়ই জানি যে জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের মুদ্রিত করচা ষোল আনা খাটী নহে। তিনি নিজেও আমার নিকট একথা স্বীকার করিয়াছেন। অপরাপর প্রাচীন পুথি সম্পাদকগণের ন্যায় তিনিও প্রাচীন বর্ণ-বিন্যাসের প্রাকৃত রীতি কতকটা বদলাইয়াছেন। তাহা ছাড়া মাঝে মাঝে অপ্রচলিত শব্দও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন; এবং পয়ারচ্ছন্দের যেখানে কোনরূপ ব্যতিক্রম পাইয়াছেন, সেখানে দুই একটি শব্দ কমাইয়া, বাড়াইয়া তাহা নিয়মিত করিয়াছেন। সেকালে প্রাচীন হাতের লেখা পুথি মুদ্রাযন্ত্রে উঠিলেই তাহার এইভাবে বেশ-পরিবর্ত্তন হইত, শুধু করচাকে একা এ অপরাধে দোষী করা ঠিক হইবে না।

এইরূপ পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও যদি চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ ও কাশীদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগকে মানিয়া লওয়া হয়, তবে করচা কি দোষে অপাংক্তেয় হইয়া থাকিবে? বরঞ্চ উল্লিখিত কবিদের রচনা যতটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, করচায় তাহা হইতে ঢের কম পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে সময়ে করচা মুদ্রিত হয় তখন জয়গোপাল গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বনোয়ারী লালের বয়স ৪০ এর কম ছিল না। তিনি এই কার্য্যে সর্ব্ববিষয়ে তাহার

পিতার সাহায্য করিয়াছিলেন। পুথিখানি মাঝে মাঝে কীটদষ্ট ছিল এবং তাহার কোন কোন জায়গার পাঠ পড়িতে পারা যায় নাই। সেই সকল স্থান বৃদ্ধ গোস্বামী মহাশয় অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া পূরণ করিয়াছিলেন, এবং স্থানে স্থানে অপ্রচলিত শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া আধুনিক শব্দ যোজনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মোটের উপর এই পরিবর্ত্তন বেশী নহে। যে সকল জায়গা এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার যতটা মনে আছে, বনোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয় স্বীয় বিশ্বাসানুসারে এই সংস্করণে তাহার প্রাচীন পাঠ রক্ষা করিয়াছেন।

যদিও করচার লেখা অতি সরল এবং সুখপাঠ্য, তথাপি ইহার ভাষায় প্রাচীনত্বের চিহ্ন অনেক আছে, কয়েকটি শব্দ লক্ষ্য করিলেই একথা প্রতীয়মান হইবে :—

নিয়ড়ে=নিকটে ("কৃষ্ণের নিয়ড়ে তথা কাম ভস্ম হয়"। ১০ পৃঃ); পাড়ু=পার ("অবধৌত বীর পাড়ু হইতে ঝাঁপ দিলা" ২ পৃঃ।); পিব=পান করিব। "মোরে বলে আন বিষ শীঘ্র আমি পিব" (৬ পৃঃ); বার দিলা=উপস্থিত হইলা ("একে একে আসি বার দিলা সেই স্থানে।" নাট=নৃত্য (সহজে চলিলে দেখায় নাটুয়ার নাট।" (৩ পৃঃ); পড়ু=পড়ুক ("তথাপি আমার মুণ্ডে পড়ু শত বাজ।" (৫ পৃঃ); পাকাড়ি=ধরিয়া ("অনন্তর গদাধর পাকাড়ি চরণ।" (৬ পৃঃ); লাগাইলা=দিলা ("প্রভু ভোগ লাগাইলা।" (৭ পৃঃ); তুহুঁ=তুমি ("নীলাচলে গিয়া তুহুঁ থাক মোর ঠাঁই।" (২২ পৃঃ); ইষ্টগোষ্ঠি করি=আত্মীয়তা করা ("এইরূপে পক্ষকাল ইষ্টগোষ্ঠি করি।" (৭৫ পৃঃ); মুহি=আমি ("ভাবিতে লাগিনু মুহি ভাগ্যে কিবা হবে।" (১৩ পৃঃ); বলনা=গঠন ("ডমরুর মধ্য জিনি কটীর বলনা।" (৯ পৃঃ); পোকুর=পুকুর ("কন্যা পুত্র অট্টালিকা পোকুর উদ্যান।" ফুকারি=কান্দিয়া ("অমনি রমণিগণ ফুকারি উঠিল।" (১১ পৃঃ); তছু=তাহাতে ("উথলিয়া পড়ে তছু শচীমার শোক"। (৭ পৃঃ) বাত্=বাক্য ("দুই চারি বাত্ কহি মায়া কাটাইয়া।" (১৩ পৃঃ); কতি=কোথায় ("কতি বা থাকিবে তব সোণা রূপা দানা।" (১৬ পৃঃ); মোপানে=আমার দিকে ("দুই চারি বাত কহে মোপানে চাহিয়া।" (১৬ পৃঃ); ঘাড়ি=ঘাড় ("ঘাড়ি ভাঙ্গি পড়িতেছে আকুল পরাণ।" (২৫ পৃঃ); আঁধসা? ("আঁধসা পিষ্ঠক পুরি রসপুর গজা।" (২০ পৃঃ); তেঁহ=তিনি ("নারায়ণ গড়ের তেঁহ গ্রাম্যদেব হয়।" (১৬ পৃঃ); আগুয়ান=অগ্রসর ("চারিটা রূপার হুন্দা চলে আগুয়ান।" (১৭ পৃঃ); আঁধা=অন্ধ ("ঘানির বলদ সম সর্ব্বদা সে আঁধা।" ১৮ পৃঃ); গোফা=গুম্ফ ("বহুতর গোফা আছে তার চারিভিতে।" ৩৫ পৃঃ); দোসর=তুল্য ("সোণার দোসর তনু ভূতলে পড়িল।" ৪৭ পৃঃ); ঝাঁকি দিতে=বুঝিতে ("সন্ন্যাসীরে ঝাঁকি দিতে আইলা আপনি।" ৬১ পৃঃ); কাঁহা=কোথায় ("গোবিন্দরে কাঁহা কৃষ্ণ আনাও মিলিয়া।" (৬৬ পৃঃ); উন্মুমত=উন্মত্ত। ("সদা উন্মুমত প্রভু কৃষ্ণেতে অবেশ॥"—৬১ পৃঃ ঘাঁতি=গোপন ভাবে থাকা ("ঘাঁতি দিয়াছিল সেই বৈশ্য লুকাইয়া।" (৭৮ পৃঃ);

মূরখ =মূখ ("মূরখ সন্ন্যাসী মুহি কিছু নাহি জানি।" (২৩ পৃঃ) ; থোড়া = অল্প ("থোড়া থোড়া চুনা আটা সংগ্রহ করিয়া।" (৩৩ পৃঃ) ; পাকাইয়া = পাক করিয়া ("রুটা পাকাইয়া প্রভু লাগাইল ভোগ।" (৩৩পৃঃ) ; তথি = তথায় ("কত শত লোক তথি আসিয়া জুটিল।" (৩৬পৃঃ) ; চাম্বনি = শিঙরি ? ("চাম্বনি শিঙরি বলি হাসিল তখন।" (৪২ পৃঃ) ; উভরায় = উচ্চস্বরে ("আছাড়ি বিছাড়ি সবে উভরায় কান্দে।") (১৯ পৃঃ) ; ঝাঁকি বাঁধি = একত্র হইয়া ("ঝাঁকি বাঁধি মুন্নাবাসী থাকিতে কহিল।" (২৭ পৃঃ) ; ইহ = এইখানে ("একজন পাণ্ডা ইহ থাকে নিরন্তর।" (৭০ পৃঃ। বাটা = দান ("কেহ চূণা আনি দেয় অতিথির বাটা।") ; পাহাড়িয়া = পাছকোল করিয়া ("পাছাড়িয়া রাজা তবে প্রভুরে ধরিলা।" (৪৫ পৃঃ) ; হিটা ? ("মিছা হিটা = মিছা ভিটা" (৫৩ পৃঃ)। বিছারি = আছাড় খাইয়া (বোধ হয় বিস্তারি কথা হইতে—প্রেমে গদ গদ হৈয়া পড়য়ে বিছাড়ি" এহি = এই (এহি গ্রন্থে না রহিল) (২২ পৃঃ।

প্রাচীন বাঙ্গালায় অনেক হিন্দী কথা পাওয়া যায়। আমি ব্রজবুলি বা চরিতামৃতের ভাষার কথা বলিতেছি না ; খাটি প্রাচীন বাঙ্গালা পুথিতে ও এই সকল হিন্দী শব্দের প্রভাব দেখা যায়। বিজয় গুপ্তের পদ্মা পুরাণ একখানি খাটি বাঙ্গালা গ্রন্থ। ইহাতে ও 'জেতকে' 'তেত্‌কে' 'পোখেরি' 'দোনো' প্রভৃতি হিন্দী শব্দ দেখা যায়। চণ্ডীদাসের "নাম পরতাপে যার ঐছন করলগো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়। যেখানে বসতি তার সেখানে থাকিয়া গো, যুবতী ধরম কৈছে রয়।" প্রভৃতি পদে হিন্দী শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। করচাতেও মাঝে মাঝে ঐরূপ হিন্দী শব্দ আছে যথা 'ভোগ লাগাইলা', 'বাত' 'পুছে' "কাঁহা শত শত গোপী কাঁহা সেই নাট।" করচায় আবার কতকগুলি শব্দ আছে, যাহা অত্যন্ত প্রাচীন প্রয়োগ ; যথা 'রাগে ডগমগ প্রভু দেয় সন্তরণ' -৫ পৃঃ এখানে রাগ অর্থ ক্রোধ নহে, অনুরাগ। অবশ্য এখন বঙ্গভাষায় রাগের মৌলিক অর্থ-প্রয়োগ আর দেখা যায় না, উহা ক্রোধার্থ সূচক হইয়া গিয়াছে।

মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পর স্ত্রীলোকদের স্পর্শ করা দূরে থাকুক,—তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতেন না।

করচায় সত্যবাই, লক্ষ্মীবাইএর প্রসঙ্গ ছাড়া ও বারমুখী বেশ্যা ও ইন্দিরা প্রভৃতি সেবাদাসীদের উদ্ধারের কথা আছে। প্রতিবাদীদের মতে মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পরে কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলেন নাই, সুতরাং করচা জাল।

চৈতন্যদেব ছোট হরিদাসকে স্ত্রীলোক-সম্ভাষনের অপরাধে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, এজন্যও কেহ কেহ বলিতেছেন সন্ন্যাসের পর তিনি নিজে তো স্ত্রীলোক হইতে দূরে থাকিতেনই,

পরন্তু তাঁহার অনুবর্ত্তীদের মধ্যে কেহ স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলিলে তাহাকে দূর করিয়া দিতেন। ছোট হরিদাস ছিলেন, সুকণ্ঠ এবং সুশ্রী যুবা পুরুষ। তাঁহার কোন দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া তিনি যাহা করিয়াছিলেন, নির্ব্বিচারে সর্ব্বত্র সেই নিয়ম চালাইতেন না। রামানন্দ রায় তো পুরীর সেবাদাসীদের সঙ্গে খুব মিশিতেন। এইজন্য তাঁহাকে বাসুদেব-সার্ব্বভৌম প্রভৃতি অনেকে 'সহজিয়া বৈষ্ণব' বলিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেন। "মহারাজ সঃ খলু সহজ বৈষ্ণবো ভবতি পূর্ব্বময়মস্মাকমুপহাসপাত্রমাসীৎ" ('মহারাজ, রামানন্দকে সহজিয়া বৈষ্ণব বলিয়া আমরা ইহাকে কত উপহাস করিয়াছি'-বাসুদেবোক্তি শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক সপ্তমাঙ্ক—৫) এই রামানন্দ রায়কে চৈতন্য কিরূপ ভালবাসিতেন, তাহা সকলেই জানেন। নিত্যানন্দ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, যে "কেহ যদি এরূপ প্রমাণ করে যে নিত্যানন্দ মদিরা পান করেন এবং যবনীর প্রতি আসক্ত, তথাপি আমার তাঁহার প্রতি বিশ্বাস অটুট থাকিবে।" সুতরাং কেহ স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলিলে কি স্ত্রীলোক স্পর্শ করিলে তিনি তাঁহার প্রতি বিরূপ হইতেন, একথা বলা ঠিক নহে। হাতী ও চড়ুই পাখী তিনি এক ওজনে মাপ করিতেন না। যে যে দরের লোক তাহাকে সেই ভাবে বিচার করিতেন।

তিনি সন্ন্যাসের পর স্ত্রীলোক স্পর্শ করিতেন না, কিংবা স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলিতেন না—এ কথাও ঠিক নহে। চৈতন্য চরিতামৃতেই আছে "ষাটীর মাতা নাম ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী। প্রভুভক্তা তেঁহ স্নেহেতে জননী॥" (চৈ, চ, মধ্য, ১৫।৭৪) অমোঘের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া ষাটীর মাতা ও সার্ব্বভৌম বিমর্ষ হইলে "দুঁহার দুঃখ দেখি দুঁহা প্রবোধিয়া। দুঁহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈলা তুষ্ট হৈয়া॥" (মধ্য, ১৫ পঃ ৩৩ শ্লোক)। ষাটীর মাতার সঙ্গে কথা না বলিলে চৈতন্য তাঁহাকে প্রবোধ দিবেন কি প্রকারে? হরিচরণের অদ্বৈত-মঙ্গলে আছে, সন্ন্যাস গ্রহণের পরে চৈতন্য অদ্বৈতগৃহে যাইয়া অদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবীর সঙ্গে খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেনঃ—"মহাপ্রভু কহে সীতা আজি হইবে সামাল।" "সীতা কহে যত চাহ তত অন্ন হয়। তোমার কৃপায় অভাব কিছু না রয়" (অদ্বৈতমঙ্গল, ১০ম সংখ্যা)। চৈতন্য চরিতামৃতেই আছেঃ—"পুরীর মন্দিরে নানা বাদ্য বাজে, নাচে দেব দাসীগণ।" দেবদাসীরা মহালক্ষ্মীর পালা অভিনয় করিতেছিল, "মহালক্ষ্মী দাসীগণের প্রাগল্‌ভ দেখিয়া। হাসিতে লাগিলা প্রভু নিজগণ লৈয়া।" (চৈ, চ, মধ্য ১৪।৫১) এই দেবদাসীগণের অভিনয় উপভোগ করার কথা কবিকর্ণপূর চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকেও লিখিয়াছেন। নীলাচলে জগন্নাথ দর্শনের আগ্রহাতিশয়ে একটি স্ত্রীলোক ভিড় ঠেলিয়া মহাপ্রভুর কাঁধে চড়িয়াছিল, তাঁহার অনুচর সেই স্ত্রীলোককে নামাইয়া দিতে চাহিলে মহাপ্রভু নিষেধ করিয়া বলিলেন—"স্বচ্ছন্দে দেখুক জগন্নাথে।" চৈতন্য চরিতামৃতে আরও লিখিত আছে যে কোন সেবাদাসীর মুখে জয়দেবের গান শুনিয়া চৈতন্যদেব অজ্ঞানাবস্থায় তাহাকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন। যদি গোবিন্দের

বাধা পাইয়া তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া না আসিত, তবে নিশ্চয়ই ঐ রমণীকে তিনি আলিঙ্গন করিতেন, যেরূপ অজ্ঞানাবস্থায় তিনি তীর্থরামকে পদদলিত করিয়াছিলেন এবং সত্যবাইকে স্পর্শ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন—"যদি সন্নিকটবর্ত্তী ভক্ত গোবিন্দ তখন তাঁহাকে ধরিয়া বারণ না করিতেন, তবে কি হইত? তবে সত্যের বেলা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই হইত না কি?" (শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৫৮ পৃঃ)।

সুতরাং চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি গ্রন্থের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে (১) মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পরেও স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলিতেন, (২) স্ত্রীলোক তাঁহাকে স্পর্শ করিলেও তিনি তাহা নিষেধ করিতেন না, (৩) তিনি সেবাদাসীদের অভিনয় শুধু দর্শন করিতেন না—উপভোগ করিতেন, (৪) অজ্ঞানাবস্থায় তিনি সেবাদাসী-দিগের একজনকে আলিঙ্গন করিতেও ছুটিয়াছিলেন। সুতরাং ইহার পরে করচার প্রসঙ্গ লইয়া হৈ চৈ করিয়া লোকদিগকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। তিনি পতিতদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহাদিগকে প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবার জন্য স্বর্গ হইতে যে মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে গণ্ডী স্থাপন করিতে যাওয়া ভুল। কেবল পুণ্যবান লোক দিগের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিবার জন্য তিনি জগতে অবতীর্ণ হন নাই। তদীয় প্রেমের অবাধ গতিতে স্ত্রী পুরুষ সকলেই ধরা পড়িয়াছিল। উদার আকাশের ন্যায় ছিল চৈতন্য-প্রেম। তাহাতে সঙ্কীর্ণতা আরোপ করিয়া তাঁহাকে প্রেমের "এক চোখো" দেবতা তৈরী করিবার যে চেষ্টা, তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায় গ্রাহ্য করিবেন না,—ইতিহাস তাহা মানিবে না। ভগবৎপ্রেম-বিশুদ্ধ তাঁহার চিন্ময় দেহের স্পর্শে পাপী-তাপী উদ্ধার পাইত—তাঁহার সেই দেহে অপবিত্রতার লেশ কল্পনা করা—বাতুলতা মাত্র। আমরা মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন প্রীতির প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া গোবিন্দের এই কয়েকটি ছত্র আবৃত্ত করিতেছি, ইহা চৈতন্যদেবের শ্রীমুখের বাণী :—

"চণ্ডাল যুবক-গৃহী বালবৃদ্ধ নারী। নামে মত্ত হইয়া দাঁড়াবে সারাসারি। বালক বলিবে হরি বালিকা বলিবে। পাষাণ্ড অঘোরপন্থী নামে মত্ত হবে। আকাশ ভেদিয়া নামের পতাকা উড়িবে। রাজা প্রজা এক সঙ্গে গড়াগড়ি দিবে॥"

প্রতিবাদীরা বলিয়া বেড়াইতেছেন, করচায় চৈতন্য সহজিয়ারূপে বর্ণিত হইয়াছে। 'সহজিয়া' কথাটা বাঙ্গালা সমাজে প্রায়ই ঘৃণিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাঁহারা স্ত্রীলোকের প্রেমকেই পরমার্থ লাভের একমাত্র উপায় মনে করেন, তাঁহারাই 'সহজিয়া'।

করচায় চৈতন্যদেব বহুস্থানে এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন "প্রেম প্রেম করে লোকে প্রেম জানে কেবা। প্রেমের কি তত্ত্ব হয় রমণীর সেবা॥ অভেদ পুরুষ নারী যখন জানিবে। তখন প্রেমের তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফুরিবে। * * * আত্মরামের জন্য যার আর্ত্তি হয়। তার কি মনের মধ্যে কাম ভাব রয়॥ আলোর নিয়ড়ে যথা তমো নাহি রয়।

কৃষ্ণের সমীপে তথা কাম ভস্ম হয় ॥" (১০ পৃঃ) ব্যভিচারীদের নিন্দা করিয়া তিনি বলিয়াছেন "মুখে বল মাতৃবৎ পরের রমণি। নির্জ্জনে পাইলে কামে মুগ্ধ অমনি ॥" (১০ পৃঃ) যাহারা বিষয়ভোগী এবং পর রমণীর প্রতি আসক্ত তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন "পরের বিষয়ে পর রমণীতে মন। কেমনে করিবে তবে কৃষ্ণের সাধন ॥" (১৮ পৃঃ) পুনশ্চ "রমণীর প্রেম হয় গরল সমান। অমৃত বলিয়া তাহা মূর্খ করে পান ॥" (৩৪ পৃঃ)

করচায় সর্ব্বত্রই সহজ মতের এইরূপ প্রতিবাদ আছে, অথচ প্রতিবাদীরা পুস্তকখানির বিরুদ্ধে লোক ক্ষ্যাপাইবার উদ্দেশে অযথা কুৎসা করিয়া বেড়াইতেছেন। করচার একটি স্থানে আছে "অন্তরঙ্গ আছে আর দুই একজন। যাহাদের সঙ্গে হয় গোপনে ভজন ॥" (৪পৃঃ) এই "গোপন ভজন" কথাটুক নিঙড়াইয়া আপত্তিকারকগণ ইহা হইতে সহজিয়া গন্ধ বাহির করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের 'প্রামাণিক গ্রন্থের' কথাগুলি ত প্রায় এইরূপ ভাবেই আছে। "অন্তরঙ্গ সঙ্গে করে রস আস্বাদন। বহিরঙ্গ সঙ্গে করে নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥" এই "গোপন ভোজন" এবং "রস-আস্বাদন"—এই দুই কথার মানে কি এক নহে? চৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডে স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে চৈতন্যদেবের নিগূঢ় রাধাকৃষ্ণ লীলারস আস্বাদনের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে, সেই রস আস্বাদনের সময় বাহিরের লোক তথায় যাইতে পারিত না। রামরায় সেই গূঢ় রসলীলা বলিতে গেলে মহাপ্রভু তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। এই "গোপন ভজনের" নিগূঢ় কথা করচাতেই আছে, "যুবকের আর্ত্তি যথা যুবতী দেখিয়া। সেইরূপ আর্ত্তি আর না পাই ভাবিয়া ॥ এ কারণে ভক্তগণ ভজে যদুপতি। পত্নীভাবে তার প্রতি স্থির করি মতি ॥" (১০পৃঃ) "সুন্দর নায়ক দেখি সুন্দরী নায়িকা। যেই ভাবে দেখে তারে হৈয়া রাগাত্মিকা ॥ সেই ভাবে কৃষ্ণকে ডাকহে বার বার। আপনি ঘুচিয়া যাবে মনের আন্ধার ॥" (৬০ পৃঃ) রূপের নিকট "পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু" ইত্যাদি বাশিষ্ঠ রামায়ণোক্ত শ্লোকে মহাপ্রভু সেই নিগূঢ় রসের আস্বাদ বর্ণনা করিয়াছিলেন ॥

সুতরাং এই যে 'সহজিয়া' অভিযোগ ইহাও প্রতিবাদিগণের হৃদয়ের অকপট কথা নহে। ইহা করচাকে হতাদৃত করিবার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃত অর্থবিকৃতি।

কৃষ্ণদাস চৈতন্যদেবের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন কিনা ?

চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে কৃষ্ণদাস নামক এক ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন। সেখানে গোবিন্দ কর্ম্মকারের কোন উল্লেখ নাই,—সুতরাং যাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে চরিতামৃতের অনুস্বার বিসর্গটি পর্য্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া গণ্য করেন, তাঁহারা ঐ গ্রন্থে গোবিন্দ দাসের অনুল্লেখ তদ্বিরুদ্ধে একটি প্রধান প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন।

কৃষ্ণদাস নামক একটি ব্রাহ্মণ যে খানিকটা দূর পর্য্যন্ত চৈতন্যের অনুগামী হইয়াছিলেন, তাহা করচাতেই পাওয়া যাইতেছে। (২১ পৃঃ)

কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক এবং বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত এই উভয়ই বৈষ্ণব সমাজের সর্ব্বজনাদৃত প্রামাণিক গ্রন্থ এবং উভয়ই চৈতন্য চরিতামৃতের পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহাদের কোনটিতেই কৃষ্ণদাস নামক ব্রাহ্মণের দক্ষিণগমনের উল্লেখ নাই। চৈতন্য ভাগবতে দাক্ষিণাত্যের বিশেষ কোন উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে স্পষ্ট করিয়া লিখিত আছে যে কোন ব্রাহ্মণকেই চৈতন্যদেব তাঁহার সহিত দক্ষিণে যাওয়ার অনুমতি দেন নাই। যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার সঙ্গে খানিকটা দূর গিয়াছিলেন, তাঁহারা গোদাবরী তীর পর্য্যন্ত যাইয়া তাঁহার আদেশে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চৈতন্য দেবের সঙ্গে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের জন্য কোন ব্রাহ্মণ সহচর নিযুক্ত না করাতে রাজ প্রতাপ-রুদ্র বাসুদেব সার্ব্বভৌমের উপর বিরক্তি প্রকাশ করিলে পণ্ডিত-প্রবর রাজাকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, যে মহাপ্রভু তাঁহার সঙ্গে কোন ব্রাহ্মণ লইতে স্বীকার করেন নাই, এইজন্য যাঁহারা গোদাবরী পর্য্যন্ত প্রভুর অনুগমন করিয়াছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস যে শুধু গোদাবরী তীর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, চৈতন্য চন্দ্রোদয়ের এই কথায় তাহা দৃঢ়রূপে প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং আমরা করচার প্রমাণকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া এইমাত্র বলিতে পারি যে কৃষ্ণদাস খানিকটা দূর পর্য্যন্ত (গোদাবরী তীর পর্য্যন্ত) দক্ষিণ যাত্রার অনুগমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের এই খানিকটা যাওয়ার কথা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া চৈতন্য চরিতামৃতকার তাঁহাকে চৈতন্যের দীর্ঘ প্রবাসের সঙ্গী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন।

বিশেষ দেখা যায় কৃষ্ণদাস নদিয়ায় গমন করিয়া শচীদেবীকে প্রভুর পুরীতে প্রত্যাগমনের সংবাদ দিতেছেন। এই সূত্রে পরবর্ত্তী কালে কেহ কবিরাজ গোস্বামীকে ভুল সংবাদ দেওয়া সম্ভব। চৈতন্য ভাগবত, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, কবি কর্ণপূরের নাটক এবং লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি সুপ্রাচীন পুস্তক—যাহা খাস বঙ্গদেশে বসিয়া লেখকেরা লিখিয়াছিলেন, তাহাদের কোনটিতেই কৃষ্ণদাসকে প্রভুর দাক্ষিণাত্য,—ভ্রমণের সঙ্গী বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। সুতরাং একমাত্র চরিতামৃতোক্ত প্রবাদ আমরা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

চরিতামৃত করচার প্রায় ১০৪ * বৎসর পরে লিখিত হয়। গ্রন্থকার বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী ১৬ বৎসর বয়স হইতে ৯৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে বৃন্দাবনে ছিলেন। তখন বৃন্দাবনের পথ অতি দুর্গম ছিল। সুতরাং তাঁহাকে অনেকটা জনশ্রুতির উপর

* "শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ শ্রীমদ্বৃন্দাবনান্তরে সূর্য্যেঽহ্নসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ।"

নির্ভর করিতে হইয়াছিল। রূপ ও সনাতন বৃন্দাবনবাসী ছিলেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে যেটুক জানিতেন সেটুক অবশ্য প্রামাণিক ছিল, কিন্তু তাহা ছাড়া অপরাপর কথার ঐতিহ্য খুব দৃঢ় ভিত্তির উপরে নাই। চৈতন্য চরিতামৃতকার এই জনশ্রুতি মাত্র আশ্রয় করিয়া চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য অপরাধ স্বীকার করিয়া মার্জ্জনা চাহিয়াছেন, এবং তদ্দত্ত বিবরণে ক্রম ভঙ্গ হইয়াছে, এই আশঙ্কার কথাও জানাইয়াছেন (মধ্য ৭ম ১০৫, মধ্য ৯ম পঃ ৮, মধ্য ১০ম পঃ ১৭৫।১৭৬) তদ্দত্ত দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ অতি সঙ্ক্ষেপে আছে, এমন কি প্রবাসীর লেখককে পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে যে কৃষ্ণদাস কোন ক্রম রক্ষা করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "চরিতামৃতের নামগুলি একখানি মানচিত্রে চিহ্নিত করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে পুরীতে প্রত্যাগমনের পর কেবলমাত্র স্মরণশক্তি অবলম্বন করিয়া কতকগুলি তীর্থস্থানের নাম বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।" এই অসম্পূর্ণ, অসংলগ্ন এবং ক্রমভঙ্গ পূর্ণ সংক্ষিপ্ত বিবরণকে প্রবন্ধ লেখক সমাশ্রয় করিয়া করচার বিরুদ্ধে তর্ক জাল বিস্তার করিতেছেন, ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা। লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল কিংবা জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল, কবি কর্ণ পূরের চৈতন্য চন্দ্রোদয়, ও চৈতন্য ভাগবৎ প্রভৃতি কোন পুস্তকেই চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্গী বলিয়া কোন কৃষ্ণদাসের উল্লেখ নাই। কৃষ্ণদাস দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বরাবর সঙ্গী থাকিলে ইঁহারা অবশ্যই সে কথা উল্লেখ করিতেন। লোচনদাস বরঞ্চ চৈতন্যদেবের মথুরা ভ্রমণের উপলক্ষে কৃষ্ণদাস নামক এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁহার সাহচর্য্যের অনেকবার উল্লেখ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে উদোরপিণ্ডি সম্ভবতঃ বুধোর উপর পড়িয়াছে।

করচার ভৌগলিক তত্ত্ব।

গোবিন্দদাস মহপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের যে ভৌগলিক বৃত্তান্তটি দিয়াছেন, তাহা এত পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বাস্তব, যে তাহা যে কোন লোক পড়িবেন তিনিই এই শ্রদ্ধেয় দিগ্‌দর্শণীর প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া পারিবেন না।

করচায় দেখা যায় চৈতন্যদেব পুরী হইতে রওনা হইয়া পর পর নিম্নলিখিত স্থানগুলি পর্য্যটন করেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ৭ই বৈশাখ তিনি পুরী হইতে রওনা হন। *

আলালনাথ হইতে গোদাবরী তীরে বৌদ্ধগণের তাৎকালীন প্রধান কেন্দ্র ত্রিমন্দ নগরে, তথায় তুঙ্গভদ্রাবাসী ঢুণ্ডীরাম তীর্থকে ভক্তিপথে প্রবর্ত্তিত করেন ; তৎপর ত্রিমন্দ হইতে পন্থ-গুহা হইয়া সিদ্ধবটেশ্বরে (কডপ্পা নগরের নিকটবর্ত্তী) তৎপর পান্না নগরের নিকটস্থ বটেশ্বরে তথায় তীর্থরামের উদ্ধার। বটেশ্বরে সাতদিন অবস্থান এবং নন্দীশ্বরে গমন। তৎপর ২০ মাইল ব্যাপক এক জঙ্গল অতিক্রমণ, তৎপর মুন্না নগরে গমন (মুন্না নগর মুন্না-নদী তীরবর্ত্তী, মুন্না মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তী) মুন্না হইতে বেঙ্কট নগরে (সিদ্ধবটেশ্বর ও ত্রিপদী নগরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী) গমন,

তথায় তিন দিবস অবস্থান, তৎপর বগুলা নামক বনে পন্থভীল নামক দস্যুকে উদ্ধার। তিন দিবস এক বৃক্ষতলে অনাহারে উন্মত্তাবস্থায় যাপন। বগুলা হইতে গিরীশ্বরে, তথায় দুই দিবস বাস। গিরীশ্বর হইতে ত্রিপদী নগরে, (ত্রিপদী মান্দ্রাজ হইতে ৪০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে), তথা হইতে পান্না নরসিংহ, তৎপরে বিষ্ণুকাঞ্চীতে (কাঞ্জীভরম্. ত্রিপদী হইতে ৪৭ মাইল দক্ষিণে), তথা হইতে কালতীর্থে ও সন্ধি তীর্থে ৎপরে চাঁইপল্লী (ত্রিচিনোপোলি), তথা হইতে নাগর, (১৪৫ মাইল পূর্ব্বে ও সমুদ্রের কূলে অবস্থিত)। তৎপর তাঞ্জোরে *—তাঞ্জোর নাগর হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে ;—তৎপর চণ্ডালু পর্ব্বত পার হইয়া পদ্মকোটে (তাঞ্জোর হইতে ৬০ মাইল উত্তর পশ্চিমে), তার পর ত্রিপাত্র নগরে (পদ্মকোট হইতে ৬০ মাইল দক্ষিণে),—ত্রিপাত্র হইতে ৩০০ মাইল ব্যাপক ঝারিবন নামক এক জঙ্গল অতিক্রমণ, ইহাতে এক পক্ষ ব্যয়িত হয়। জঙ্গল পার হইয়া রঙ্গধামে, (আধুনিক শ্রীরঙ্গ, ত্রিপাত্রের দক্ষিণ পশ্চিমে) তথায় নৃসিংহ মূর্ত্তি দর্শন, রঙ্গধাম হইতে রামনাথ নগরে (সমুদ্রের উপকূলে রামেশ্বরের অতি নিকটে।) । রামনাথ হইতে ঋষভ পর্ব্বত হইয়া রামেশ্বরে † তথা হইতে মাধ্বী বনে এবং তাম্রপর্ণী পার হইয়া কন্যাকুমারীতে গমন এবং তথা হইতে ত্রিবঙ্কু (ত্রিবাঙ্কুর) নগরে, ত্রিবঙ্কু হইতে পয়োষ্ণিতে (আধুনিক পানোনী), তথা হইতে মৎস্যতীর্থ, রামগিরি, কাচাড়, ভদ্রানদী, নাগপঞ্চপদী অতিক্রম করিয়া চিতোলে (আধুনিক চিত্রল দুর্গ, মহীশূরের উত্তর সীমান্তে) গমন, চিতোল হইতে চণ্ডপুর, গুর্জ্জরী নগর, (গুজরাট নহে, হায়দ্রাবাদ র‍্যাজ্যের নিকট) কাণ্ডার দেশ, ও পরে পূর্ণ নগরে (পুনা, এখনও তন্নিকটবর্ত্তী নদীর নাম পূর্ণ রহিয়াছে), পূর্ণ নগর হইতে ভোলেশ্বর, দেবলেশ্বর পার হইয়া পাটস নগরে, তথা হইতে জেজুরী, এই স্থলে খাণ্ডবাদেবের সেবদাসী অভাগিনী মুরারিদের বিবরণ দেওয়া আছে। তৎপরে চোরানন্দীবনে নারোজী নামক ব্রাহ্মণ-দস্যুকে উদ্ধার, মূলা নদী পার হইয়া খণ্ডলা, তৎপরে নাসিকে ; নাসিক হইতে ত্রিমুক (আধুনিক ত্রিম্বক), তথা হইতে দমন নগরে, তাপ্তী নদী অতিক্রম করিয়া ভঁরোচ নগরে, তথা হইতে বরোদা, নারোজীর মৃত্যু এবং আহামাদাবাদের ঐশ্বর্য্য বর্ণন ("আশ্চর্য্য আহামাদাবাদ জাঁকের সহর") শুভ্রামতী নদী অতিক্রমণ, কুলীন গ্রাম বাসী রামানন্দ ও গোবিন্দ চরণের সহিত সাক্ষাৎ এবং তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া লওয়া ;

---

* পানিহাটী নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব—গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট লিখিয়াছেন :—

"তাঞ্জোরের কথা কেবল এক করচায়ই পাওয়া যায়। তথায় এক প্রধান গৃহে তাঁহার (চৈতন্য-প্রভুর) বিগ্রহ আছেন।"

† রামেশ্বর মন্দিরে 'হরি বোলা' নামক দেব-বিগ্রহ আছে। 'হরি বোলা' শব্দটি বাঙ্গলা শব্দ। এদিকে করচায় দৃষ্ট হয় এই অঞ্চলে যখন চৈতন্য প্রভু ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহায় মুখে "হরি বোল" শব্দ এবং তদীয় উদ্দাম ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া "ক্ষেপা হরিবোলা বলে প্রভুরে সকলে। ক্ষেপাইতে কত লোক হরি বোল বলে।" (৩৯পৃঃ) এই 'হরি বোলা' বিগ্রহ কটক-প্রবাসী শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন দেখিয়া আসিয়াছেন।

তৎপর ঘোগায় বারমুখীর উদ্ধার, জাফরাবাদ, পরে সোমনাথে গমন। সোমনাথের পরে জুনাগড়, গৃণার পাহাড় অতিক্রমণ ; তথা হইতে অমরাপুরী, গোপীতলা, রৈবতক ও প্রভাস। ১লা আশ্বিন দ্বারকায় গমন, ১৬ই আশ্বিন দ্বারকা হইতে নর্ম্মদা তীরে দোহদ নগরে তথা হইতে কুক্ষী, আমঝোরা, মন্দুরা, দেবঘর (বৈদ্যনাথ নহে) শিবাণী, চণ্ডীপুর, রায়পুর, বিদ্যানগর ও রত্নপুরে গমন এবং মহানদী পার হইয়া স্বর্ণগড়ে প্রবেশ, তথা হইতে সম্বলপুর *, দমরা, প্রতাপনগর †, দাসপাল, রসাল কুণ্ড, ঋষিকুল্যা, আলাল নাথ, তথা হইতে পুরী।

এই বৃত্তান্তে নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে চৈতন্যদেব পুরী হইতে পূর্ব্ব উপকূলের সমস্ত দক্ষিণাংশে ক্রমে পরিভ্রমণ করিয়া পশ্চিম উপকূলে ক্রমে গুজরাট পর্য্যন্ত দর্শন করেন। গুজরাট হইতে নর্ম্মদা ও বিন্ধ্যগিরির সমস্ত্র পথে প্রায় এক সরল রেখায় পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই বৈশাখ তিনি দাক্ষিণাত্যাভিমুখে রওনা হন ও ১৫১১ খৃষ্টাব্দের ৩রা মাঘ পুরীতে প্রত্যাগমন করেন। সুতরাং এই ভ্রমণ-কার্য্য এক বৎসর ৮ মাস ২৬ দিনে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল।

প্রত্যেকস্থানে পর্য্যটকদের দৈনন্দিক যেরূপ নানাকৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার বর্ণনা আছে, তাহাতে মহাপ্রভুর জীবনের এই প্রায় দুইটি বৎসরের কাহিনী যেমন উজ্জ্বল হইয়াছে, তাঁহার অন্য কোন জীবন-চরিতে তদ্রূপ বাস্তব ছবি একখানিও নাই। এই বৃত্তান্তটি ম্যাণ্ডিভ্যালের জেরুজেলাম, নরহরির নবদ্বীপ ও মথুরা, ও জয়নারায়ণের কাশী প্রভৃতির বর্ণনা হইতেও আমাদের চক্ষে বেশী হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

ভুগোলে ভুল ধরা।

করচায় উল্লিখিত আছে—"বারমুখী কুলটারে প্রভু ভক্তি দিয়া। সোমনাথ দেখিবারে চলিল ধাইয়া॥ জাফরাবাদের দিকে প্রভু চলি যায়। বহু কষ্টে তিন দিনে পৌছায় তথায়॥" প্রবাসীর আপত্তিকারক বলিতেছেন (১৩৩২ শ্রাবণ ৪৭৮ পৃঃ) "ঘোঘা হইতে জাফরা-বাদ আকাশ পথে ১৬০ মাইল অপেক্ষা কিছু বেশী। পাকা সোজা রাস্তা কল্পনা করিলেও প্রত্যহ ৫৩৫৪ মাইল পথ অতিক্রম করা অসম্ভব। "প্রভাতে উঠিয়া মোরা সোমনাথে যাই। ছয়দিন পরে গিয়া সেখানে পৌছাই॥" জাফরাবাদ হইতে সোমনাথ বড় জোর ৬০ মাইল। এই ৬০ মাইল অতিক্রম করিতে ছয় দিন লাগিল, আর তাহার ঠিক পূর্ব্বকার ১৬০ মাইল অতিক্রম করিতে তিন দিন !!!"

তাঁহার এই "আকাশ পথের" জরিপটা ভাল করিয়া বোঝা গেল না। এবার মামলাটা একবারে পুকুর চুরির। আমরা অনেকগুলি মানচিত্রে দেখিয়াছি তাহার প্রত্যেক গুলিই

* সম্বলপুরে তদবধি মহাপ্রভুর বিগ্রহের পূজা চলিতেছে।

† এখানে গৌর বিগ্রহ আছে। প্রতাপরুদ্র ঐ বিগ্রহ স্থাপিত করেন।

একরূপ। মিলাইয়া দেখিবার সুবিধার জন্য জে, সি ওয়াকার সাহেব কৃত এবং এ্যাল্বে-মারল্ ষ্ট্রীট হইতে জন্ মারে কর্ত্তৃক প্রকাশিত ভারতবর্ষের মানচিত্রখানির উল্লেখ করিতেছি। প্রত্যেক মানচিত্রেই দেখা যায় ঘোঘা হইতে জাফ্রাবাদ ৭৭$\frac{১}{২}$ মাইল "১৬০ মাইলের উপরে" নহে। আমরা পথের খুব সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া মাইলের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়াছি, ইহাতে ভুলের কোন আশঙ্কা নাই। সুতরাং ঘোঘা হইতে জাফরাবাদ তাহারা দৈনিক ২৫$\frac{৫}{৬}$ মাইল হিসাবে গিয়াছিলেন। গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন এই পথটা তাঁহারা তিনদিনে বহুকষ্টে উত্তীর্ণ হন। বহুকষ্টের কারণও মানচিত্র দেখিলে অনুমান করা যায়। ঘোঘা এবং জাফ্রবাদের মধ্যে গ্রাম কি নগর বিশেষ কিছু দেখা যায় না। সুতরাং লোকালয়-বিরহিত পার্ব্বত্য স্থানটি খুব তাড়াতাড়ি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। অবশ্য ২৫$\frac{৫}{৬}$ মাইল রাস্তা দৈনিক হাটা কিছু বৃহৎ ব্যাপার নহে। লেখক ৭৭$\frac{১}{২}$ মাইলকে ১৬০ মাইলের উপরে পরিকল্পনা করাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয় বটে, কিন্তু সত্যের ঘোরতর অপলাপ করা হয়। জাফ্রাবাদ হইতে সোমনাথ মানচিত্রে ৬১$\frac{৯}{১০}$ মাইল। স্বচ্ছন্দ মনে ভাল করিয়া সমস্ত দৃশ্য দেখিতে দেখিতে গেলে এই ৬০$\frac{৯}{১০}$ মাইল যাইতে ৬ দিন কেন, ১৫ দিনও লাগিতে পারে। বিশেষ তৎপূর্ব্বে প্রত্যহ ২৫$\frac{৫}{৬}$ মাইল বহুকষ্টে পর্য্যটন করার পরে পথ-ভ্রমণে অবসাদ আসা স্বাভাবিকই বটে।

আটাচূণা লইয়া বিবাদ

ত্রিবাঙ্কুর ও কাবেরীর তীরে চৈতন্যপ্রভু আটাচূণা ভিক্ষা পাইয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব কথা বলিয়া প্রবাসীর লেখক নানারূপ কূটতর্ক উত্থাপিত করিয়াছেন। তিনি বলেন ঐদেশে আটাচূণা পাওয়া যায় না। "একমাত্র এই দোষেই করচাকে অনৈতিহাসিক ও কাল্পনিক বলা যাইতে পারে।" তাঁহার যুক্তিগুলি নিজের নিকট এতই দৃঢ় বোধ হইতেছে যে বহু স্থলে তিনি ঐরূপ কথা ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু "ঘোগা হইতে জাফ্রাবাদ ১৬০ মাইলের উপর" এই সিদ্ধান্তের ন্যায় আটাচূণার কথাটা ও অসার। দক্ষিণ মালাবার পালঘাটবাসী অধ্যাপক রাও বাহাদুর অনন্তকৃষ্ণ আয়ারের নিকট আমরা প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তাঁহার বাড়ী হইতে একদিনে ত্রিবাঙ্কুর হাটিয়া যাওয়া যায়, সুতরাং সেদিককার সকল কথাই তিনি বিশেষরূপে অবগত আছেন। ১৫১০ খৃঃ অব্দে কি তন্নিকট সময়ে তাঁহাদের দেশে আটাচূণা পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিনা, এই ছিল আমার প্রশ্ন। তিনি বলিলেন "চালের গুড়া, ময়দা, ভাজা কলাই মুটির গুড়া, এই তিন দ্রব্যের মিশ্রনে যে খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা আমাদের দেশে 'আটাচূণা' বলিয়া পরিচিত। ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলের খাঁটি দেশবাসী লোকেরা প্রাচীন কালে ইহা খাইতেন এবং এখনও খাইয়া থাকেন। চিনি ও গুড় দিয়া জলে গুলিয়া ইহা খাইতে হয়। প্রবাস-যাত্রার সময় ইহাই অবলম্বন।" রাও বাহাদুর

আয়ার আমাকে এই কথাগুলি একখানি চিঠি লিখিয়াও জানাইয়াছেন, তাহা পাদটীকায় দেওয়া গেল। *

এখন দেখা যাইতেছে লেখকের কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা নিরাপদ নহে, সুতরাং এ সম্বন্ধে বাক্‌বিতণ্ডা করা বৃথা।

কিন্তু আটা চূণা যদি সে দেশে এই আকারে না থাকিত,—যদি শুধু ময়দাকেই তাহা বুঝাইত, তথাপি ৪১৫ বৎসর পূর্ব্বে সেখানে উক্ত দ্রব্য সুলভ হওয়ার বহু অজ্ঞাত কারণ থাকিতে পারিত। ধরুন, সে সময়ে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহের দরুণ অশান্তিতেই হউক অথবা বিজয়নগরের হিন্দু রাজত্বের অভূতপূর্ব্ব গৌরবে আকৃষ্ট হইয়াই হউক, বহু উত্তর পশ্চিম-বাসী লোকের দাক্ষিণাত্যে যাইয়া বাস করিবার কারণ দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহারা হয়ত শেষে অন্নাহারী হইয়াছিলেন; কিন্তু প্রথম দুই এক শতাব্দীতে তাঁহাদের দেশ প্রচলিত খাদ্য খাইতেন, সুতরাং সে দেশে ময়দা তখন সুলভ থাকিবার কথা।

সে যাহা হউক যখন "আটা চূণা" দ্বারা তাঁহারা যাহা বুঝিতেন, তাহা সে দেশে তৎকালে খুবই প্রচলিত ছিল, ইহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন কাল্পনিক অস্ত্র শানাইয়া লড়াই করিবার কোন দরকার নাই।

রাজা রুদ্রপতি।

ত্রিবাঙ্কুরের ইতিহাসে তৎসময়ে রাজা এ, রবিবর্ম্মার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু করচায় রাজার নাম লিখিত হইয়াছে রুদ্রপতি, ইহা লইয়া তাঁহারা খুবই হৈ চৈ করিয়াছেন।

১৫১০ খৃষ্টাব্দের একখানি তাম্রশাসনে পাওয়া যায় সেই সময়ে ত্রিবাঙ্কুরের রাজা ছিলেন মার্ত্তণ্ড বর্ম্মা। তিনি কাল্‌কান্দ রাজধানীর বীরপ্যাণ্ডান প্রাসাদ হইতে উক্ত তাম্রশাসন প্রকাশ করেন। কিন্তু মিঃ সান্‌গুনি তাঁহার ত্রিবাঙ্কুরের ইতিহাসে লিখিয়াছেন মার্ত্তণ্ড বর্ম্মা সে সময়ে রাজত্ব করেন নাই, তখন রাজা ছিলেন এ, রবিবর্ম্মা। মার্ত্তণ্ড বর্ম্মা, এ, রবি-বর্ম্মার পরে ১৫২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং সেই সময়ে কে রাজা ছিলেন, তাহা লইয়া গোল আছে। ত্রিবাঙ্কুর সে সময় (১৫৬৫ খৃঃ পর্য্যন্ত) বিজয়-নগরের অধীন একটা ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এবং তথাকার জনৈক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাকে জানাইয়াছেন, সেই সময়ে এই ক্ষুদ্র রাজ্যটিতে আবার বহু অধিনায়ক ছিলেন। সুতরাং চৈতন্যদেব তাঁহাদের মধ্যে সেইরূপ কোন ক্ষুদ্র নেতার রাজ্যে গিয়াছিলেন কিনা, জানা যায় নাই।

* "*Atta Chuna* is a kind of flour—a mixture of wheat, rice and the green pulse fried and powdered. It is an ordinary diet for persons who go on long journey. It is taken with sugar or jaggery after mixing with a little water. It was and is even now an article of diet with orthodox men and women."

রাজাদের দলিল পত্রে যে নাম পাওয়া যায়, তাহা পোষাকী নাম। কিন্তু সাধারণের মধ্যে অনেক সময় তাঁহারা ভিন্ন নামে পরিচিত থাকেন। আলমগির আরাঙ্গীবের, সেলিম জাহাঙ্গীরের, নূরজাহান মেহেরুন্নুছার এই রূপ নামের বাহুল্য রাজ রাজড়াদের বংশ-তালিকায় সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। শ্রীহট্টের ইতিহাসকার লিখিয়াছেন বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানদের প্রচলিত নাম ও বংশ-তালিকা এবং অপরাপর দলিল পত্রে প্রদত্ত নামের প্রায়ই ঐক্য দৃষ্ট হয় না। জঙ্গল-বাড়ীর দেওয়ানদের সম্বন্ধেও এইরূপ অনৈক্যের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইতেছে, তাহা আমি পূর্ব্বে-বঙ্গ গীতিকার অনুক্রমণিকায় খুব বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়াছি।

উড়িষ্যার তাৎকালিক রাজা প্রতাপরুদ্র প্রায়ই 'গজপতি' আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী তথাকার এক রাজা বঙ্গসাহিত্যে "ভ্রমর" নামে অভিহিত হইয়াছেন, অথচ "ভ্রমর" তাঁহার নাম নহে—উপাধি মাত্র, সে রাজার নাম কপিলেন্দ্র দেব।

এই সময়ে বিজয় নগরের রাজাদের এত উপাধি ছিল যে তাহা লইয়া পশ্চাত্য লেখকেরা অনেকই ঠাট্টা করিয়াছেন, * ত্রিবাঙ্কুরের রাজারা তখন ছিলেন বিজয়-নগরের অধীন। সম্রাটের যখন এত উপাধি ছিল, তখন সামন্ত রাজাদেরও কতকটা সেইরূপ থাকিবার কথা। আপত্তি-কারক বলিয়াছেন, ত্রিবাঙ্কুরের রাজারা ছিলেন বৈষ্ণব, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও "রুদ্রপতি" উপাধি থাকা সম্ভবপর নহে। এই সময়ের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় ত্রিবাঙ্কুরে পর পর এই তিন রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন; মার্ত্তণ্ড বর্ম্মা, এ, রবিবর্ম্মা এবং উদয়াদিত্য বর্ম্মা। এ সকল নামই সৌর, ইহাদের কোনটিই বৈষ্ণব নহে। বিশেষ "রামেশ্বর" অর্থ যদি শিব হইতে পারে, তবে "রুদ্রপতি" অর্থই বা বিষ্ণু হইতে আপত্তি কি?

* "The husband of *Subrst* (that is) of Good Fortune, God of great provinces, King of the Greatest Kings and God of Kings, Lord of all Horse forces, Master of those which know not how to speake, Emporour of three Emperours, Conqueror of all which he seeketh and Keeper of all which he hath overcome, Dreadful to the eight coasts of the world, the Vanquisher of Muhametan Armies, Ruler of all Provinces which he has taken. Taker of the spoiles and Riches of Ceilan, which far exceedeth the most Valiant man, which cut off the head of the Invincible, Virivalalam, Lord of the East, South, North, West and of the Sea, Hunter of Elephants; which liveth and glorieth in Virtue Miliarie." Purchas Pilgrimes, II, X. 1746. quoted by Oaten his European travellers in India. P. 97

এই লেখার বানানগুলি পর্ত্তুগিজ বানানের অনুযায়ী, সুতরাং কেহ তাহা মুদ্রাকর প্রমাদ মনে করিবেন না। উক্ত বিবরণটি পিমেণ্টের চিঠি হইতে সংগৃহীত (১৫৯৮ খৃঃ অব্দে লিখিত)।

এই উপাধি গুলির সঠিক অনুবাদ দেওয়া কঠিন, কয়েকটির অনুবাদ দিতেছি। "সৌভাগ্য-পতি", "মহারাষ্ট্র-পতি," "রাজরাজেশ্বর," "রাজ-কুলেশ্বর," "অশ্বপতি," "অবাক্‌পতি" "ত্রিরাষ্টপতি" পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণদিগ্‌পতি," "ক্ষাত্রধর্ম্ম পাল," "গজ-পতি" ইত্যাদি—এই উপাধিগুলির মধ্যে "পতি' (Lord) শব্দের বাহুল্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এই সময়কার ত্রিবাঙ্কুরের ইতিহাস সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ অতি অল্প কথাই জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই সন্দেহপূর্ণ জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজাদের ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিনায়কদের তাৎকালিক ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা দরকার, তজ্জন্য বিস্তর মাল মসলা ঘাটিতে হইবে। এই অসাধ্য সাধনের দুর্গম পথ ত্যাগ করিয়া আপত্তি-কারক এক কথায় সহজ মীমাংশা করিয়াছেন। "এক মাত্র এই কারণেই করচা অগ্রহ্য।"

তাঁহার যুক্তিটা শাণিত করিয়া চৈতন্য চরিতামৃতের দিকে ফিরাইয়া লউন। উক্তগ্রন্থের মধ্য-খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে এক শত ত্রিশ শ্লোকে "প্রতাপরুদ্রের" স্থলে গ্রন্থকার "বর্দ্ধনরুদ্র" লিখিয়াছেন। এখন যদি এক মাত্র এই কারণেই চৈতন্য চরিতামৃতকে অগ্রহ্য করা হয়, তবে লেখক কি বলিবেন?

চৈতন্য প্রভুর পাচক ব্রাহ্মণের দরকার এবং বর্ণাশ্রম।

আপত্তি-কারকেরা বলিতেছেন (প্রবাসী ৪র্থ সংখ্যা, ২৫ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪৮০ পৃঃ) যে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ যদি মহাপ্রভুর সঙ্গে না যাইবে, তবে তাঁহাকে রাঁধিয়া খাওয়াইবে কে? সন্ন্যাস গ্রহণের পরে কখনও তো এমন শুনি নাই যে কেহ রাঁধুনী বামুন সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। রূপ, সনাতন, জীব ইহাঁরাও তো ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন' ইহাঁদের তো রাঁধুনী বামুন সঙ্গে লওয়ার বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেব হইতে শ্রীনিবাস, নরোত্তম এমন কি লালা বাবু পর্য্যন্ত কাহাকেও তো পাচক ব্রাহ্মণ সঙ্গে লওয়ার জন্য ব্যস্ততা দেখা যায় না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, কবিকর্ণপুর স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, গোদাবরীর তীর পর্য্যন্ত যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন চৈতন্য তাঁহাদিগকে সঙ্গে যাইতে দেন নাই। প্রতাপরুদ্র যখন সার্ব্বভৌমকে অনুযোগ দিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণ সহচর ছাড়া তাঁহাকে আপনারা যাইতে দিলেন কেন? তখন সার্ব্বভৌম বলিলেন, মহাপ্রভুর নিষেধে কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার অনুগমন করিতে পারেন নাই (রাজা—"ব্রাহ্মণাস্তাবদ্দূরং—সেতুবন্ধ পর্য্যন্তং কিমু ন প্রেষিতাঃ ভট্টাচার্য্য—"তস্যানমুমতেঃ গোদাবরী পর্য্যন্তমস্তু।" চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, ৭ম অঙ্কঃ।)

মোট কথা আধুনিক বৈষ্ণবদের কেহ কেহ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার আগ্রাহাতিশয়ে এই জীবন্ত নরদেবতাটিকে শ্লোকাঙ্কিত পাষাণ-বিগ্রহে পরিণত করিতে চান। তাঁহারা তাঁহাকে স্মৃতিকারদিগের অধীন এবং তাঁহাদিগের অপেক্ষা ছোট করিয়া ফেলিতেছেন। চৈতন্য-জীবনী পাঠ করিলে দেখা যায় তিনি সন্ন্যাস আশ্রমের নিয়মগুলি মানিয়া চলিতেন না। তিনি সন্ন্যাসের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া প্রত্যহ প্রেম-ভক্তি পরিপুষ্ট করিবার জন্য বারংবার জগন্নাথের ভোগ আস্বাদ করিতেছেন, এইজন্য সার্ব্বভৌম

প্রথমতঃ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। "জগন্নাথ যতবার করয়ে ভোজন। ততবার সন্ন্যাসী সে করয়ে ভক্ষণ॥ যুবাকালে এত ভক্ষণ যে জন করয়! তার কাম নিবৃত্তি কেমন মতে হয়॥" (লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড)

এই সন্ন্যাসের রীতি অগ্রাহ্য করার জন্য সার্ব্বভৌম চৈতন্যদেবকে অনুযোগ দিলে তিনি পরম দৈন্য সহকারে বলিয়াছিলেন—"সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিও নিশ্চয়।" "সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।" (চৈ, ভা, অন্ত্য) দামোদর পণ্ডিত তাঁহার সন্ন্যাস ধর্ম্মের ব্যতিক্রম দেখিলে—তাঁহাকে শাসন করিতেন ("আমি তো সন্ন্যাসী দামোদর ব্রহ্মচারী। সদা রহে আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরি" (মধ্য, ৭ম পঃ, ১৯ শ্লোক, চৈ, চ) একথা সত্য, তিনি মাধ্বী-সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি মাধ্বাচার্য্যের মত মানিয়া চলিতেন না। মাধ্যচার্য্য ভগবানের ঐশ্বর্য্যের উপর জোর দিতেন। কিন্তু কে না জানে মহাপ্রভু ভগবানের মধুর লীলার অনুরাগী ছিলেন?

অবশ্য এ কথাটা ঠিক যে তিনি ধর্ম্মপ্রচারের জন্য প্রাচীন ঋষিদিগের মতানুসারে নজিরসহ বৈষ্ণব মহাগ্রন্থ 'হরিভক্তি বিলাস' রচনা করিবার জন্য অশেষ শাস্ত্রকুসলী সনাতনকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে ছিলেন, সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রের ঊর্দ্ধে, তিনি মনুষ্যত্বের অতি ঊর্দ্ধেস্থিত দেবলোক হইতে প্রেমের অপূর্ব্ব উন্মাদনাময় সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন, তাহাতে অচল চলিয়াছিল এবং নদী উজানে বহিয়াছিল।

রামরায় শূদ্র হইলেও চৈতন্যদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতের মতে ব্রাহ্মণগণের ইহা ভাল লাগে নাই। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "এই তো সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্ম সম। শূদ্র আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন॥" (চৈ, চ, মধ্য, ৮ম পঃ, ১৬) বস্তুত যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম চৈতন্যদেব শিথিল করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব সমাজে আবার তাহা মাথা জাগাইয়া তুলিতেছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই অংশটি কবিকর্ণপুরের গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষোক্ত পুস্তকে ব্রাহ্মণগণের এই বিস্ময়ের কথাটি নাই। যাঁহারা করচার বিরোধী, তাঁহাদের কেহ কেহ কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ সঙ্গে না থাকিলে মহাপ্রভু বিদেশে মহা মুস্কিলে পড়িতেন, এই আভাস দিয়াছেন। তিনি শুধু রামরায়কে আলিঙ্গন দেন নাই, শূদ্র শ্রীগোবিন্দকেও আলিঙ্গন দিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দকে তিনি জাতি-ভেদের গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়া ভ্রাতৃভাব স্থাপনের জন্য বঙ্গদেশে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, নিত্যানন্দ ছিলেন ভোলা মহেশ্বর—পতিতের প্রতি তাঁহার ছিল অপার করুণা। চৈতন্য বুঝিয়াছিলেন, তিনিই পতিত-উদ্ধার-কার্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য। এইজন্য তিনি নিত্যানন্দকে বঙ্গদেশ ছাড়িয়া দীর্ঘকাল কোথায়ও থাকিতে দিতেন না। কিরূপে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা আভিজাত্য গর্ব্বিত সমাজে একটু আদর পাইবে, তাহা তিনি গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়া নির্জ্জনে নিত্যানন্দের সঙ্গে আলোচনা করিতেন। (চৈ, ভা,)

নিত্যানন্দ গৃহাশ্রম স্বীকার করিয়া শুধু সুবর্ণ বণিক উদ্ধরণ দত্তের হাতের ভাত খাইতেন না, হাড়ি, ডোম সকলের ঘরেই খাইতেন। ("হেন জাতি না খাইল যার ঘরে" চৈ, ভা, ২৪শ অ) কায়স্থ-কুল শিরোমণি কালিদাস যখন ঝড়ু নামক ভুঁইমালীর উচ্ছিষ্ট আম্রফল ড্রেন হইতে তুলিয়া লইয়া তাহা চুষিয়া খাইয়া জাতি-ভেদের মস্তকে বজ্রাঘাত করিয়াছিলেন—তখন প্রেমের দেবতা চৈতন্য তাঁহার এই কার্য্যের অনুমোদন করিয়া উৎসাহ দিয়াছিলেন। কালিদাস শুধু ঝড়ুর উচ্ছিষ্ট খান নাই, তাহার পদরজ অঙ্গে মাখিয়া জাতিভেদের অসারতা প্রমাণ করিয়াছিলেন। চৈতন্য এজন্য তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়াছিলেন। আজ যে গোস্বামীরা সর্ব্বজাতি নির্ব্বিশেষে মন্ত্র দিয়া সকলের ঘরে আহার করিতেছেন, তাহ সেই পতিত পাবন দীনদয়াল প্রভুর উদারতার ফলে। প্রকৃত বৈষ্ণবগণ শাক্ত কবির নিন্দাবাদকে পুষ্পচন্দন মনে করিতেন, "গৌর ব'লে আনন্দে মেতে। একত্রে ভোজন ছ'ত্রিশ জেতে॥ বাগ্দী হাড়ি ধোপা কলুতে একত্র সমস্ত।" এই আনন্দ-গঙ্গায় অবগাহন-পুণ্য বৈষ্ণবেরা পুনরায় নিজদিগকে জাত্যাভিমানের কুক্ষীগত করিতেছেন, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। কীর্ত্তনীয়ারা গর্ব্ব করিয়া গাহিয়া থাকে "সব অবিধি ন'দের বিধি"—অন্যত্র যাহা অবিধি বা অশাস্ত্রীয় তাহাই "ন'দের বিধি"। চৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায় যবন হরিদাসকে প্রভু ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ তুল্য আদর ও শ্রদ্ধা দিয়াছেন এবং তাহার মৃত্যুকালে সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে দিয়া সেই ভক্তপ্রবরের পাদোদক পান করাইয়াছিলেন। তিনি বজ্রগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন "মোর জাতি মোর সেবকের জাতি নাই" (চৈ,ভা, অন্ত্য ১১) চৈতন্যদেব সন্ন্যাসী পণ্ডিতদের গর্ব্ব নাশ করিবার জন্য শূদ্র রাম রায়ের দ্বারা শাস্ত্র ব্যাখা করাইয়াছিলেন—"সন্ন্যাসী পণ্ডিত গণের করিতে গর্ব্ব নাশ। নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ।" (চৈ, চ অন্ত্য ৫।৩৪) আজ কাল বৈষ্ণব সমাজের সেই বিশ্বব্যাপী উদার নীতি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ঈশ্বর পুরী পুনঃ পুনঃ নিজকে "শূদ্রাধম" বলিয়াছেন। এখন কার চৈতন্য ভাগবতের কোন কোন সংস্করণে "শূদ্রাধম" পাঠের স্থলে "ক্ষুদ্রাধম" লিখিত দেখিতে পাইতেছি। সম্পাদকগণের কাহারও কাহারও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আমার কোন সংশয় নাই। তাঁহারা যে অনেক প্রাচীন পুথি দেখিয়া চৈতন্য ভাগবত সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা নিজেরাই লিখিয়াছেন। তাঁহারা পাদোটীকার অন্যান্য স্থলে পাঠান্তর দিয়াছেন কিন্তু "শূদ্রাধম" যদি বা কোন পুথিতে ছিল, তাহা লিখিয়া অন্য কোন পাঠান্তরের উল্লেখ করেন নাই। চৈতন্য ভাগবতের বহু প্রাচীন পুথি আমরা দেখিয়াছি এবং তাহাদের সর্ব্বত্রই "শূদ্রাধম" পাঠ আমরা পাইয়াছি। এ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুথি বিভাগের ভার প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ., মহাশয় আমা[illegible] লিখিয়াছেন :—"কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি শালায় রক্ষিত বৃন্দাবন-দাসকৃত চৈতন্য-ভাগবতের পুথি সমূহের অনেক গুলি পাঠ করিয়া দেখিলাম। এই গ্রন্থে ঈশ্বর পুরী "আমি শূদ্রাধম" বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। ৪৮১ নং পুথির ৭২ পৃষ্ঠায় ৪৮২ নং পুথির

৩৬ পৃষ্ঠায়, ৪৭৩ নং পুথির ৫০ পৃষ্ঠায় এবং ৪৭২ নং পুথির ৬৬ পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে এই কথা লিখিত আছে।”

মহাভক্ত ঈশ্বরপুরীর নিকট চৈতন্যদেব “দশাক্ষর” মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে সর্ব্ব তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পুণ্য তীর্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এ হেন ব্যক্তি ব্রাহ্মণেতর জাতি হইলে সে যে সমাজ বিরোধী কথা হয়!

চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন কুল তাহাকে চিহ্নিত করিতে পারে নাই। তিনি ছিলেন সর্ব্বকুলের বিশ্বপ্রেমিক কুলদেবতা। সর্ব্ব বর্ণের সঙ্গে তাঁহার বৈষম্য দূর করিবার জন্য তিনি শিখাসূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণ-ভক্ত ছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণব বলিতে এখন আমরা যাহা বুঝি তিনি তাহা ছিলেন না। তিনি দর্পণ সম্মুখে রাখিয়া মাপ জোক দিয়া তিলক কাটেন নাই কিংবা কোনরূপ অঙ্গরাগ করেন নাই। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে কবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন “স্নানং নো তুলসী নিষেবন বিধি নো চক্র-সন্দর্শনং নো নাম গ্রহণঞ্চ নো নতি ততি র্নো” (দশমাঙ্ক)। তিনি নিয়মের গণ্ডীতে পা দিয়া কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হন নাই। বসুধা তাহার কুটম্ব ছিল। কুটম্ব হিসাবে বৈষ্ণব তাহার পর ছিল না, কিন্তু বৈষ্ণব সমাজ তাঁহাকে এক মাত্র তাঁহাদের বলিয়া ঘোষণা করিবেন, এরূপ সুবিধা তিনি দেন নাই। শৈব, শাক্ত ও অপরাপর ধর্ম্মমত তাঁহার রাজকীয় প্রেমপথের পরিপন্থী ছিল না। এই জন্য তিনি কখনও ‘হর’ কখনও ‘ভবানী’ নাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার আরাধ্যকে প্রণতি জানাইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। বর্ণাশ্রমের প্রচারকদের এই মহা সন্ন্যাসীর অপরিহার্য্য সঙ্গী স্বরূপ একজন পাচক ব্রাহ্মণ জুড়িয়া দেওয়ার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া হাসি পায়। হরিচরণ তাহার অদ্বৈত মঙ্গলে মহাপ্রভু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন “বর্ণাশ্রম চণ্ডালাদি একত্র করিলা।”

চৈতন্য দেবের জটা

দেববিগ্রহ নির্ম্মাণ করিতে গেলে আধুনিক যুগে দাড়ি দেওয়ার রীতি নাই। অদ্বৈতাচার্য্যের দাড়ি ছিল (“দাড়ি পড়িয়াছে তার হৃদয় ছাইয়া”) ইহা শুনিয়া খড়দহের এক গোস্বামী অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কারণ শান্তিপুরে অদ্বৈত বিগ্রহে দাড়ি নাই। যাহারা দেবতা, তাঁহাদের কৈশোর-মূর্ত্তি কল্পনা করাই এদেশের আধুনিক রীতি। কিন্তু অদ্বৈতাচার্য্যের যে দাড়ি ছিল তাহা শুধু করচায় নহে, অনেক প্রাচীন পদেও পাওয়া যায়। গৌরপদ তরঙ্গিণীতে তাঁহার আবক্ষ বিস্তৃত লোমাবলীর উল্লেখ আছে। [illegible] বঙ্গীয় সাহিত্যপরিচয় ১ম খণ্ডের ৭৫৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এদিকে চৈতন্য এবং নিত্যানন্দের দাড়ি গোঁফ বিরহিত কৈশোর মূর্ত্তির সঙ্গে যাহারা পরিচিত, তাঁহারা যদি প্রাচীন চিত্রগুলি দেখিতেন তবে নিশ্চয়ই কতকটা বিস্মিত হইতেন। একখানি প্রাচীন পটে নিত্যানন্দ প্রভুর খুব প্রকাণ্ড দাড়ি দেওয়া আছে।

সুতরাং চৈতন্যদেবের জটা হইয়াছিল এ কথাটা অনেক গোঁড়া বৈষ্ণবের ভাল লাগে নাই। করচাতে সন্ন্যাস গ্রহণের পাঁচ মাস পরে চৈতন্যের জটার উল্লেখ আছে। দীর্ঘকালের জন্য পথ পর্য্যটন করিতে হইলে সন্ন্যাসীরা কৃত্রিম জটা ধারণ করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। তীর্থ যাত্রাকালে কেশ-মুণ্ডনের ব্যবস্থা নাই ("প্রবাসে তীর্থ যাত্রায়াং মাতৃপিতৃ বিয়োগতঃ। কচানাং বপনং কার্য্যং বৃথা ন বিকচো ভবেৎ"—প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্) দীর্ঘ প্রবাস যাত্রার প্রাক্কালে জটাধারণের পদ্ধতি রামায়ণের পূর্ব্ব সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে। স্বয়ং রামচন্দ্র বনযাত্রার প্রথম দিনেই জটাধারণ করিয়াছিলেন "এবমস্তু গমিষ্যামি বনং বস্তুমহং স্থিতঃ। জটাচীরধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন॥" কৃত্তিবাস রামের এই জটাধারণের কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবাসী লিখিতেছেন, এরূপ জটাধারণ ভণ্ডসন্ন্যাসীর কার্য্য। সুতরাং রামচন্দ্রও তাহার মতে ভণ্ড ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন "যে প্রভু ভণ্ডামীর উপর এত চটা যে"—ইত্যাদি। রাম ক্ষত্রিয়, কিন্তু চৈতন্য ব্রাহ্মণ, এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া তিনি রামের নজির অগ্রাহ্য করিয়াছেন। রামের সঙ্গে তুলনা করিতে যাইয়াও চৈতন্যদেবের বামনাই ফলাইতে হইবে!

চরিতামৃত ও অন্যান্য গ্রন্থের বর্ণনা অনৈক্য

চৈতন্যদেব ত্রিবাঙ্কুরে যাইয়া কতকটা দূরে অবস্থিত আদি কেশব ও জনার্দ্দনের মন্দির দেখিলেন না কেন এবং "কর্ণামৃত সংগ্রহ না করিয়াই তিনি চলিয়া আসিলেন" এই হেতুবাদে কেহ কেহ করচাকে অপ্রামাণিক মনে করিয়াছেন। গোবিন্দ সামান্য বাঙ্গালা জানিতেন। সংস্কৃত ত জানিতেনই না, এইজন্য যেখানে পাণ্ডিত্যের কথা সেখানে তিনি মূক হইয়া থাকিতেন। রামরায়ের সঙ্গে চৈতন্য প্রভুর যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা শতাংশের এক অংশও তিনি লিখিতে পারেন নাই, এজন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। কর্ণামৃত মহাপ্রভু সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই ক্ষুদ্র তত্ত্বও কি আমরা মূর্খ ভৃত্যের নিকটে আশা করিতে পারি? কোন কোন তীর্থে যাইয়া কেন যে তিনি কোন কোন মন্দির দেখেন নাই তাহার কারণ আমরা তাঁহাকে পাইলে জিজ্ঞাসা করিতাম। না দেখিবার একশত একটা কারণ থাকিতে পারে। তিনি দাক্ষিণাত্যের সমস্ত দেবমন্দিরই দেখিয়াছিলেন, এরূপ কেহ কখন কি হলপ করিয়া বলিতে পারেন? চৈতন্য চরিতামৃতের পূর্ব্ববর্ত্তী "চৈতন্য চন্দ্রোদয়" ও "চৈতন্য ভাগবত" প্রভৃতি গ্রন্থেও ত কর্ণামৃত সংগ্রহ, এবং আদি কেশব ও জনার্দ্দনের মন্দির দেখার কথা নাই। সে সম্বন্ধে আপত্তি-কারক কি বলেন? মহাপ্রভুর দ্বারকাধীশের মন্দির দেখার মত এত বড় একটা কথাও ত চরিতামৃতে নাই, ইহাতে আপত্তিকারক বিস্মৃত হইয়াছেন, কিন্তু ইহা লইয়া বিশেষ কোন বাক্য ব্যয় করেন নাই।

মহাপ্রভু অনন্তদেব হইয়াছিলেন এবং অদ্বৈতপ্রভু দেখিয়াছিলেন "সপ্ত ফণাধর মহা নাগগণ। উর্দ্ধবাহু স্তুতি করে তুলি সব ফণ" কিংবা তিনি সিংহরূপ ধারণ করিয়া কাজীর বক্ষে নখাঘাত করিতেছেন, এ সকল অলৌকিক কথা ছাড়িয়া দিলেও চরিতামৃতাদি গ্রন্থে যে কথাগুলি অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিকরূপ বর্ণিত আছে তাহারও সমস্তটা সময়ে সময়ে বিশ্বাস করা যায় না। চরিতামৃতকার চৈতন্য প্রভুর দেহ বর্ণনার উপলক্ষে লিখিয়াছেন যে তাঁহার নিজ বিরাট হস্তের মাপে তাহাঁর দেহ দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে চারি হস্ত পরিমিত ছিল (চৈ, চ আদি ৩।৩১, ৫।৯৬) ইঁহাতে তাহার দেহ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৯ ফিট হইয়া পড়ে। কলিকাতার গৃহস্থদের বাড়ীর অধিকাংশ দরজাগুলি ৬।৭ কিংবা জোড় ৭½ ফিট উচ্চ। এমতাবস্থায় যদি তাঁহাকে এই সকল বাড়ীর কোন ঘরে ঢুকিতে হইত, তবে হামাগুড়ি দিতে হইত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যাঁহারা 'শিয়ালের' জায়গায় 'শৃগালী' হইল কিনা, এবং প্রভু কৃত্রিম জটা ধারণ করিলেন কিনা এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের ঐতিহ্য লইয়া মহাহট্টগোল করিতেছেন; তাঁহারা চৈতন্যচরিতামৃতের সকল কথা মানিয়া লইলে প্রভুর যে গৃহ-প্রবেশ পর্য্যন্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে, এবিষয়ে একটুকু আলোচনা করিলেন না। করচার সঙ্গে চরিতামৃতের কোন জায়গায় গরমিল হইলে যাঁহারা অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন, তাঁহারা চৈতন্য চরিতামৃতের সঙ্গে চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচন্দ্রোদয় ও চৈতন্যমঙ্গলের যে কত স্থানে অনৈক্য আছে তাহা একবারও লক্ষ্য করেন না। চৈতন্য ভাগবতে আছে সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বরাত্রে মহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে ছিলেন না ("নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর"—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৬ পঃ) কিন্তু এই উপলক্ষে লোচনদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার রাত্রিবাসের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার রুচি প্রায় ভারতচন্দ্রের কাছাকাছি যায় (অবশ্য 'লীলা' বলিলে কাহারও কিছু বলিবার থাকে না)—"ক্ষেণে ভুজলতা বেড়ি আলিঙ্গন করে। নব কমলিনী যেন করিবর কোলে॥ * * নানারস বিহারয়ে বিনোদ নাগর। আছুক অন্যের কাজ কাম অগোচর॥ * * হৃদয় উপরে থোয় না শোয়ায় শয্যা। পাশ উলটিতে নাহি দোহে এক মজ্জা॥ বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়। রস অবশেষে দোহে সুখে নিদ্রা যায়॥" (লোচন চৈ, ম, মধ্য খণ্ড) চৈতন্য মঙ্গলে উল্লিখিত আছে সন্ন্যাস গ্রহণের চারিদিন পরে শচীদেবীর সঙ্গে চৈতন্যের শান্তিপুর অদ্বৈত গৃহে দেখা হয়, কিন্তু চৈতন্য ভাগবতে পাই যে সন্ন্যাসের পর বার দিন পর্য্যন্ত শচীদেবী অনাহারে নবদ্বীপে পড়িয়া ছিলেন, তৎপর নিত্যানন্দ ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে সর্ব্ব প্রথম চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা অবগত করান। চৈতন্যমঙ্গলে লিখিত আছে সন্ন্যাসের পরে মহাপ্রভু পুনরায় নবদ্বীপে গিয়াছিলেন ("মায়ের বচনে পুন গেল নবদ্বীপ। করুণা বাড়িল নিজ বাড়ীর সমীপ॥")। এ কথার সঙ্গে অন্যান্য চরিতাখ্যানের ঐক্য নাই। চৈতন্য ভাগবতে প্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের উল্লেখ অথবা সঙ্গী কৃষ্ণদাসের নাম নাই, এবং কবিকর্ণপুর যিনি খাস পুরীতে বসিয়া (যথা হইতে মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হন), তাঁহার অন্তর্দ্ধানের কিছু পরে লিখিয়াছিলেন যে মহাপ্রভুর সঙ্গে গোদাবরীর তীর অতিক্রম

করিয়া কোন ব্রাহ্মণই দাক্ষিণাত্যে যান নাই। অথচ বহুদুর বৃন্দাবনে বসিয়া একশতাব্দী পরে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণদাস নামক ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে ঘুরিয়াছিলেন। প্রাচীন কবি বলরামদাস প্রায় চরিতামৃতের সমকালে লিখিয়াছেন, গোবিন্দ মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য যাত্রার সঙ্গী ছিলেন, অথচ চরিতামৃতে সে কথা নাই। এখন যখন ঐতিহাসিক বিচারের যুগ, অন্ধভাবে কোন কথা গ্রহণের দিন চলিয়া গিয়াছে এবং গোঁড়া বৈষ্ণবদের মধ্যে যখন কেহ কেহ গোবিন্দদাসকে লইয়া বিচারে বসিয়া গিয়াছেন, তখন সকলকে লইয়াই বিচার করিতে বসিবার দরকার হইবে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে মেণ্ডেজ পিণ্টো এবং মার্কোপোলো প্রভৃতি পর্য্যটকদিগকে লইয়া এক সময়ে কিরূপ মিথ্যা হৈ চৈ উঠিয়াছিল এবং এখন পর্য্যন্ত সেক্ষপীয়ারকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা একবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই। মহা কবির হস্তলিখিত পুথি ও পুস্তক পাওয়া যায় নাই, এই অভিযোগ লইয়া তাঁহার সমস্ত নাটক ও কাব্য বেকন্ লিখিয়াছেন,—এইরূপ আন্দোলন এখনও চলিতেছে। *

গোবিন্দ দাসের বিরুদ্ধে হৈ চৈ টা আমাদের নিকট এইরূপই একটা আন্দোলন বলিয়া মনে হইতেছে। এই পুস্তক খানি আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্যের এতটা জায়গা জুড়িয়া বসিয়াছে

* সেক্ষপিয়ার সম্বন্ধে আন্দোলন রহস্য খুব কৌতুকাবহ। বষ্টন নগরে জোসেফ হার্ট নামক এক পণ্ডিত ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রচার করেন, সেক্ষপিয়ারের রচিত বলিয়া যে সকল নাটক চলিয়া আসিয়াছে, তাহা সকলই বেকনের লেখা। এই দলের গোঁড়াদের মধ্যে স্যার এডউইন লরেন্সের নাম উল্লিখিত হইতে পারে। ইনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে 'বেকনই সেক্ষপিয়ার' নামক এক বৃহৎ পুস্তক রচনা করেন এবং তাহার একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ৩০০০০০ কাপি ছাপাইয়া এক পেনি মূল্যে বিক্রয় করেন। তিনি মহাকবির 'লাভস্ লেবর লষ্ট' নামক নাটকে পঞ্চমাঙ্কের একটি শব্দ ধরিয়া তাহার এই মর্ম্ম উদ্ধার করেন,—"এই সকল নাটক আমার লেখা"—ফ্রান্সিস বেকন। কিন্তু আর তিন শতাব্দীর মধ্যে এ কথা কাহাকেও বলিওনা, তার পরে তাহা আপনি জগতে প্রকাশিত হইবে।"

কিন্তু শুধু বেকন নহে, আরও অনেক লেখক তাঁহাদের স্তাবকদিগের চেষ্টায় সেক্ষপিয়রের সিংহাসনের দাবীদার বলিয়া উপস্থাপিত হইয়াছেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণ কারল ব্লিবট্রিউ প্রমাণ করেন, সেক্ষপিয়ার এই সকল নাটকের লেখক নহেন, ব্যাটলাণ্ডের পঞ্চম আর্‌ল রোজার ম্যানারস্ সেগুলি লিখিয়াছেন।" ফরাসী লেখক অধ্যাপক আবে লেফ্রাঁ প্রমাণ করেন ডারবীর্ ষষ্ঠ আর্‌ল উইলিয়াম ষ্টাওলি সেক্ষপিয়ার রচিত বলিয়া যে সকল নাটক চলিতেছে, তাহাদের প্রকৃত রচয়িতা। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে টমাস্ লুনি নামক আর এক ব্যক্তি আসিয়া "সেক্ষপিয়ার সোনাক্ত হইল" (Shakespeare identified) নামক সন্দর্ভে স্থির করিলেন ঐ সকল নাটকের প্রকৃত লেখক অক্সফোর্ডের সপ্তদশ আরল এড্ওয়ার্ড ডি, ভির।

শেষোক্ত লেখকগণ বেকনের পক্ষীয় দলকে কতকটা জব্দ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা বলিতে চাহিতেছেন, যে বেকন এই সকল নাটক রচনা করেন নাই, এ কথা যেমন সত্য, এ্যাভন নদীর তীরে ষ্ট্রাফোর্ড-বাসী গণ্ডমুর্খটা এগুলি কখনও রচনা করে নাই—এ কথাও তেমনই সত্য।

এবং ইহার শিকর এতটা নীচে নামিয়াছে, যে কতগুলি অমূলক কথায় বলে এখন ইহাকে খারিজ করিয়া ফেলা একরূপ অসাধ্য-সাধন।

শুধু আমাকে লইয়া নহে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবর্জ্জনা দূর করিবার জন্য যাঁহারা বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন, তাঁহারা ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কেও চিঠি পত্র লিখিয়া ব্যতিবস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ১৯২৬ সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পল্লীবাসী পত্রিকায় ডাক্তার রবীন্দ্র নাথ বৈষ্ণবধর্ম্মে যে আঘাত করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে "সমাজের প্রধান ব্যক্তি গণ প্রাচীন ধারা ধরিতে না পারিয়া নানা ভুল করিয়া বর্ত্তমান সকল বিভাগের যে ভীষণ বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলেও হৃৎকম্প হয়।" রবীন্দ্রঠাকুর মহাশয়কে ইঁহারা ৬ই শ্রাবণ (১৩৩১) যে শেষ চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা উক্ত পল্লীবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। গীতাঞ্জলী হইতে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিয়া ইহাঁরা তাঁহাকে লিখিয়াছেন "উপরোক্ত ভাবে বৈষ্ণবের মর্ম্ম নিয়া ছিনিমিনি খেলা কতদূর শোভা পাইয়াছে, সে সম্বন্ধে আপনার শেষ কথা আমাদের জানা আবশ্যক।"

এই মহা বিচারশালার নিকট কৈফিয়ৎ দিতে যাইয়া কবিবরের হৃৎকম্প উপস্থিত হইবার কথা। বিশ্বকোষের নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের উপরও নির্য্যাতন চলিতেছে। ১৯২৬ সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারীর পল্লীবাসীতে প্রকাশ, তাঁহার উপর আর একখানি পরওয়ানা জারি হইয়াছে—তাহার একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি:—"বিশ্বকোষ নামক অভিধানে শ্রীশ্রীচৈতন্যামৃতকার শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ও প্রাচীন পদকর্ত্তাগণ এবং আচার্য্যগণের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে আপনি সহজিয়া ভাব আরোপ করিয়াছেন।"

২২শে মে (১৯২৫) তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশ যে বৈষ্ণব কুলগুরু শ্রীখণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ নরহরি ঠাকুর প্রভুর মত লইয়া তদ্বংশীয় শ্রীযুক্তরাখালানন্দ ঠাকুরের উপর সহজিয়া দোষ আরোপ পূর্ব্বক আক্রমণ করা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া বৈষ্ণব সাহিত্যের মুকুটমণি সুপ্রসিদ্ধ ভক্তিরত্নাকর, জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল এবং নিত্যানন্দের প্রেমবিলাস প্রভৃতি বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থগুলি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, এইরূপ আন্দোলনও ইহাঁরা করিতেছেন। মহাপ্রভুকে ইহাঁরা ইচ্ছামত মোমের পুতুলের মত গড়িয়া রাখিয়াছেন, পাছে কোনরূপ হাওয়া লাগিয়া সেই বিগ্রহ গলিয়া পড়ে, এইজন্য সর্ব্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের অরাধ্যের মুরুব্বিয়ানা করিতেছেন। ১৩৩২ সালের ৬ই চৈত্রের গৌড়ীয় পত্রিকায় কোন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন "ডাক্তার দীনেশ বাবু গদ্যে এবং ডাক্তার রবীন্দ্র নাথ গদ্যে পদ্যে বৈষ্ণব নামের কোন সার্থক ভাব করেন নাই।" কিন্তু ডাঃ রবীন্দ্র নাথ এবং এই দীন লেখক যে বৈষ্ণব, এমন প্রমাণ ইহাঁরা কোথায় পাইলেন?

বৈষ্ণব ধর্ম্মের আবর্জ্জনা দূর করিতে যাইয়া ইহাঁরা যখন গীতাঞ্জলী হইতে ভক্তিরত্নাকর, বিশ্বকোষ প্রভৃতি অনেক পুস্তকের উপর নোটিস দিয়া বসিয়াছেন, তখন করচা অবশ্য সৎসঙ্গে

আছে, এ কথা বলা যাইতে পারে। অবশ্য এতগুলি আবর্জ্জনা দূর করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম তথা মহাপ্রভুকে রক্ষা করিতে হইলে অনেক অর্থের দরকার হইবে। তজ্জন্য তাঁহারা কি করিতেছেন?

প্রতিপক্ষীয়েরা কিরূপে এই প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন, তাহার আর একটা উদাহরণ দিব। মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর ইহাঁদের উত্তেজনা পূর্ণ প্রবন্ধাদি পড়িয়া কোন এক বৈষ্ণবকে লিখিয়াছিলেন "দীনেশ বাবু বৈষ্ণব ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছেন।" এ সম্বন্ধে আমি মহারাজা বাহাদুরকে চিঠি লিখায় তিনি উত্তরে আমাকে জানাইয়াছেন, যে তিনি একটা সাময়িক ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ লিখিয়াছিলেন, তাঁহার বিনা অনুমতি সেই ব্যক্তি ঐরূপ চিঠি লিখিয়া ভাল করেন নাই।

বৈষ্ণব গুরুদিগের শিষ্যদের অবস্থা একটু শঙ্কটাপন্ন। যদি কোন গুরু কিছু বলেন, তবে শিষ্যদের তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করা পাপ হয়। কিন্তু তাই বলিয়া যিনি ইতিহাস লিখিবেন, তিনি তালকে তিল এবং তিলকে তাল করিতে পারেন না।

আমার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে আমি বৈষ্ণব ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছি। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট যে আবেদন গিয়াছিল, তন্মধ্যে এইটি বিশেষ অভিযোগ ছিল।

কিন্তু এ সম্বন্ধে সামান্য দুই একজন গোঁড়া বৈষ্ণব যাহাই বলুন না কেন, বাহিরের লোকদের মত অন্যরূপ। ১৯১৯ সালের ২৯৫ সংখ্যক কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় অধ্যাপক এ, সি, আণ্ডারউড "চৈতন্য এবং বঙ্গীয় সম্প্রদায়" শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন, তাহার একটি অংশের মর্ম্মানুবাদ প্রদানকরিতেছি:—* "ইহার পরে রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র সেনের পুস্তকগুলি প্রকাশিত হওয়ার পরে বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পথ খুব সুগম হইয়া গিয়াছে। ১৯১১ খৃঃ অব্দে তাঁহার ইংরাজীতে লিখিতে বঙ্গভাষাও সাহিত্যের ইতিহাস প্রকাশিত হয়। তাঁহার বিরাট শ্রমের ফলস্বরূপ এই পুস্তক খানি প্রকাশিত হওয়া মাত্র বার্থ, সেনার্ট, রিচ্ ডেভিস্, গ্রিয়ারসন, বারনেট, কারণ্ এবং ওল্ডেনবার্গ প্রভৃতি বিখ্যাত য়ুরোপীয় পণ্ডিত গণের আদর লাভ করে.........একথা সর্ব্ববাদী-

* But the situation has greatly changed since Rai Shahib Dinesh Chandra Sen began to publish his patient and scientific researches into the History of Bengali Language and literature. The worth of his painstaking labours was immediately recognised in the West by such well-known Orientalists as Barth, Senart, Rhys Davids, Grierson, Barnett, Kern and Oldenberg......It is generally admitted that one of the most valuable chapters in Mr. Sens History is the lengthy one in which he treats of the Vaisnava Literature of Bengal He has returned to his subject in his Vaisnava Literature of Medieval Bengal and in his Chaitanya and his companions, both published in 1917, while in his Banga Sahitya Parichaya (1914) will be found the Bengali texts of many Vaisnava lyrics and extracts from their historical works. Though the Rai Shahib is not himself a Vaisnava, he brings to the enterpretation of the Vaisnava Literature of his country a fine enthusiasm and a sympathetic imagination. At the same time his imagination and sympathy are controlled by his historical sense."

সম্প্রতি যে দীনেশ বাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে বৈষ্ণব প্রসঙ্গ অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে। তৎপর তিনি "চৈতন্য এবং তাঁহার সঙ্গিগণ", "মধ্য যুগের বৈষ্ণব সাহিত্য" "বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়" প্রভৃতি পুস্তকে পুনরায় বৈষ্ণব প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। গ্রন্থকার যদিও স্বয়ং বৈষ্ণব নহেন, তথাপি তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রগাঢ় রূপ অনুরাগ-পরায়ণ এবং এই বিষয়ে লিখিতে যাইয়া প্রচুর সহানুভূতি ও উচ্ছাসিত কবিত্ব শক্তি দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক ঐতিহাসিক বুদ্ধি তাঁহার লেখনীকে সর্ব্বদা সংযত রাখিয়াছে। মিঃ সেনের পুস্তক গুলি পাইয়া আমরা চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব ধর্ম্মের এরূপ সমৃদ্ধ উপকরণ পাইয়াছি, যাহা তৎপূর্ব্বে অনধিগম্য ছিল।" ডাঃ সিলভান লেভি আমার "চৈতন্য এবং তদীয় যুগের ইতিহাস" পুস্তকের ভূমিকায় এই অযোগ্য লেখকের নানারূপ প্রসংসা করিয়াও চৈতন্যের প্রতি অনুরাগের জন্য আমাকে "ধর্ম্মোন্মাদ" (Fanatic) আখ্যা প্রদান করিয়াছেন এবং অতি বৃদ্ধ ঐতিহাসিক বেভারিজ সাহেব "রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জারন্যালে" আমার ইংরেজীতে লিখিত বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের সম্বন্ধে অনেক ভাল কথা বলিয়া চৈতন্যের প্রতি অনুরাগের জন্য আমার প্রতি বিদ্রূপোক্তি বর্ষন করিয়াছেন। এদিকে খাস বাঙ্গলা দেশে আমি বৈষ্ণব ধর্ম্ম মাটি করিয়াছি, এই রব উঠিয়াছে!

গোবিন্দ কর্ম্মকারের বিস্তৃত পরিচয়

আমরা করচা হইতে জানিতে পারিয়াছি উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত কাঞ্চন নগরে (বর্দ্ধমান) গোবিন্দ কর্ম্মকার জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্যামা দাস কর্ম্মকার এবং মাতার নাম মাধবী। তাঁহার স্ত্রী শশিমুখী একদিন তাহাকে 'নির্গুণ' ও 'মূর্খ' বলিয়া গালাগালি দেয়। (১ পৃঃ)। তিনি সেই অপমানে ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে (১৪৩০ শক) গৃহত্যাগী হন।

এই সময়ে চৈতন্যদেব ভগবানের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছিলেন। গোবিন্দ কর্ম্মকার কাটোয়ায় যাইয়া এই কথা শুনিতে পাইয়া নবদ্বীপাভিমুখে রওনা হন।

নবদ্বীপে তিনি চৈতন্যদেবকে সহচর মণ্ডলী পরিবৃত হইয়া জলে অবগাহন করিতে দেখিতে পান। একজন জেলে তাহাকে সেই সকল সহচরদের পরিচয় দিয়া দেয়। প্রভুকে দেখা মাত্র গোবিন্দ তাহার পাদপদ্মে নিজের হৃদয় বিকাইয়া ফেলিলেন, তিনি চৈতন্যের মূর্ত্তি দেখা মাত্র মুগ্ধ হইলেন,—"কটিতে গামছা বাঁধা অপূর্ব্ব দর্শন। সঙ্গে এক অবধূত প্রসন্ন বদন। * * ঘাটে বসি এই লীলা হেরিনু নয়নে। কি জানি কেমন ভাব উপজিল মনে॥ কদম্ব কুসুম সম অঙ্গে কাঁটা দিল। থরথরি সব অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল॥ ঘামিয়া উঠিল অঙ্গ তিতিল বসন। ইচ্ছা অশ্রু জলে মুই পাখালি চরণ।" (৩ পৃঃ)

১৫০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে সম্ভবতঃ চৈতন্য প্রভুর তিরোধান পর্য্যন্ত গোবিন্দ তাঁহার অনুগামী ছিলেন। যখন চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিয়া বর্দ্ধমানের পথে কাটোয়ায় যাত্রা

করিয়া ছিলেন তখন শশিমুখী একবার গোবিন্দকে পাকড়াও করিয়াছিল। যদিও মহাপ্রভু শশিমুখীকে নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তথাপি তাহার কান্না কাটিতে আর্দ্র হইয়া তিনি শেষে গোবিন্দকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন। কিন্তু চৈতন্যদেব প্রস্থান করিলে গোবিন্দ সে আদেশ লঙ্ঘন পূর্ব্বক আত্মীয়গণের অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করিয়া ছুটিতে ছুটিতে প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করেন। আমাদের মনে হয় আবার পাছে শশিমুখীর পাল্লায় পড়েন এবং মহাপ্রভু তাহাকে গৃহে ফিরিতে বাধ্য করেন, এই ভয়ে তিনি করচাখানি সম্পূর্ণ রূপে গোপন করিয়াছিলেন ("করচা করিয়া রাখি অতি সঙ্গোপণে," (৬২ পৃঃ) অর্থাৎ করচা তিনি কাহাকেও দেখিতে দেন নাই।

এখন করচায় পাওয়া যাইতেছে যে চৈতন্যদেব পুরীতে ফিরিয়া একখানি পত্রসহ গোবিন্দকে শান্তিপুর যাইতে আদেশ করেন। কিন্তু তাহার একান্ত ভক্ত অনুচরটি কয়েকটি দিনের বিরহ ভাবিয়া কাঁন্দিয়া আকুল হইয়াছিলেন ("এই বাক্য শুনি মোর চক্ষে বারি বহে। প্রভুর বিরহ বাণ প্রাণে নাহি সহে॥" ৮৬ পৃঃ) এই কান্নার আর একটি কারণ ছিল,—বঙ্গদেশে গেলে শশিমুখী পাছে তাঁহাকে ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা করে,—তিনিতো মহাপ্রভু-গত প্রাণ, তাঁহাকে ছাড়া তিনি 'কায়াছাড়া ছায়া'।

এইখানে করচা শেষ হইয়া গেল। ইহার পর করচায় আর কোন বিবরণ ছিল কিনা, তাহা বলা যায় না। কারণ পুথিখানি খণ্ডিতও হইতে পারে।

কিন্তু একথা নিশ্চয় যে অতঃপর যদি গোবিন্দের বজ্রাঘাতে হঠাৎ মৃত্যু না হইয়া থাকে, তবে তিনি মহাপ্রভুকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন নাই। যে ব্যক্তি দুদিনের বিরহ আশঙ্কায় আকুল হইয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর আদেশ লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্ত্রীর নিকট হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাইয়া ছায়ার মত তাঁহার অনুকরণ করিয়া জীবন ধন্য করিয়া ছিলেন, তিনি জীবিত থাকিলে কখন ও মহাপ্রকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন নাই।

অতঃপর তাঁহার সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

চৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী নামক প্রেমদাস রচিত একখানি প্রাচীন পুথি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় আছে, একথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। এই পুথিখানি মূলতঃ কবি কর্ণপুরের চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও কোন কোন আবান্তর কথা ইহাতে আছে। এই পুথির ১৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে মহাপ্রভুর দাক্ষিনাত্য হইতে প্রত্যাগমনের পর গোবিন্দ দাস নামক এক ব্যক্তি শ্রীখণ্ডে উপস্থিত হন। এই ব্যাক্তি যে শূদ্র তাহার আভাষ ও পুথিতে আছে * ইনি নিজের বিষয় অত্যন্ত গোপন করিয়া চলিতেছেন, এরূপ বুঝাযায়। তাহার

* "নরহরি দাস আদি যত ভক্তগণ।
তিঁহ আসি তা সভার বন্দিলা চরণ॥

বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন " আমার বাড়ী উত্তর রাঢ়ে। অবশ্য কাঞ্চন-নগর উত্তর রাঢ়েরই অন্তর্গত। ইনি নিজকে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে আপনাকে 'বৈদেশিক' বলিয়া জানাইয়াছেন। গোবিন্দদাস শ্রীখণ্ড হইতে শান্তিপুরে যাইয়া অদ্বৈতের সঙ্গে দেখা করেন এবং তৎপর শিবানন্দ সেনের সঙ্গে পুনরায় পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদীতে এই বিবরণটুকু আছে। ইহাঁকে প্রেমদাস "শ্রীগোবিন্দ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এখন করচা যেখানে শেষ হইয়াছে, তাহার পরে এই ঘটনা যোগ দিলে মনে হয় যেন গোবিন্দ দাস যে মহাপ্রভুকর্ত্তৃক শান্তিপুরে যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তৎপরবর্ত্তী খানিকটা বিবরণ পাওয়া গেল।

চৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্ট হয় শিবানন্দ সেন পুরীতে আসিলে গোবিন্দ দাস নামক শূদ্র জাতীয় এক ব্যক্তি "আমি ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য" এই পরিচয় দিয়া মহাপ্রভুর সেবাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সেবকের মত ভক্ত ও অন্তরঙ্গ মহাপ্রভুর খুব কমই ছিল। ইনি বৈষ্ণব-ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ 'শ্রীগোবিন্দ'। এখানে গোবিন্দদাস যদি নিজ পরিচয় দিতেন, তবে শশিমুখী সংবাদ পাইলে তাঁহাকে না লইয়া যাইয়া ছাড়িত না। কিঞ্চিন্ন্যূন দুইবৎসর কাল গোবিন্দ চৈতন্যের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন, মহাপ্রভু যে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণে গিয়াছিলেন একথা শশিমুখী অবশ্য শুনিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। এমন অবস্থায় গোবিন্দদাসের আত্মগোপন করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। কোন কথা নাই, বার্ত্তা নাই, এই সময়ই হঠাৎ ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয়া গোবিন্দ নামধেয় শূদ্রজাতীয় একটি লোক মহাপ্রভুর এতটা অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িলেন, ইহা খুব আশ্চর্য্যের বিষয় বটে।

চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয়কে অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন এত ব্রাহ্মণ তাহার পরিচর্য্যার জন্য উদ্যত থাকিলেও তিনি শুধু ঈশ্বর পুরীর নাম শুনিয়াই শূদ্র ভৃত্যটিকে আদর দেখাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই আদরের সঙ্গে আমরা পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত। একথা আমরা জানিতে পারিয়াছি যে চৈতন্য কর্ত্তৃক শান্তিপুরে যাইতে আদিষ্ট হইয়া গোবিন্দ তথায় গিয়াছিলেন এবং শিবানন্দ সেনের সঙ্গি পুরী ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। পুরী আসিয়া যে মহাপ্রভু তাঁহার প্রাণ, মন, ধ্যানজ্ঞান,—তাঁহাকে ছাড়িয়া তিনি কখনই থাকিতে পারেন নাই; এবং ঠিক সেই সময় যখন দেখিতেছি, ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয়া এক গোবিন্দদাস (শূদ্র জাতীয়) প্রভুর পরিচর্য্যায় লাগিয়া গেলেন, তখন আমাদের সহজেই এই ধারণা হয় যে কাঞ্চন-নগরের গোবিন্দ দাস ভিন্ন মহাপ্রভুর এমন অন্তরঙ্গ ভৃত্য আর কেহই ছিল না, এবং দুই গোবিন্দই এক ব্যক্তি, নিতান্ত বাধ্য হইয়াই এই ভাবে তাঁহার নিজকে ঢাকা দিতে হইয়াছিল।

নরহরি তাহারে করিঞা আলিঙ্গন।
জিজ্ঞাসিল কোথা বাটী কি কার্য্যে গমন।
গোবিন্দ বলেন ঘর উত্তর রাঢ়েতে।"

পুরীতেই মহাপ্রভুর বিবরণে জানা যায় তাঁহার লীলাবসান পর্য্যন্ত গোবিন্দ তাহার পরিচর্য্যায় রত ছিলেন। আমাদের অনুমান যদি ঠিক হয় তবে ১৫০৮ হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ২৫ বৎসর গোবিন্দ মহাপ্রভুর পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘকালের সঙ্গী, যাঁহাকে বৈষ্ণবেরা শ্রীগোবিন্দ নামে অভিহিত করিয়া সম্মান দেখাইয়াছেন, তাঁহার বাড়ী কোথায়,—তিনি বঙ্গদেশী একথা ঠিক,—কিন্তু তাঁহার আর কোন পরিচয়ই কেহ দেন নাই, ইহা ও বড় আশ্চর্য্যের কথা। অপরাপর সঙ্গিগণেরও ত সকলের পরিচয়ই বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। এতবড় ভক্ত অনুচর—বিশেষ বাঙ্গালী প্রেমিকের কোন—ঠিকানা বৈষ্ণব সাহিত্যে নাই। একথা দ্বারা কি ইহা অনুমিত হয় না যে, যে গোবিন্দ স্বীয় করচা 'অতি সঙ্গোপনে' (৬২ পৃঃ) রাখিয়াছিলেন, যিনি কাঞ্চন নগরের মায়া পাশ ছিন্ন করিয়া মহাপ্রভুর পদসেবার অধিকারী হওয়া অপেক্ষা আর কোন উচ্চ উদ্দেশ্য পোষণ করেন নাই—এবং যিনি, চৈতন্য-চন্দ্রোদয় কৌমুদী সম্বন্ধে আমাদের মত ঠিক হইলে, কাঞ্চননগরের নাম লুকাইয়া "উত্তররাঢ়বাসী বৈদেশিক" বলিয়া নিজকে পরিচিত করিয়া ছিলেন,—সেই গোবিন্দের এই ছদ্মবেশ ইচ্ছাকৃত, তিনি করচার ন্যায় নিজের পরিচয় ও সম্পূর্ণরূপে সঙ্গোপন করিয়াছিলেন।

শ্রীগোবিন্দের পরিচর্য্যা ও গোবিন্দ দাসের দাক্ষিণাত্যের মহাপ্রভুর পরিচর্য্যা এই দুই পরিচর্য্যার ভাব মিলাইয়া পড়ুন, তাহা হইলে দুই যে এক ব্যক্তি সে বিশ্বাস দূরীভূত হইবে। আহার্য্য বস্তুর সন্ধান রাখা করচার গোবিন্দদাসের একটা প্রধান প্রচেষ্টার বিষয়। পুরীতে শ্রীগোবিন্দেরও তাহাই। চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য ১৪ পঃ, ২০,—মধ্য ১২ পঃ ১০১,—মধ্য ১২ পঃ ৮৫,—অন্ত্য ৭পঃ, ৬৫,—অন্ত্য ১০ পঃ, ৩০-৩৩,—এই সকল শ্লোকের সঙ্গে করচার "পাইব * * মোচার ঘণ্ট দিয়া।" (৪ পৃঃ,) "কত ফলমূল * * সুরস।" (৪ পৃঃ), "শাক সূপ.........হইল" (১৪ পৃঃ), "ভোগ দিয়া.........বয়ান" (১৪ পৃঃ), "প্রসাদ—"নিম্বমুক্তা.........রাজা" (১৫ পৃঃ),—"চিনাচুর খুরমার লাড়ু... .....বাক্" (২০ পৃঃ) প্রভৃতি পদ মিলাইয়া পড়ুন।

করচায় কোন কোন বৃত্তান্ত বাদ পড়িয়াছে। এই এক অভিযোগ। সে সময়ে বিজয়নগরের সঙ্গে মুসলমানদিগের সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ হওয়ার দরুণ পথঘাট নিরাপদ ছিল না। এইজন্য হয়তঃ সকল তীর্থেই ইহাঁরা যাইতে পারেন নাই, তদ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না, যে করচায় ভুল রহিয়া গিয়াছে, সুতরাং উহা অপ্রামাণ্য।

প্রায়ই প্রাচীন পুথিতে লিপিকারের প্রমাদ ঘটিয়া থাকে, তাহা ছাড়া পাঠ উদ্ধার করাও অনেক সময়ে সুকঠিন। বিশেষ, নাম-শব্দের প্রায়শই অনেক বিড়ম্বনা হয়। সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলের শেষ পৃষ্ঠায় "সাফেরিও" রূপ অদ্ভুত শব্দটি আছে। এই শব্দটির অর্থ করিতে যাইয়া একদা কয়েকটি বড় বড় মাথা ঘামিয়া গিয়াছিল। তখন এই ভূমিকা-লেখক তাহার একটা অর্থ করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। 'সাফেরিও' আর কিছুই নহে,—উহা "শাকে ঋতু" শব্দের বিকৃতি এবং লিপিকরের একটি

হাস্যাস্পদ প্রমাদ। ভৌগোলিক শব্দ, নামবাচক শব্দ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুমান চলে না, সুতরাং তাহাতে লিপিপ্রমাদ বেশী হইয়া থাকে, সুতরাং যদি কোন ভুল বাহির হয় তাহার সকলগুলিই গ্রন্থকারের কাঁধে চাপাইয়া দেওয়া ঠিক নহে।

স্বর্গীয় জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় অনেক স্থানে পাঠোদ্ধার করিতে না পারিয়া নিজে শব্দ যোজনা করিয়াছেন, কোন কোন জায়গায় কীটদষ্ট ছত্রটি বুঝিতে না পারিয়া সেই ছত্র নিজে পূরণ করিয়া দিয়াছেন, একথা তিনি নিজে আমাকে বলিয়াছিলেন এবং তাহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র বনোয়ারীলাল গোস্বামী ও মধ্যমপুত্র মোহনলাল গোস্বামী মহাশয় দ্বয়ও জানাইয়াছেন। করচা প্রকাশ করার সময় বনোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয় ৪০ বৎসর বয়স্ক ছিলেন এবং তিনি তাঁহার পিতার সহায়তা করিয়াছিলেন। যে সকল স্থানে ঐরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহার যতটা মনে আছে ততটা তিনি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে; তদনুসারে বর্ত্তমান সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এইরূপ পরিবর্ত্তন সেকালের সমস্ত পুস্তকেই হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী ও পদকল্পতরু প্রভৃতি পুস্তকে এইরূপ পরিবর্ত্তনের অবধি নাই চরিতামৃত বৈষ্ণবদিগের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহার পাঠ খুব সতর্কতার সহিত রক্ষিত হইয়াছে। এজন্য ইহাতে পরিবর্ত্তন কম দেখা যায়। তাহা সত্ত্বেও পাঠান্তর বিস্তর আছে। সেকালের সমস্ত পুস্তকেই যখন ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তখন সেই পাপে কেবল করচাকেই বা কেন অপরাধী করা যাইবে? যাঁহারা হস্তলিখিত পুথির কোন খবর রাখেন, তাহারা জানেন একই গ্রন্থের ১০০ শত বৎসরের প্রাচীন পুথি ও ২০০ শত বৎসরের প্রাচীন পুথির মধ্যে বিস্তর পাঠান্তর ও বর্ণনা-বৈষম্য আছে।

সর্ব্বশেষে আমার একটি নিবেদন এই ভূমিকায় বাধ্য হইয়া চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রভৃতি মহাগ্রন্থগুলিকে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির বিচারাধীন করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের তুলাদণ্ডে ধরিলে পূর্ব্বোক্ত পুস্তকগুলির বিবরণ সর্ব্বত্র শ্রদ্ধেয় নহে। এই পুস্তকগুলি দেবলীলা বর্ণনায় ভরপূর। ইহাতে নরলীলার কথার প্রতি ততদূর ঝোঁক নাই। চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপন্ন করাই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই জন্য লৌকিক ইতিহাস হিসাবে আমি ইহাদের মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছি।

কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত বঙ্গভাষার অতি গৌরবের জিনিষ। এই দুই মহাগ্রন্থ ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যের দুইটি কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইহারা বহুগুণান্বিত। যেমন নিবিড় জঙ্গল, শুষ্ক পত্র ও ভগ্ন প্রস্তর সম্বলিত হইয়াও কোন গিরিশৃঙ্গ স্বীয় আকাশস্পর্শী মহিমা বিস্তার করিয়া থাকে, এই দুই মহাগ্রন্থও কতকগুলি ঐতিহাসিক ক্রটী সত্ত্বেও তেমনি বঙ্গদেশের জাতীয় ধর্ম্মবিজ্ঞানের মহিমা আলোকে উজ্জ্বল হইয়া আছে। স্বর্গীয় হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় চৈতন্যচরিতামৃত সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন "যেদিন এই মহাগ্রন্থ পাঠ না করি, সেই দিনই বিপদ।" অনেক বৈষ্ণবের হৃদয়ই এই কথায় সাড়া দিবে।

এই দুই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্যও সামান্য নহে। সুতরাং আমার লেখায় যদি ইহাঁদের সম্বন্ধে কোন আলোচনা থাকে, তবে ঐতিহ্য সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য তাহা আমাকে বাধ্য হইয়া করিতে হইয়াছে,—ভক্ত-হৃদয়ে আঘাত দেওয়ার জন্য নহে। যদি অনবধান বশতঃ সেরূপ করিয়া থাকি, তাঁহাদিগের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। কিন্তু যাঁহারা গোবিন্দ দাসের ন্যায় মহাভক্তের প্রতি কথায় কথায় বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন, তাহাদের কি কোন অনুতাপের কারণ নাই? বৈষ্ণবের নিকট বৈষ্ণব-নিন্দার অপরাধ অতি গুরুতর। এ সম্বন্ধে গোঁড়া বৈষ্ণব অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়ের নিরপেক্ষ মন্তব্যটি উল্লেখ করিব। গোবিন্দ দাসের নিন্দাকারী বৈষ্ণব ভক্তকে উল্লেখ করিয়া তিনি বিনয় সহকারে বলিতেছেন, "এরূপ করা একজন ভক্তের পক্ষে অতি সাহসের কাজ কিনা তাহাতে পার্ষদ ভক্তকে অগ্রাহ্য করা হইতেছে কিনা—সে কথা বিবেচ্য।"

করচায় দেখা যায় গোবিন্দদাস প্রভুর অজ্ঞানাবস্থায় যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। তিনি জানিতেন, লোক শিক্ষার জন্য সজ্ঞানে মহাপ্রভু স্ত্রীলোকদের সংসর্গ হইতে বিশেষ ভাবে আত্মরক্ষা করিতেন। কিন্তু মুরারিদের কাছে যাইয়া যদি হরিনামের মাদকতা আসিয়া প্রভুর জ্ঞান হরণ করিয়া লইয়া যায়, তিনি মহাপ্রভুকে সেই আশঙ্কায় তথায় যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন "মুহি বলি সে স্থানেতে গিয়া কাজ নাই। না শুনিল মোর কথা চৈতন্য গোসাই॥" (৫৫ পৃঃ) চৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়, দেবদাসীর মুখে জয়দেবের গান শুনিয়া যখন প্রভু উন্মত্তাবস্থায় তাহাকে আলিঙ্গন দিতে ছুটিয়াছিলেন, তখন এই সতর্ক ভৃত্যটি তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন (অন্ত্য ২৩ পঃ, ২৬)।

নানা দিক দিয়া করচার গোবিন্দদাস এবং পুরীর সুবিখ্যাত অনুচর শ্রীগোবিন্দকে এক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের উভয়ের সেবাবৃত্তি এক ধাঁজের, তাঁহারা উভয়ই শূদ্র। করচার গোবিন্দ প্রভুকে ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠে যাইয়াও সুখী হইতে পারিতেন না। তিনি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই চৈতন্যদেবকে ছাড়িয়া আর কোথাও যান নাই। দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগমনের পর চৈতন্যদেব তাহাকে শান্তিপুর পাঠাইয়াছিলেন। এই অল্প সময়ের বিরহে গোবিন্দ কাঁদিয়া বিহ্বল হইয়াছিলেন। চৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদী পাঠে স্পষ্টই প্রতীত হয়, গোবিন্দ শ্রীখণ্ড ও শান্তিপুর ঘুরিয়া শিবানন্দ সেনের দলে প্রবেশপূর্ব্বক পুরীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তারপর কবিকর্ণপুর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ হঠাৎ জানাইলেন, ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দিয়া এক শূদ্র গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আসিয়া তাহার জীবনাবধি অন্তরঙ্গ সহচর হইয়া রহিলেন। যদিও ২৫ বৎসর কাল গোবিন্দ তাহার সেবা করিয়াছিলেন, তথাপি তাহার বাড়ী ঘর প্রভৃতির কোন বিষয়ের ঠিকানা কোন বৈষ্ণব লেখকই দেন নাই (অবশ্য বহু পুস্তকে তাহার প্রতি সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে)। এদিকে দেখিতে পাই, করচার গোবিন্দদাসের আত্মগোপন করিবার বিশেষ

প্রয়োজন ছিল, তাহা না করিলে খুব সম্ভব তাঁহাকে পুরীতে মহাপ্রভুর সাহচর্য্য হইতে কাঞ্চননগরে শশিমুখীর সঙ্গ লইয়া "পচা-গৃহস্থ" সাজিতে বাধ্য হইতে হইত। করচাতেও তাহার আত্মগোপনের ইঙ্গিত আছে। গোবিন্দ দাস পেটুক বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছিলেন, ইহা তাহার বৈষ্ণবোচিত সারল্য ও দৈন্যমাত্র। তবে খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের ভার যে তিনি লইয়া ছিলেন, তাহা করচা ও চরিতামৃত উভয় গ্রন্থেই স্পষ্টতঃ দেখা যায়; এবং এই দুই গ্রন্থেই এ সম্বন্ধে বিবরণ গুলির মধ্যে আশ্চর্য্য রকমের ঐক্য আছে। তাহার সেবাবৃত্তি ও মহাপ্রভুর প্রতি আন্তরিকতাও এক রকমের। উভয় গ্রন্থ পাঠে স্পষ্টই ধারণা হয়- যে গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামী হইয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতেন, সেই গোবিন্দই পুরী মন্দিরেও তাঁহার ছায়ার ন্যায় অনুগামী এবং খাদ্যসামগ্রীর ভাঁড়ার আগলাইতেন। যে গোবিন্দ মুরারিদের পল্লীতে যাইতে তাঁহাকে বারণ করিয়াছিলেন, সেই গোবিন্দই পুরীতে সেবাদাসীর স্পর্শ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং আমাদের দৃঢ় ধারণা যে এই দুই ব্যক্তিই এক। তাহা না হইলে তাঁহার এতাদৃশ অন্তরঙ্গ ভৃত্য দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া একবারে তাহার সঙ্গবিচ্যুত হইয়া গা ঢাকা দিলেন, একথা বিশ্বাস-যোগ্য নহে। অথচ ঠিক সেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে, যখন তাঁহার আত্মগোপন করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, তখনই গোবিন্দ নামক এক শূদ্র ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য এই পরিচয় দিয়া সহসা প্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িলেন,—এই রহস্যটি ভাল করিয়া পর্যালোচনা করিলে দুই ব্যক্তির একত্ব স্পষ্টরূপে ধরা পড়িবে। গোবিন্দ নিজের অপরিসীম দৈন্য ও সারল্যে নিজকে "পেটুকের শিরোমণি" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, স্বয়ং মহাপ্রভু নিজকে "অধম" ও "অস্পৃশ্য" বলিয়া কত স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন ("প্রভু কহে ভিক্ষা করি গৃহস্থের দ্বারে। নিতান্ত অস্পৃশ্য মুই ছুঁইওনা আমারে" ৫৫পৃঃ)। সাধুদের এই ভাবের উক্তির দুষ্টার্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া—নিতান্ত অন্যায়। গোবিন্দ মহাপ্রভুর প্রসাদ ছাড়া কিছু আহার করিতেন না—"প্রসাদ নহিলে মুই না করি ভক্ষণ" (৩০ পৃঃ) তার অর্থ মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বহু উপবাস করিয়াছিলেন। বগুলা বনে উভয়েই এইভাবে তিন দিন, তিন রাত্র উপবাস করিয়াছিলেন (২৯ পৃঃ)। কিন্তু এই উপবাসে গোবিন্দ কষ্টবোধ করিতেন না। "ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি লাগে প্রভুর কৃপায়। সেই লাগি পড়ি থাকি যথায় তথায়।" (৫০ পৃঃ) যিনি চৈতন্যদেবের মুখখানি দেখিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যাইতেন, তিনি কি পেটুক?

গোবিন্দ মহাপ্রভুর তিরোধান পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে ছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডে ১০ পঃ ২০।৩১ শ্লোকে দেখা যায় গোবিন্দ ও স্বরূপ মহাপ্রভুর শেষজীবনের উন্মাদবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন। তখন মহাপ্রভু সংসারে থাকিয়াও আর সংসারে ছিলেন না। তিনি রাধাকৃষ্ণ-লীলার অঙ্গীভূত হইয়া হৃদ্‌বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। বাহিরের আর কোন কথাই তাহার কাণে পৌঁছায় নাই। অন্ত্যখণ্ডে (১৭ পঃ ৫ শ্লোক)

দেখা যায় মহাপ্রভু জগন্নাথ-মন্দির হইতে রাত্রে কোথায় ছুটিয়া গিয়াছেন, গোবিন্দ পাগল হইয়া তাঁহাকে খুঁজিতেছেন।

মহাপ্রভুর তিরোধানের পর গোবিন্দ কোথায় গেলেন, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবে মহাপ্রভুতে তদ্গত প্রাণ এরূপ অন্তরঙ্গ ভৃত্য যে তাঁহার স্বর্গীয় সঙ্গচ্যুত হইয়া বেশী দিন জীবিত ছিলেন, তাহা মনে হয় না।

করচা সম্বন্ধে আর কয়েকটি কথা

আমরা গোবিন্দের করচাকে মহাপ্রভুর জীবনী সম্বন্ধে সর্ব্ব বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ মনে করিলেও আমাদেব কয়েকটি ধারণা পাঠকের অবগতির জন্য লিখিতেছি।

গোবিন্দদাস যে সর্ব্বদাই নির্ভুল একথা বলা যায় না। তিনি হয়ত প্রত্যহই করচা লিখিতে সুবিধা পান নাই, পথে কোন কোন সময় বহুদিন জঙ্গলে কাটাইতে হইয়াছে। অনেক সময় নানা অসুবিধার মধ্যে চলিয়াছেন, এ অবস্থায় হয়ত ১০।১৫ দিন পরে পরে করচা লেখা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। এই সময়ের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের স্মৃতি হয়ত মলিন হইয়া গিয়াছে এবং তজ্জন্য কিছু কিছু ভুল ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। করচার প্রথম দিক্‌টার তিনি কিছু নোট করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা শেষে পয়ারে পরিণত করেন। এজন্য প্রথম দিকটা খুব সংক্ষিপ্ত। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পথে প্রচুর অবকাশ পাইয়া একান্তে তিনি নোট করার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা অব্যবহিত পরেই পয়ার করিয়াছিলেন, এজন্য তৎসময়ের বৃত্তান্ত, খুব জীবন্ত ও হৃদয় গ্রাহী।

করচা সংক্ষিপ্ত, সুতরাং ইহাতে অনেক কথা বাদ পড়িতে পারে। মহাপ্রভু সে দেশে পর্য্যটন করিয়া তামিল ও তেলিগু শিখিয়াছিলেন ("কখন তামিল বুলি বলে গোরা রায়। কখন সংস্কৃত বলি লোকেরে বুঝায়॥—এই দেশে ভ্রমি দীর্ঘকাল। সকলের ভাষা বোঝে শচীর দুলাল।" ৬২ পৃঃ) সুতরাং গোবিন্দদাস মাঝে মাঝে প্রভুর নিকট হইতে কোন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া টুকিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু সকল কথা বুঝিতে পারেন নাই।

যাঁহারা ইতিহাসের কোন ধার ধারেন না, তাহাঁদের জন্য অচ্যুত বাবু একটা প্রমাণ দাঁড় করাইয়াছেন। সে প্রমাণ সকলের গ্রাহ্য নাও হইতে পারে, কিন্তু গোঁড়া বৈষ্ণবের নিকট তাহা অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ হইতেও গুরুতর বলিয়া গণ্য হইবে। অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন "এসব প্রমাণের উপর অতিরিক্ত আর একটি প্রমাণ আছে, তাহা আধ্যাত্মিক প্রমাণ। নাম বলিব না, আমরা অবগত আছি জনৈক উচ্চ শিক্ষিত গৌরানুগতভক্ত ধ্যানাবস্থায় এই গোবিন্দের করচার বর্ণিতরূপে কোন কোন স্থান ও লীলা প্রত্যক্ষ করেন, স্বপ্নে বা মোহের ঘোরে নহে—জাগ্রতে। এতদপেক্ষা এই গোবিন্দের করচার প্রামাণ্যতা

সম্বন্ধে আর অধিক কি বলা যাইতে পারে?" (শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৬০ পৃঃ)।

এই প্রমাণটি আমরা উল্লেখ করিতাম না। ইতিহাস এই সকল প্রমাণের জন্য স্থান রাখেন নাই। কিন্তু ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে গোঁড়া বৈষ্ণবের মধ্যেও করচাকে বিশেষরূপ শ্রদ্ধা করেন, এমন কি এই পুস্তক লইয়া ধ্যান-ধারণা করেন, এরূপ লোকেরই অভাব নাই। পণ্ডিত রসিক মোহন বিদ্যাভূষণের ছন্দানুবর্ত্তী যোগেন্দ্র মোহন ঘোষের এই চেষ্টা খুব বড় রকমের হইলেও তাহা অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ। এ যুগে দস্তখত সংগ্রহ করা ব্যাপারটা এমন সুলভ হইয়াছে যে তাহার বিশেষ মূল্য নাই। বিশেষ যাহারা বঙ্গভাষার কোন তত্ত্বই জানেন না, বাস্তব অপেক্ষা অলৌকিক লীলাই যাহারা বেশী বিশ্বাস করেন, যাঁহারা ইতিহাসের কোন খোঁজই রাখেন না—তাঁহাদের বড় তিলক ও ভাগবতী বিদ্যার নিদর্শন আমাদের কাছে অকিঞ্চিৎকর। বর্ত্তমান সময়ের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ এই করচার প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুইজনের নাম করিব—শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মনোমোহন চক্রবর্ত্তী। * বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে কেহ কেহ পণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু কেহই ইতিহাসের ধার ধারেন না।

প্রবাসী আপত্তি-কারক আর একটা যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন যে সে সময়ে কর্ম্মকারেরা একবারে নিরক্ষর ছিলেন। বহু পূর্ব্বে বৌদ্ধ যুগের থেরীদের মধ্যে আমরা কর্ম্মকারজাতীয় বিদুষী রমণীর নাম পাইয়াছি। কিন্তু গোবিন্দ দাসের কিছু পরে লিখিত খাস কাঞ্চন নগরে প্রাপ্ত এক খানি কবিকঙ্কণ চণ্ডী আমরা পাইয়াছি, তাহার শেষ পত্রে লিখিত আছে যে তথাকার রামজীবন কর্ম্মকার নামক জনৈক ব্যক্তি চণ্ডী প্রভৃতি কাব্যের পাঠক-বৃত্তি করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই পুথি খানি আপাততঃ আমার নিকট আছে। ইহা ৯ নম্বর চিন্তামণি দাসের লেনস্থ শ্রীযুক্ত হরষিত কেশরী রায় মহাশয় আমাকে দেখিতে দিয়াছেন।

করচার শেষ দুই ছত্র "প্রভুর বিরহ বাণ সহিব কেমনে। নিদারুণ কষ্ট আসি উপজিল মনে॥" শান্তিপুরে অদ্বৈতের নিকট চৈতন্যদেবের পত্র লইয়া যাইবার প্রাক্কালে গোবিন্দের মনের ভাব ঐরূপ লিখিত হইয়াছে।

এইখানেই বইয়ের শেষ কিংবা ইহার পরে আরও কিছু ছিল, তাহা জানা যায় না।

* মনোমোহন বাবুর করচাখানিকে প্রামাণ্যগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করাতে একান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া "জনৈক বিশিষ্ট বৈষ্ণব" ১৩৩১ সনের ৮ই কার্ত্তিক শুক্রবার তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখিয়াছেন, "এমন কি প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মহাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও উহাকেই (করচাকে) প্রামাণিক গ্রন্থ মনে করিয়া লইলেন।" হায়!!!

কেন করচা দীর্ঘকাল গুপ্ত ছিল ?

দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিবার অব্যবহিত পরেই যদি গোবিন্দের মৃত্যু হইত, তবে তাঁহার পরিত্যক্ত জিনিষপত্র খোঁজ করার সময় করচা ধরা পড়িয়া যাইত এবং এরূপ মূল্যবান ইতিহাসের তখনই প্রচার হইত।

যদি ফিরিয়া আসিয়া গোবিন্দ কাঞ্চননগরের গৃহে ফিরিতেন, তবে তাঁহার নিজকেও করচাকে গোপন করিবার আর কোনই কারণ থাকিত না। করচা তাহা হইলেও প্রসিদ্ধি লাভ করিত।

একমাত্র যে কারণে এই পুস্তক গুপ্ত থাকিবার কথা, তাহা আমরা লিখিয়াছি। তিনি চৈতন্যদেবের চির সঙ্গী হওয়ার লোভে করচা গোপন করিয়াছিলেন,—পাছে সেই সঙ্গচ্যুত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন, এই আশঙ্কায় তিনি নিজের পরিচয় একেবারে লুপ্ত করিয়া থাকিবেন।

মহাপ্রভুর জীবনের পরবর্ত্তী ঘটনা বর্ণনা করিবার কোন প্রয়োজন গোবিন্দ অনুভব করেন নাই। কারণ মহাপ্রভু পুরীতে ফিরিয়া বহু পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তি দ্বারা পরিবৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার জীবনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে উদ্যোগী ছিলেন। গোবিন্দের বাঙ্গলার সামান্যরূপ অক্ষর পরিচয় মাত্র ছিল। সুতরাং ইহাঁদিগের মধ্যে থাকিয়া তিনি লেখনী ধারণের স্পর্দ্ধা করেন নাই।

বিশেষ তিনি যদি ইহার পরও লিখিতে থাকিতেন, তবে চৈতন্যপ্রভুর পরিকরদের মধ্যে তাহার করচা ও পরিচয় ধরা পড়িয়া যাইত। যে সময় মহাপ্রভু বিরল-সঙ্গী, এবং বঙ্গদেশ হইতে বহুদূরে একাকী পর্য্যটন করিতেছিলেন, তখন গোবিন্দ দাস যে প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন, শেষে আর তাহা ছিল না।

সুতরাং আমার মনে হয় প্রকাশিত করচা খণ্ডিত নহে। হয়ত ঐ পর্য্যন্ত লিখিয়াই গোবিন্দ আর অগ্রসর হন নাই।

তবে তিনি তাঁহার করচায় যে ডুরী বাঁধিয়াছিলেন, তাহা কে কতকাল পর খুলিয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই।

আমাদের কৈফিয়ৎ।

আমার পুস্তক ও নিবন্ধমালার কেহ দোষ দেখাইলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিয়া থাকি। ঐতিহাসিক আলোচনায় ভ্রমপ্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। উত্তরোত্তর ভাষা ও সাহিত্যের শ্রী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন কালের ভুল সংস্কারগুলি সংশোধন করা বাঞ্ছনীয়। আমি ভুলগুলি আঁকড়াইয়া ধরিয়া নিজের জেদ বজায় রাখিব, এমন মতিচ্ছন্ন আমার হয় নাই। কিন্তু তথাপি এত ঢাক বাজাইয়া করচার ভুল ঘোষণা করা সত্ত্বেও আমি বুঝিতে

পারিলাম না যে করচা সম্বন্ধে আমার ধারণা ভ্রান্ত। ১৩৩২ সনের ১৩ই মাঘের পল্লীবাসী পত্রিকায় একজন লিখিয়াছেন "আমরা তাঁহার (দীনেশ বাবুর) দুই একটী ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, এই করচা সম্বন্ধে তিনিও নিঃসন্দেহ নন, তথাপি দারুণ prestige বা বৃথা অভিমান তাহাকে এমন পাইয়া বসিয়াছে যে তিনি কিছুতেই সত্য স্বীকার করিতে পারিতেছেন না।"

এই করচা সম্বন্ধে আলোচনায় মিথ্যা যে কত অবয়বে উপস্থিত হইতেছে, তাহা আর কি লিখিব? গোবিন্দ দাসের করচাখানি ৩০ বৎসর যাবত আমার অপরিহার্য্য সঙ্গী হইয়া আছে, ইহার প্রতি পত্রের উপর আমার শত শত অশ্রু বর্ষিত হইয়াছে। পদ্মফুল ফুটিলে যেরূপ সৌরভে দিক্ আমোদিত করে, করচা-প্রদত্ত মহাপ্রভুর কাহিনী তেমনি তাঁহার স্বর্গীয়-প্রেম ও লীলামাধুরীতে ভরপুর। এই বই যে দিন প্রথম পড়িয়াছিলাম, সেদিন আমার একটা স্মরণীয় দিন। সেদিন আমার কর্ণে যে দেবলীলার গীতি শ্রুত হইয়াছিল তাহার রেশ এখনও বাজিতেছে। করচা আমাকে চৈতন্যপ্রভুর যে স্বরূপ দেখাইয়াছে, অন্যত্র কোথাও তাহা পাই নাই। নানা জটিল অবতারবাদ স্থাপনের চেষ্টা ও কুহকের মধ্যে অন্যত্র মহাপ্রভুর জীবনের আভাস মাত্র পাওয়া যায়। কাদম্বিনী-পংক্তির মধ্যে ক্ষণস্ফুরিত বিদ্যুদ্দামের মত সেই আভাস পরক্ষণেই নানারূপ পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনের চেষ্টা ও অবতারবাদের কুজ্ঝটিকার মধ্যে বিলীন হইয়া পড়ে। কিন্তু করচার এই প্রেমের পাগলকে একবার দেখুন। ইনি যেন এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে স্বপ্রকাশ হইয়াছেন। এই পুস্তক আমার নিকট মহাপ্রভুর পাদপিঠের বেদী স্বরূপ। আমার এই পুস্তক সম্বন্ধে দ্বিধা আছে—একথা নিতান্ত মিথ্যা ও অশ্রদ্ধেয়।

আমি গোড়া বৈষ্ণব নহি; এমন কি বৈষ্ণবই নহি—আমি শাক্ত। আমি কর্ম্মকার নহি, কায়স্থ নহি, আমি বৈদ্য। এই কর্ম্মকার—কায়স্থ লইয়া দলাদলিতে আমার কোন স্বার্থ নাই। আমি প্রভুর অলৌকিকী লীলা বুঝিতে ব্যস্ত নহি, তাহার জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিতেছি মাত্র। সুতরাং কোন্ স্বার্থে আমি এই পুস্তক সম্বন্ধে ভ্রম ধারণা বজায় রাখিতে পণ করিয়া বসিব? অন্যান্য পুস্তকে তাঁহাকে অলৌকিক দৈবশক্তি আরোপ করিয়া সাজাইবার চেষ্টা আছে, কিন্তু এখানে তাঁহার খাটি চিত্র দেখিতে পাই। "কিমপি হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাং।" পদ্মকে কি সাজাইতে হয়? গোলাপকে কি সাজাইতে হয়? শতদলকে ভুজঙ্গ বেষ্টিত করিয়া দেখাইলে কি তাহার শোভা বৃদ্ধি পায়? প্রেমের অবতারের সংহারক-বেশ কি স্বতঃসিদ্ধ দোষ দুষ্ট নহে? আমার এই ভূমিকা পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন, কতটা প্রাণের ভালবাসা দিয়া আমি এই বই আস্বাদ করিয়াছি, ইহাতে জেদের কিছু পাইবেন কি?

আর কাঞ্চন নগরের কর্ম্মকারদিগের মধ্যে স্বর্গীয় জয়গোপাল গোস্বামীর কেহ শিষ্য নাই। পূর্ব্বকালে লোকে বই লিখিয়া কোন বড় লেখকের নামে চালাইতেন,

তাহাতে বই খানির প্রচার বেশী হইত। এই ভাবে অনেক শাস্ত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নামে প্রচারিত হইয়াছে। গোঁসাইজী কর্ম্মকারের নামে স্বরচিত-গ্রন্থ লিখিয়া পুস্তকখানির কি প্রতিপত্তি বেশী করিতেন এবং নিজের গৌরবেরই বা কি শ্রীবৃদ্ধি করিতেন! যখন অমৃতবাজার পত্রিকার মতিবাবুরা এই পুস্তকের পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণের ২২৭ পৃষ্ঠার মধ্যে ৫১ পৃষ্ঠা সন্দেহাত্মক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তখন স্বয়ং মতি বাবু লিখিয়াছিলেন "লেখক কি অভিপ্রায়ে এই অলৌকিক অংশটী লিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না।" (শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ৪১০ গৌরাঙ্গ, কার্ত্তিক মাস) বস্তুতঃ কায়স্থকে কর্ম্মকার' প্রতিপন্ন করিবার কোন উদ্দেশ্য গোস্বামী মহাশয়ের ছিল না। গোবিন্দ কর্ম্মকার নামক যে মহাপ্রভুর সহচর কেহ ছিল, তৎকালে তাহার ঘুর্ণাক্ষর ও তিনি কিংবা অপর কেহ জানিতেন না। তাহার পরে প্রাচীন চৈতন্য-মঙ্গলের পুথিতে গোবিন্দ কর্ম্মকারের নাম পাওয়াতে সেই আন্দোলনটি একবারে নিবিয়া গিয়াছিল।

যদি ও এই ভূমিকায় আমরা করচার প্রামাণিকতা দেখাইতে যাইয়া বিবিধ বাহিরের প্রমাণ দিয়াছি, তথাপি আমার নিকট ঐ সকল প্রমাণের কোনই দরকার নাই। যেরূপ অগ্নির সম্মুখীন হইলে চক্ষু বুজিয়া তাপ দ্বারাই অগ্নির অস্তিত্ব বুঝা যায়, এই পুস্তকের অপূর্ব্ব প্রেম-মাদকতাই আমার নিকট ইহার প্রামাণিকতার বড় সাক্ষী। মহাপ্রভুর প্রাণ-মাতান যে দেবচিত্র গোবিন্দ আঁকিয়াছেন, তাহাই তাঁহার প্রধান সাক্ষী। যে ভৌগলিক চিত্র তিনি দিয়াছেন তাহাই তাঁহার প্রধান সাক্ষী। এই পুস্তকের আলেখ্য সেই অলোক-সামান্য দ্যুলোকের বার্ত্তাবাহী প্রেম-দেবতার আলোক-চিত্র, উহা কেহ পাণ্ডিত্যের দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, বা স্বকপোলকল্পনা দ্বারা আঁকিতে পারিবেন না।

প্রতিবাদীরা অনেক মিথ্যার আশ্রয় করিয়াছেন, কিন্তু কাশীদাসের ভাষায় বলিব—
"কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে। কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে?"

চৈতন্য দেবের ধর্ম্ম বিশ্বাস।

একথাটি ঠিক চৈতন্যদেব শাক্তও নহেন, বৈষ্ণবও নহেন, তিনি গৃহীরও নহেন, সন্ন্যাসীরও নহেন—তিনি সকলেরই।

বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে যে ভাবে বুঝিয়াছেন, তাহাই যে ঠিক একথা বলা যায় না। তিনি নিজে কখনও অবতার বলিয়া নিজের পরিচয় দেন নাই, অশেষ দৈন্য সহকারে পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছেন, তিনি মানুষ। অজ্ঞানাবস্থায় তিনি কি কহিয়াছেন বা করিয়াছেন, তাহা লইয়া তাঁহার অবতারত্ব প্রতিপাদন জন্য কোন কোন লেখক যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমাদের কাছে অতিরঞ্জিত ও অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। সে ভাবের কথা করচায় একটিও নাই। বরং চৈতন্য ভাগবত যে লিখিয়াছেন যে তাঁহার সম্মুখে এমন কাহারও সাধ্য ছিল না

যে তাঁহাকে ভগবানের দাস ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া প্রশ্রয় পায় (চৈ, ভা, অন্ত্য ১০) সেই কথাই সত্য বলিয়া মনে হয়।

তিনি মাধ্বিসম্প্রদায়ের দীক্ষা গ্রহণ করিলেও স্বমতের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কোথায়ও গুরুর প্রতি অখণ্ড বিশ্বাস প্রচার করেন নাই। বরঞ্চ রাম রায় যদি তাঁহার জনৈক ভক্তাগ্রগণ্য হইয়া থাকেন, এবং তাঁহার মতকে যদি চৈতন্য দেবের মত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে মনে হয় তিনি গুরুবাদ মানিতেন না। রাম রায়ের প্রসিদ্ধ গানটিতে আছে—

"না খোজলুঁ দূতি না খোজলুঁ আন। দুঁই কার মিলনে মধত পাঁচ বান"

এই পদের অর্থ কি? ইহা কি স্পষ্ট ইঙ্গিত দ্বারা বুঝাইতেছে না যে ভক্ত ও ভগবান— ইঁহাদের মধ্যে গুরু বা তৃতীয় ব্যক্তি নাই। করচায় এই কথা আরও স্পষ্ট হইয়াছে।

"ঈশ্বরে বিশ্বাস আনিয়া মিলায়।"

এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ভগবান লোক-চিত্ত স্বয়ং আকর্ষন করেন, প্রতিনিধি দ্বারা করান না। তিনি নিজে কাহাকে ও শিষ্য করেন নাই।

কিন্তু পরবর্ত্তী কালে তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির অবতার মনে করিয়া পার্শ্বদগণের দ্বারা যে অবতার-ব্যূহের রচনা করা হইয়াছে, তাহা কি ঠিক? তাহা কি তাঁহার অনুমোদিত? প্রত্যেক পার্শ্বদ এমন কি পরবর্ত্তী ভক্ত ও ব্রজগোপীর ও কোন কোন দেবতার অবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। ইঁহারাই বৃন্দাবন-লীলার মালিক। ইঁহাদিগকে ডিঙ্গাইয়া কৃষ্ণ-প্রেম বুঝিবার কাহারও অধিকার নাই। এই অবতারগণ সম্বন্ধে "গৌরগণোদ্দেশ" প্রভৃতি বহু সংস্কৃত ও বাঙ্গলা পুস্তক লিখিত হইয়াছে। যে প্রেম-ধর্ম্মের উপর বিশ্বের সকলের অধিকার, তাহার ভাঁড়ারের চাবী হাতে রাখিয়াছেন এই গোপীর অবতারেরা ও তাঁহাদের বংশধরেরা। এ যুগে—চৈতন্য-লীলা নূতন করিয়া বুঝিতে হইবে। মোল্লা ও পৌরহিত্যের আধিপাত্যের যুগাবসান হইয়াছে। যত অলৌকিক লীলার কল্পনা —যত আবর্জ্জনা দূর করিয়া চৈতন্যপ্রভুর প্রতিপাদ্য ধর্ম্মকে নির্ম্মল করিয়া বুঝাইতে হইবে। অলৌকিক লীলা সত্য হইলেই বা কি? মহাপ্রভু অসীম দৈন্য ও অজস্র অশ্রু দ্বারা যে অপূর্ব্ব অদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহার কাছে এই সকল অলৌকিক লীলার কোন মূল্য নাই—উহা বাজে লোক ভুলাইবার উপায়—শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহা গ্রাহ্য করিবেন না। সুতরাং যাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মকে কতকগুলি শ্লোকের পাহারা দিয়া চোখে চোখে রাখিয়াছেন, তাঁহাদের সেই খবরদারীর কোন প্রয়োজন নাই। চৈতন্যের ধর্ম্ম তাঁহাদের কল্পিত সূত্র অপেক্ষা অনেক বড়। আমরা তিলক ও অঙ্গরাগে ভুলিব না, নামের পূর্ব্বে কতকগুলি শ্রী ও 'শ্রীল'র ছড়াছড়িতে ভয় পাইব না। তাঁহারা যদি আবর্জ্জনা দূর করিতে চেষ্টা করেন, আমরা ও অন্যদিক দিয়া আবর্জ্জনা দূর করিয়া সত্যকে উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা পাইব। এখন বৃথা পাণ্ডিত্য হইতে সরল মর্ম্ম কথা—আজগুবী গল্প ও অন্ধ সংস্কার হইতে বাস্তব ঘটনা,—পুরাণোক্ত দেবলীলা হইতে সর্ব্বজন গ্রাহ্য নরলীলা বেশী শ্রদ্ধা আকর্ষণ

করিয়া গরীয়ান হইবে, এবং এই ভাবে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আবর্জ্জনা দূর করার চেষ্টায় মধ্যযুগের পাণ্ডিত্যের মেরুমন্দার অপেক্ষাও করচার ন্যায় প্রবাহশীল স্বচ্ছ নির্ম্মল ইতিহাসের ধারার উপর বেশী নির্ভর করার দরকার হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে গোবিন্দ দাসের করচা সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা আমার নিজের মত, ইহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অপর কেহ দায়ী নহেন। তবে আমার বিশ্বাস যে এই ভূমিকা পড়িলে সুধীব্যক্তিরা আমার মতাবলম্বী হইবেন। অনেক উদারচেতা প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয়েরা ও স্বীয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের অসীম ভক্তি জ্ঞাপন করিতেছি। এই পুস্তক সম্পাদনে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। কিন্তু তজ্জন্য আমরা কপর্দক ও গ্রহণ করিব না। পুস্তকের ২৫০ শত কাপি বিনামূল্যে ও অবশিষ্ট শুধু ব্যয় মাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক বিতরিত হইবে।

৭ বিশ্বকোষ লেন,
বাগবাজার কলিকাতা
১৯ শে জুলাই ১৯২৬

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

বর্দ্ধমানে কাঞ্চননগরে * মোর ধাম।
শ্যামাদাস পিতৃ নাম গোবিন্দ মোর নাম॥
অস্ত্র হাতা বেড়ি গড়ি জাতিতে কামার।
মাধবী নামেতে হয় জননী আমার॥
আমার নারীর নাম শশিমুখী হয়।
একদিন ঝগড়া করি মোরে কটু কয়॥
নিগুর্ণে মূরখ বলি গালি দিলা মোরে॥
সেই অপমানে গৃহ ছাড়িলাম ভোরে॥
চৌদ্দশ ত্রিশ শাকে বাহিরেতে যাই।
অভিমানে গর গর ফিরে নাহি চাই॥

ক্রমে পহুছিনু আমি কাটোয়ার ধাম।
সেথা আসি শুনিলাম শ্রীচৈতন্যের নাম॥
সকলেই চৈতন্যেরে বাখানিয়া † বলে।
তাহা শুনি ছুটিলাম দর্শনের ছলে ‡॥
সবদিন চলিয়া আইনু মাঠে মাঠে।
প্রাতে গঙ্গা পার হৈয়া আইনু নদের ঘাটে॥
নদীয়ার নীচে গঙ্গা নাম মিশ্রঘাট।
আনন্দ বাড়িল হেরি নদীয়ার পাট॥ §

ডাহিনে বাগ্দেবী নদী * ... ...।
... ... ॥
শ্রীবাস অঙ্গন হয় ঘাটের উপরে।
প্রকাণ্ড এক দীঘী হয় তাহার নিয়ড়ে॥

---

* কাঞ্চন নগর (বর্দ্ধমান) উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত।

† বাখানিয়া=প্রশংসা করিয়া।

‡ ছলে=উদ্দেশ্যে।

§ পাট—প্রাচীন কালে পাট শব্দ রাজধানী (রাজ-পাট) বুঝাইত। এইজন্য পাট নাম পাইলে বুঝিতে হইবে তথায় কোন সময় সম্ভবতঃ রাজধানী ছিল। এই পাট শব্দের সঙ্গে পত্তন শব্দের ঐক্য আছে। জঙ্গল কাটিয়া কোন নগর পত্তন করা হইত। এইভাবে শব্দটির উদ্ভব হইয়াছে। পাটনা নাম এই পত্তনের অপভ্রংশ।

* বাগ্দেবীনদী ও প্রাচীন নবদ্বীপ সম্বন্ধে শান্তিপুর নিবাসী সুকবি মোজাম্মেল হক সাহেব আমাদিগকে এই বিবরণটী দিয়াছেন।

"বর্ত্তমান নবদ্বীপের অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে গঙ্গানদীর পূর্ব্বপারে এবং প্রাচীন নবদ্বীপের অর্থাৎ মেয়াপুর ও বামন পুকুরিয়া পল্লীদ্বয়ের দেড় মাইল দক্ষিণে খড়িয়া বা জলঙ্গী নদীর দক্ষিণ ধারে মহেশগঞ্জ গ্রাম আছে। মহেশগঞ্জের দক্ষিণ দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া একটি প্রাচীন জল-প্রবাহের খাত টেংরা, আমঘাটা, গঙ্গাবাস, উশিদপুর, ভালুকা, কুঁদপাড়া, শিঙ্গেডাঙ্গা, কুশী, টেয়াবালী, গোয়ালপাড়া, কুলে, হিজুলী, বাঁকীপুর প্রভৃতি গ্রামের পার্শ্ব দিয়া প্রায় ৫।৬ মাইল চলিয়া আসিয়া বার্গাচড়া গ্রামে বাগ্দেবীর খালের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ খাতটীর স্থানে স্থানে কালের গতিতে মাটী ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং ইহা স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন অলকার বিল, গোপেয়ার বিল এবং বাগ্দেবী খাল ইত্যাদি। বাগ্দেবী খাল বার্গাচড়া গ্রামের উত্তর দিয়া গঙ্গানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বর্ষাকালে গঙ্গার জল এই খালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। প্রাচীন কালে ইহা যে একই জলপ্রবাহে পরিণত ছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়া থাকে এবং ইহা যে বাগ্দেবী নদী নামেই খ্যাত ছিল তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থকার যখন বলিয়াছেন, "নদীয়ার নীচে গঙ্গা" "ডাহিনে বাগ্দেবী" তখন যে এই বাগ্দেবী নদী প্রাচীন নদীয়ার নিকট দিয়াই প্রবাহিত ছিল তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে।

বল্লাল রাজার বাড়ী তাহার নিকটে।
ভাঙ্গা চূর প্রমাণ আছয়ে তার বটে॥
ঘাটে বসি কত খানা ভাবিতেছি মনে।
হেন কালে শ্রীচৈতন্য আইলেন স্নানে॥
কটিতে গামছা বাঁধা আশ্চর্য্য গঠন।
সঙ্গে এক অবধৌত প্রফুল্ল বদন॥
তিন চারি সঙ্গী আরো নাচিতে নাচিতে।
স্নানে নামিলেন প্রভু গঙ্গার গর্ভেতে॥
অবধৌত বীর পাড় হৈতে ঝাঁপ দিলা।
সাঁতারিয়া জল কেলি করিতে লাগিলা॥
শ্রীবাস ঠাকুর পিছু পিছু দামোদর।
সিদ্ধ হরিদাস আর বামে গদাধর॥
অবশেষে আইলা তথি অদ্বৈত গোঁসাই।
এমন তেজস্বী মুহি কভু দেখি নাই॥
পক্ক কেশ পক্ক দাড়ী বড় মোহনিয়া।
দাড়ী পড়িয়াছে তাঁর হৃদয় ছাড়িয়া॥ *

তখন নদীয়া গঙ্গানদীর পূর্ব্ব উত্তর তীরে এবং পদ্মার শাখানদী জলঙ্গী বা খড়িয়ার পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল; তাহা হইলে বাগেদবী নদী—গঙ্গা বা পদ্মা ইহার কোন্‌টী হইতে বহির্গত হইয়াছিল, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদেরা স্থির হইয়া লইবেন। অধুনা মেয়াপুর গ্রামের মধ্যে একটী প্রাচীন জল-প্রবাহের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। ইহা খড়িয়া নদীর ব্যবধানে তফাৎ হইয়া পড়িলেও মহেশ গঞ্জের নীচের জল স্রোতের সহিত যে এককালে সংযুক্ত ছিল তাহা প্রতীত হইয়া থাকে। তাহা হইলে বাগেদবী নদী যে প্রাচীন নবদ্বীপের নিকট দিয়াই প্রবাহিত ছিল, তাহা কে না বলিবে?" শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী হরিপুরগ্রামে বহুদিন হইতে বাগেদবী দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন।

"প্রাচীন নবদ্বীপ—প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান ভূমি অতি বিশাল ছিল। মেয়াপুর, ভারুই ডাঙ্গা, সরডাঙ্গা, গাদীগাছা, সুবর্ণবিহার, মাজিদা, ভালুকা, কুলিয়া, সমুদ্রগড়, রাহুতপুর, বিদ্যানগর, মামগাছী, মহৎপুর, জান নগর, রুদ্র ডাঙ্গা, শরপুর, পূর্ব্বস্থলী প্রভৃতি গ্রাম ইহার অন্তর্গত ছিল। এখনও ঐ সকল গ্রাম বিদ্যমান আছে, কিন্তু নবদ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যে স্থলে বর্ত্তমান নবদ্বীপ অবস্থিত, তাহা প্রাচীন নবদ্বীপের উপকণ্ঠ-পল্লী, খাস নবদ্বীপ হইতে অনেক দূর। উহা তখন কুলিয়া নামে পরিচিত ছিল। মেয়াপুর (মায়াপুর) এবং তৎসংলগ্ন পল্লীই প্রাচীন নবদ্বীপের শেষ চিহ্ন। এই ভূমিতেই রাজা বল্লালসেনের রাজপ্রাসাদ ছিল। এবং সেই রাজপ্রাসাদে হইতেই বল্লাল সেন বীর বক্তিয়ার খিলজীর আক্রমণে পলায়ন করিয়াছিলেন, এবং এই ভূমিতেই চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের এই উক্তি যে সর্ব্বাংশে সত্য তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কেননা এখনও এই ভূমিতে রাজা বল্লালসেনের স্মৃতির পরিচায়ক বল্লাল দীঘি, এবং রাজপ্রাসাদ গঙ্গা গর্ভসাৎ হইলেও "বল্লাল ঢিবী" নামে একটী উচ্চস্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে বামন পুখুরিয়ার প্রসিদ্ধ জমাদার খান সাহেব মোল্লা খোদাদাদ সাহেব উক্ত ঢিবী খনন করিয়া কয়েক খানি জীর্ণ বারকোশ এবং গলিত স্খলিত সিন্দুক আবিষ্কার করেন। সিন্দুকের ভিতর হইতে কয়েকটী রূপার টাকা এবং গলিত স্খলিত শাল ও পশমী কাপড় পাওয়া গিয়াছিল। মেয়াপুরই চৈতন্য দেবের জন্ম-ভিটা ও বাস ভূমি। যে কাজীর সহিত তাঁহার মতান্তর ঘটে, তাঁহারও কবর আজ পর্য্যন্ত মেয়াপুরের উত্তর পূর্ব্ব দিকে মোল্লা সাহেবের বাড়ীর নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে। কবরের পাশে একটী বৃহৎ কাঠ-মল্লিকা ফুলের গাছ আছে। শুনিতে পাই, অনেক হিন্দু কবরে ফুল সিন্নি দিয়া সেলাম করে। ইহার নাম চাঁদ কাজী। ইহা অপেক্ষা প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান-ভূমির নিদর্শন আর কি হইতে পারে? অনুসন্ধান সমিতির উৎসাহশীল ব্যক্তিগণ যদি ঐ স্থানে গিয়া ভূমি খননাদি করেন, তাহা হইলে প্রাচীন নবদ্বীপের আরও অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।"

* বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, ১ম ভাগ ৭৫৭ পৃষ্ঠার প্রাচীন চিত্র দ্রষ্টব্য।

"প্রবল লোম বক্ষসম" গৌর-পদ তরঙ্গিণী, ৪৪১পৃঃ।

হরিধ্বনি সহ বুড়া করয়ে চীৎকার।
অবধৌত সাঁতারিয়া করে পারা বার ॥ *
একে একে গঙ্গা গর্ভে সবে ঝাঁপ দিলা।
সন্তরিয়া সবে নানা কেলি আরম্ভিলা ॥

আশ্চর্য্য প্রভুর রূপ হেরিতে লাগিনু।
রূপের ছটায় মুহি মোহিত হইনু ॥
স্নান করি গোরা চাঁদ উঠিলা ডাঙ্গায়।
কুটিল কুন্তল রাশি পৃষ্ঠেতে লোটায় ॥
শুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় অঙ্গের বরণ।
নীলপদ্ম দল সম সুদীর্ঘ নয়ন ॥
সুন্দর কপোল যুগ প্রশস্ত ললাট।
সহজে চলিলে দেখায় নাটুয়ার নাট ॥ †
রাম রম্ভা জিনি শোভে মনোহর উরু।
তুলি দিয়ে আঁকা যেন দুটী চারু ভুরু ॥
আলতা রঞ্জিত যেন যুগল চরণ।
নিরখিলে মুগ্ধ হয় মুনির নয়ন ॥
প্রেমময় তনুখানি মুখে হরিবোল।
যারে পান দয়া ক'রে তারে দেন কোল ॥
হরি বলি অশ্রু পাত করে মোর গোরা।
পিচকারী ধারা সম বহে অশ্রু ধারা ॥
চলিতে লাগিলা তবে মোর গোরা রায়।
অবধৌত নিত্যানন্দ পিছু পিছু ধায় ॥
একই জেলের মুখে পরিচয় পাইয়া।
একে একে সকলেরে লইনু চিনিয়া ॥
এইরূপে জলকেলি পেখিয়া নয়নে।
ভাবসিন্ধু উছলি উঠিলা মোর মনে ॥
লোকে বলে শচীগৃহে ঈশ্বর আইলা।
তাই দরশনে চিত্ত আকুল হইলা ॥
গৃহবিচ্ছেদের ছলা হৈল ভাগ্য ক্রমে।
তাই আইলাম শীঘ্র নবদ্বীপ ধামে ॥

ঘাটে বসি এই লীলা হেরিনু নয়নে।
কি জানি কেমন ভাব উপজিল মনে ॥
কদম্বকুসুম সম অঙ্গে কাঁটা দিল।
থর থরি সব অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল ॥
ঘামিয়া উঠিল দেহ তিতল বসন।
ইচ্ছা অশ্রুজলে মুহি পাখালি চরণ ॥
চাচর চিকুর পৃষ্ঠে হসিত বদন।
আসিতে লাগিলা প্রভু সঙ্গে করি গণ ॥
মোর ভাগ্য ক্রমে প্রভু হেরিয়া আমারে।
আড়ে আড়ে চাহিতে লাগিলা বারে বারে ॥
তার পর গুড়ি গুড়ি আইলা যখন।
চরণ ধরিয়া ভূমে পড়িনু তখন ॥
চরণের তলে মুহি গড়া গড়ি যাই।
হাত ধরি বসাইলা দয়াল নিমাই ॥

জোড় হাতে মুহি কাঁদি সম্মুখে বসিয়া।
দুই চারি বাত পুছে হাসিয়া হাসিয়া ॥
হাসিতে অমিয় ধারা পড়ে অবিরত।
অঙ্গের সৌরভে চিত্ত হইলা মোহিত ॥
হরিনামে সদা মত্ত অতি ক্ষীণ কায়।
পদতলে কত ভক্ত গড়াগড়ি যায় ॥
সে যে কিবা ভাব তাহা বলিব কেমনে।
কোটি কোটি দেব আসি লুঠায় চরণে ॥
যত্তপি দাওয়ায় প্রভু অন্ধকার ঘরে।
শরীরের আভায় আঁধার নাশ করে ॥
অমৃত ধারায় বুঝি চাঁদেরে ছানিয়া।
কোন্ বিধি নিরজনে গড়েছে বসিয়া ॥
যেই জন এইরূপ নিরখে নয়নে।
বিষয়বৈরাগ্য ঘোরে তাহার পেছনে ॥

হাসি হাসি মোর সনে করি আলাপন।
নাম জিজ্ঞাসিলা প্রভু করিয়া যতন ॥
প্রভু বলে কোন জাতি কিবা তব নাম।
কিসের ব্যবসা কর কোথা তব ধাম ॥

---

* পারাবার—এপার ওপার হওয়া।
† নাট—নৃত্য।

শুনিয়া প্রভুর বাণী হাত জোড় করি।
কহিতে লাগিনু কথা আপনা পাশরি॥
এত কৃপা কেন মোরে অহে দয়াময়।
অধমের নামটি গোবিন্দ দাস হয়॥
ছিলাম গৃহস্থ গৃহে নানা কর্ম্ম করি।
এবে কিন্তু হইয়াছি পথের ভিকারী॥
বিষয় ছাড়িয়া এনু প্রভুদরশনে।
এবে স্থান দেহ প্রভু ও রাঙ্গা চরণে॥
বর্দ্ধমান কাঞ্চননগরে মোর ধাম।
শ্যামাদাস কর্ম্মকার জনকের নাম॥
এই বাত শুনি প্রভু বলিলা আমারে।
থাকরে গোবিন্দ তুমি আমার আগারে॥
আমার গৃহেতে তব হইবে পালন।
প্রত্যহ করিবে সুখে নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
প্রতিদিন সুখে পাবে কৃষ্ণের প্রসাদ।
একেবারে পূরিবে মনের সব সাধ॥
সেবার কর্ম্মেতে তুমি নিয়ত থাকিবা।
গঙ্গাজল তুলসী আনিয়া যোগাইবা॥
প্রসাদ পাইবা নিত্য উদর পূরিয়া।
রসা শাক সুকুতা মোচার ঘণ্ট দিয়া॥
এত বলি সঙ্গে প্রভু চাহে লইবারে।
অমনি চলিনু মুহি প্রভুর সংসারে॥

গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর।
পাঁচ খানি বড় ঘর দেখিতে সুন্দর॥
নগরের দক্ষিণ সীমায় প্রভুর বাস।
হরিনামে মত্ত প্রভু সদাই উল্লাস॥
প্রকাণ্ড এক দীঘী হয় নিয়ড়ে তাহার।
কেহ কেহ বলে যারে বল্লাল সাগর॥

যে সকল ভক্ত সদা থাকে প্রভুর কাছে।
একে একে সকলের নাম কব পাছে॥
অদ্বৈত আচার্য্য আর স্বরূপ শ্রীবাস।
আচার্য্যের দুই পুত্র অচ্যুত কৃষ্ণদাস॥
মুকুন্দ মুরারিগুপ্ত আর গদাধর।
নরহরি বিদ্যানিধি শেখর শ্রীধর॥
অন্তরঙ্গ ভক্ত আরো দুই চারি জন।
যাহাদের সঙ্গে হয় গোপনে ভজন॥ *
অবধৌত নিত্যানন্দ পাগলের মত।
গড়াগড়ি দিয়া অশ্রু ফেলে অবিরত॥
শান্তমূর্ত্তি শচী দেবী অতি খর্ব্ব কায়।
নিমাই নিমাই বলি সদা ফুকরায়॥
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হন প্রভুর ঘরণী।
প্রভুর সেবায় ব্যস্ত দিবস রজনী॥
লজ্জাবতী বিনয়িনী মৃদু মৃদু ভাষ।
মুহি হইলাম গিয়া চরণের দাস॥

এইরূপে শচীগৃহে দাস হয়ে থাকি।
না বলিতে সব কর্ম্ম সমাপিয়া রাখি॥
ভোজনেতে পটু মুহি আনন্দেতে খাই।
করিয়া প্রভুর কার্য্য সঙ্গেতে বেড়াই॥
প্রতিদিন ভোগ হয় বিষ্ণুর মন্দিরে।
কত ফল মূল ছানা ননি সর ক্ষীরে॥
শাক সুপ দধি সুক্তা মোদক পায়স।
বড়া লাড্ডু মিষ্টকাদি খাইতে সুরস॥
প্রতিদিন শচীমাতা করেন রন্ধন।
আনন্দে করেন সবে প্রসাদ ভোজন॥
পেটুকের শিরোমণি মুই হই দাস।
দয়াল প্রভুর পত্রে খাই বার মাস॥
কি বলিব প্রসাদের নাহিক তুলনা।
অমৃত সমান হয় যার এক কণা॥
এইরূপে রহিলাম প্রভুর আগারে।
চৈতন্যের দাস বলি সবে কৃপা করে॥
আমার প্রভুর প্রভু চৈতন্য গোঁসাই।
যখন যেখানে যান সঙ্গে সঙ্গে যাই॥

---

* "অন্তরঙ্গ সঙ্গে করে রস আস্বাদন।
বহিরঙ্গ সঙ্গে করে নাম সঙ্কীর্ত্তন॥"

কৃষ্ণ অনুরাগে সদা আকুল হৃদয়।
শুনিলে কৃষ্ণের নাম অশ্রুধারা বয় ॥
যদি কেহ রাধে বলি উচ্চ শব্দ করে।
অমনি অশ্রুর ধারা ঝর ঝর ঝরে ॥
প্রাণকৃষ্ণ বলি যদি দৈব কেহ ডাকে।
ধাইয়া গিয়া আলিঙ্গন করেন তাহাকে ॥

এক দিন সন্ধ্যাকালে শ্রীবাসঅঙ্গনে।
বসিয়া আছেন প্রভু লয়ে ভক্তগণে ॥
এমন সময়ে মোর অবধৌত রায়।
পুনঃ পুনঃ যমুনা বলিয়া ফুকরায় ॥ *
এইত রাসের স্থলী যমুনার ঘাট।
কাঁহা শত শত গোপী কাঁহা সেই নাট ॥
নিতায়ের কথা শুনি প্রভু বেগভরে।
ধাইয়া গিয়া ঝাঁপ দিলা বল্লাল সাগরে ॥
রাগে † ডগমগ প্রভু দেয় সন্তরণ।
পাড়ে দাণ্ডাইয়া দেখে যত ভক্তগণ ॥

এইরূপে অনুরাগ বাড়ে দিন দিন।
প্রেমভরে হইতে লাগিলা তনু ক্ষীণ ॥
দয়াল চৈতন্য এতে তুষ্ট না হইয়া।
বলে জীবে শিক্ষা দিব সন্ন্যাস করিয়া ॥
দন্তে তৃণ করিয়া ফিরিব সব গ্রাম।
সর্ব্ব জীবে উদ্ধারিব দিয়া হরিনাম ॥
সংসার তেয়াগি যাব কাটোয়া নগরে।
কেশব ভারতী গুরু উদ্ধারিবে মোরে ॥

নাহি রব ঘরে মুহি সন্ন্যাস করিব।
নতুবা কিরূপে সব জীব নিস্তারিব ॥

প্রভুর হইল ইচ্ছা সন্ন্যাস করিতে।
বড় বেগ লাগিল শুনিয়া মোর চিতে ॥
অবধৌতে ডাকি প্রভু বলিলা বচন। *
সন্ন্যাস করিব মুহি না কর বারণ ॥
পুণ্যকাল মাঘ মাস উত্তর অয়নে।
সন্ন্যাস লইব কথা রাইখো সঙ্গোপনে ॥
মুকুন্দ আর গদাধরে বোলো এ বচন।
না করিও যথা তথা এ কথা কীর্ত্তন ॥
জননীর কাছে কথা ইঙ্গিতে বলিবে।
ভক্ত মণ্ডলীর মাঝে নাহি প্রচারিবে ॥
মুহি সঙ্গী দাস সব শুনিনু শ্রবণে।
হৃদয় ফাটিয়া যেন হৈলা দুই খানে ॥
মরি মরি এহি দুঃখ সহনে না যায়।
সন্ন্যাস করিবে মোর প্রভু গোরা রায় ॥
সন্ন্যাস করিতে গোরা করিবে পয়ান।
হৃদয় ফাটিয়া মোর হকু শত খান ॥
তৃণ হতেও লঘু মুহি মোরে কিবা কাজ।
তথাপি আমার মুণ্ডে পড়ু † শত বাজ ॥

* ফুকরায়—চীৎকার করে, কিন্তু কোন কোন স্থলে এই শব্দের অর্থ 'মাঝে মাঝে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠা।' এই বহির অনেক স্থলে 'ফুকরায়' শব্দ তদ্রূপ ক্রন্দন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা "দেখিয়া প্রভুর ভাব ভর্গ ফুকরায়।"

† রাগে—অনুরাগে।

* এই বর্ণনায় দেখা যায়, চৈতন্যদেব প্রথমত সন্ন্যাসের কথা নিত্যানন্দের নিকট ব্যক্ত করেন, তার পর মুকুন্দের নিকট যাইয়া বলেন এবং তৎপর গদাধরের নিকটে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এই বর্ণনা ঠিক চৈতন্য-ভাগবতের সঙ্গে রেখায় রেখায় মিলিয়া যাইতেছে (চৈ, ভা, মধ্য ২৫ অ)। গোবিন্দ এই ঘটনাগুলি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এবং বৃন্দাবন দাস প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট শুনিয়াছিলেন, সুতরাং বর্ণনার এই আশ্চর্য্য ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে। গৌরপদতরঙ্গিণীতে গোবিন্দ ঘোষের পদেও দৃষ্ট হয়, মুকুন্দ ও গদাধর সর্ব্বপ্রথম গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস শুনিয়া বিলাপ করিতেছেন। (৩৬৬ পৃঃ)।

† পড়ু—পড়ুক।

প্রভুর বিরহ বেথা কেমনে সহিব।
কেমনে চৈতন্য বিনা কাল কাটাইব॥

তার পরে প্রভুপাদ স্বয়ং উঠিয়া।
মুকুন্দের কাছে প্রভু গেলেন চলিয়া॥
সঙ্গে সঙ্গে যাই আমি কাঁদিতে কাঁদিতে।
নয়নের জলে পথ না পাই দেখিতে॥
মুকুন্দেরে ডাক দিয়া বলিলা বচন।
দণ্ড কমণ্ডলু আমি করিব গ্রহণ॥
শিখা সূত্র ত্যাগ করি সন্ন্যাস লইব।
তাহা না করিলে কিসে জীব উদ্ধারিব॥
এহি বাক্য শুনিয়া মুকুন্দ মহাশয়।
অশ্রু স্রোতে ভাসাইলা বিশাল হৃদয়॥
আছাড় খাইয়া তবে মুকুন্দ পড়িল।
হাতে ধরি উঠাইয়া প্রভু বসাইল॥
প্রাণ যায় কি শুনালে ওহে দয়াময়।
কথা শুনে অভাগার ফাটিছে হৃদয়॥
আর কিছু দিন হরিনাম বিতরিয়া।
সন্ন্যাস করিও প্রভু সংসার তেজিয়া॥

এত শুনি প্রভু গদাধরের নিকটে।
ধাইয়া গিয়া সব কথা কন অকপটে॥
শুনি বাণী গদাধর ফুকারি উঠিল।
আকাশ ভাঙ্গিয়া তার মাথায় পড়িল॥
লট পটি গদাধর ভুমে গড়ি যায়।
রক্তবর্ণ দেহ হইলা শোণিত ধারায়॥
কি শুনালে উঠে বসি বলে গদাধর।
তোমার....................অন্তর॥
মোরে বলে আন বিষ শীঘ্র মুহি পিব।
প্রভুর বিয়োগ উহু কেমনে সহিব॥
কোটি বৃশ্চিকেতে যদি দংশন করয়।
ইহা হৈতে সে যাতনা অতি তুচ্ছ হয়॥
প্রাণের নিমাই যদি হয় সর্ব্বত্যাগী।
সঙ্গে সঙ্গে যাব মুহি হয়ে অনুরাগী॥

মুরারি প্রভৃতি ভক্ত শুনিলে এ কথা।
জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িবে যথা তথা॥
চৈতন্য ছাড়িলে দেহে কিবা আর কাজ।
এই দণ্ডে আমাদের মুণ্ডে পড়ু বাজ॥
অনন্তর গদাধর পাকাড়ি চরণ।
কহিতে লাগিলা অশ্রু করি বরষণ॥
তোমার জননী যবে এ কথা শুনিবে।
কেমনে তখন দেহে পরাণ ধরিবে॥
তার পরে এই কথা শুনি কাণাকাণি।
বৈষ্ণবগণের আহা উড়িল পরাণী॥
কেহ বলে কোটি বিছা দংশন করিছে।
কেহ বলে প্রাণ মোর আগুনে পুড়িছে॥
কেহ ছিন্ন বৃক্ষ সম পড়ে দাণ্ডাইয়া।
দাঁতি লেগে কেহ কেহ পড়িল ঢলিয়া॥
এই সব শুনিয়া আমার বিশ্বম্ভর।
সকলেরে বুঝাইতে লাগিল বিস্তর॥
বৈষ্ণবগণের কাছে প্রভু ধাইয়া গিয়া।
সকলেরে মিষ্ট ভাষে দিলেন বুঝাইয়া॥
তার পরে শচী দেবী এই বাক্য শুনি।
পড়িলা অজ্ঞান হৈয়া পরমাদ গণি॥
হৃদয় চাপড়ি শচী কান্দে উচ্চস্বরে।
অশ্রুধারা পড়ে তাঁর হৃদয় উপরে॥
হায় রে নিমাই তুই কোথা যাবি বাপ।
পশু পক্ষী কান্দে তাঁর শুনিয়া বিলাপ॥
তার পরে অবধৌত প্রভুর প্রাঙ্গণে।
প্রবেশিয়া ঐ কথা কন শচী সনে॥
বজ্র সম বাক্য শচীর হৃদয়ে বিন্ধিল।
অমনি আছাড়ে শচী ভূতলে পড়িল॥
হৃদয়ে চাপড় মারি কান্দে উভরায়।
পঙ্কিল হইল ধরা অশ্রুর ধারায়॥
বিষ্ণুপ্রিয়া ঐ কথা কাণাকাণি শুনি।
মাথে হাত দিয়া সতী বসিলা অমনি॥
অশ্রু পড়ে ঝর ঝর হৃদয় বাহিয়া।
উঠিলেক শোকসিন্ধু যেন উথলিয়া॥

তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ গোরা না করিয়া। *
শ্রীবাস অঙ্গনে প্রভু গেলেন চলিয়া ॥

এখানে শ্রীবাস গৃহে মহা সঙ্কীর্ত্তন।
করিতে লাগিলা প্রভু হয়ে অচেতন ॥
কীর্ত্তনে মাতিয়া গোরা নাচিতে লাগিল।
অমনি বসন তাঁর খসিয়া পড়িল ॥
কদম্ব কুসুম সম হইল শরীর।
অজ্ঞান হইয়া নাচে মোর ধর্ম্মবীর ॥
শোণিতের ধারা বহে লোমকূপ দিয়া।
ক্ষত হইয়াছে অঙ্গ আছাড় খাইয়া † ॥
নাচিতে নাচিতে বলে হরি বনমালী।
ভক্তগণ সঙ্গে নাচে দিয়া করতালী ॥

পৌষমাস সংক্রান্তি সন্ধ্যার সময়ে।
ফিরিয়া আইলা প্রভু আপন আলয়ে ॥
যাতায়াত করিতে লাগিলা বহু লোক।
উথলিয়া উঠে তছু শচীমার শোক ॥
মিষ্ট বাক্যে জননীরে বুঝাইয়ে তখন।
রন্ধন আলয়ে গিয়া দিলা দরশন ॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশা অতীত হইলা।
ভোজন করিয়া প্রভু শয়ন করিলা ॥

মুহি গিয়া নিজ স্থানে করিনু শয়ন।
প্রভুর আদেশে কিন্তু করি জাগরণ ॥
রজনীর শেষভাগে প্রভু দয়াময়।
হঠাৎ বাহিরে আসি মোরে ডাকি কয় ॥ *
বলে থাক প্রস্তুত হইয়া এই খানে।
বিদায় লইয়া আসি মায়ের চরণে ॥
এত বলি অন্তঃপুরে গেলেন চলিয়া।
পুনঃ আসি বাহিরিলা আমারে ডাকিয়া ॥
ব্যগ্র হয়ে বলে মোরে চল মোর সনে।
কাটোয়া নগরে যাই কাটিতে বন্ধনে ॥
এই বাক্য যথা তথা না বলিবে তুমি।
সন্ন্যাস করিয়া জীব উদ্ধারিব আমি ॥
স্বার্থপর দুরাচার মদ্য মাংস খায়।
কলির জীবের বল কি হবে উপায় ॥

---

* "লক্ষ্মীরে (বিষ্ণুপ্রিয়াকে) আনিয়া প্রভুর নিকটে বসায়। দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়। কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ। দিবানিশি শ্লোক পড়ি করয়ে ক্রন্দন।" (চৈ, ভা, আদি)

† চৈতন্য চরিতামৃতে দৃষ্ট হয় চৈতন্যদেবের মহাভাবের সময়, প্রতি লোমকূপ হইতে রক্ত বিন্দু বাহির হইত, সেই দশা রাধিকায় আরোপ করিয়া কৃষ্ণকমল গোস্বামী তাঁহার "রাইউন্মাদিনী' কাব্যে লিখিয়াছেন, রাধিকার প্রতি রোম কূপ হইতে রুধির উদ্গম হইতেছে। এস্থলে গোবিন্দদাস সেইরূপ অবস্থার ইঙ্গিত করিয়াছেন কিনা, তাহা ঠিক বলা যায় না, যেহেতু রক্তপাতের কারণ স্বরূপ "ক্ষত হইয়াছে অঙ্গ আছাড় খাইয়া " ছত্রটি আছে।

* চৈতন্য ভাগবতে দৃষ্ট হয় সন্ন্যাসের পূর্ব্বরাত্রে প্রভু হরিদাস ও গদাধরের সঙ্গে এক গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন। "নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর।" লোচনদাস এই উপলক্ষে মস্ত বড় একটা দাম্পত্য-লীলার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা একবারেই সমীচীন হয় নাই। চৈতন্য ভাগবতের বর্ণনার সঙ্গে করচার খুব ঐক্য আছে। করচায় দৃষ্ট হয় "রজনীর শেষ ভাগে" চৈতন্য বহির্বাটী হইতে অন্তঃপুরে গমন করিতেছেন। চৈতন্য ভাগবতেও অবিকল সেই কথাই আছে। "দণ্ডচারি রাত্রি আছে ঠাকুর জানিয়া। উঠিলেন চলিবারে সামগ্রী লইয়া ॥" (চৈ, ভা, মধ্য ২৫ অ)। এই উপলক্ষে গৌরপদ তরঙ্গিণীতে যে সকল উচ্ছ্বসিত কবিত্বময় পদাবলী আছে, তাহাদের ঐতিহাসিক মূল কিছু নাই। তাহাতে বর্ণিত আছে রাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়ার হাত শূন্য শয্যায় পড়াতে তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং স্বামী চলিয়া গিয়াছেন জানিয়া শচীদেবীর ঘরের দ্বারে বসিয়া মৃদুস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্রের সন্ন্যাসচিন্তাভীতা শচীর দুটি চোখে ঘুম ছিল না। তিনি বধূর মৃদু কান্নার স্বর শুনিয়া অমনই বাহির হইলেন। তখন শাশুড়ী ও

শিশ্নোদর-পরায়ণ নিষ্ঠা-বিবর্জিত।
অর্থের লাগিয়া মিথ্যা কহে অবিরত॥
যোনিকীট রমণীর মুখলালা খায়।
ভক্তি অমৃতের ধারা নিছিয়া ফেলায়॥
বেশ্যার অন্নেতে রুচি বেশ্যা অনুগত।
কনক কামিনা কলা কাম কেলি রত॥
একারণ মুহি শিখা সূত্র তেয়াগিয়া।
বেড়াইব দ্বারে দ্বারে হরিনাম দিয়া॥
হরিনাম মহামন্ত্র দীক্ষা নাহি যার।
সেই নাম পথে ঘাটে করিব প্রচার॥
চণ্ডাল যুবক গৃহী বালবৃদ্ধ নারী।
নামে মত্ত হয়ে দাণ্ডাইবে সারি সারি॥
বালকে বলিবে হরি বালিকা বলিবে।
পাষণ্ড অঘোরপন্থী নামে মত্ত হবে॥
আকাশ ভেদিয়া নামের পতাকা উড়িবে।
রাজা প্রজা এক সঙ্গে গড়াগড়ি দিবে॥
সন্ন্যাস করিয়া যদি না লই কৌপীন।
তবে কিসে উদ্ধারিব পাপী তাপী দীন॥
কলির জীবের দশা মলিন দেখিয়া।
থাকিতে পারিনা আর কাঁপে মোর হিয়া।
করঙ্গ কৌপীন লয়ে সন্ন্যাস করিব।
রাধা কৃষ্ণ নাম দিয়া সবে উদ্ধারিব॥
যারা বড় পাপী তাপী তাদের লাগিয়া।
সদা মোর চিত্ত কান্দে আকুল হইয়া॥

মোর সহ এরূপে করেন আলাপন।
হেন কালে শচী দেবী দিলা দরশন॥

আথিবিথি শচী দেবী বাহিরে আসিয়া।
সম্মুখে দাণ্ডাল মাতা হস্ত প্রসারিয়া॥
তার পরে জননীর ধরিয়া চরণ।
বিদায় লইয়া প্রভু করিলা গমন॥
কান্দিতে লাগিলা মাতা দ্বারে দাঁড়াইয়া।
পশ্চাতে চলিনু মুহি খড়ুম লইয়া॥
কাঠের পুতলী সম শচী দাণ্ডাইলা।
ঝর ঝর অশ্রু বারি পড়িতে লাগিলা॥ *

তার পরে দ্বার হইতে হইয়া বাহির।
গঙ্গা পার হয়ে তবে চলে ধর্ম্মবীর॥
পার হৈয়া প্রভু চলে কণ্টক নগরে।
পেছনে পেছনে যাই সেবা করিবারে॥
যে সব আশ্চর্য্য লীলা পাই দেখিবারে।
করচা করিয়া রাখি শক্তি অনুসারে॥

সন্ধ্যাকালে পৌছিনু কণ্টক নগরে।
কাংস্য শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি হয় ঘরে ঘরে॥
তার পর রাত্রি যোগে মুকুন্দ শেখর।
অবধৌত ব্রহ্মানন্দ আর গদাধর॥
গুরুদেব গঙ্গাদাস গাথক শিবাই।
একে একে দেখা দিতে লাগিল সবাই॥
নিশীথ সময়ে তবে হরি বলি গোরা।
নাচিতে লাগিলা প্রেমে হইয়া বিভোরা॥

পুত্রবধূ দীপ লইয়া নবদ্বীপের রাস্তায় রাস্তায় চৈতন্যকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বর্ণনাগুলি অতি সুন্দর, কিন্তু উহা ঐতিহাসিক নহে। চৈতন্যদেব কি মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ না করিয়া চোরের মত পালাইয়া যাইতে পারেন? এখানে করচা ও চৈতন্য-ভাগবতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব যথাযথভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

* শচীদেবীর এই চিত্রের সঙ্গে চৈতন্য ভাগবতের বর্ণিত মুর্ত্তি ঠিক একরূপ, "যত কিছু বলে প্রভু শচী নাহি শুনে। উত্তর না স্ফুরে কাঁদে অঝর নয়নে॥ ... ... প্রভু চলিলেন শুনি শচী জগন্মাতা। জড় হইলেন কিছু নাহি স্ফুরে কথা।" (চৈ, ভা, মধ্য ২৫অ) এই মূর্ত্তিমতী শোকের মুক চিত্র, এবং "কাঠের পুতলী"র ন্যায় নির্ব্বাক ছবি—দুইই ঠিক একরূপ।

লক্ষ লক্ষ লোক আসি দরশন দিল।
কৃষ্ণভক্তি দেখে সবে আশ্চর্য্য হইল॥
ফুল ফেলি মারে কেহ কেহ দেয় মালা।
প্রভুর রূপেতে চারি দিক কৈলা আলা॥
কোটি মদন সে রূপের নহেক তুলনা।
ডমরুর মধ্য জিনি কটির বলনা †॥
বিশাল নয়নে যেই দিকে যবে চায়।
সেই দিকে নীলপদ্ম বরষিয়া যায়॥
আজানুলম্বিত বাহু অতিদীর্ঘ কায়।
দন্তে তৃণ করি গোরা দাস্য ভক্তি চায়॥
এইরূপে নৃত্য গীতে রাত্রি পোহাইল।
বহু লোক দেখি গোরা কহিতে লাগিল॥
মোর বাক্য মন দিয়া শুন সবে ভাই।
কৃষ্ণে আর কৃষ্ণনামে কিছু ভেদ নাই॥
ভজ কৃষ্ণ ভাব কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণনাম।
নাম-বলে তোমরা ভাই যাবে নিত্য ধাম॥
এ সকল যাহা দেখ সব মিথ্যা হয়।
প্রকৃতির ছায়া মাত্র বেদে ইহা কয়॥
সাধের প্রতিমা তব থাকিবে পড়িয়া।
যবে যম আসি গলা ধরিবে টিপিয়া॥
পালঙ্কে আর ভূমি শয্যায় নাহি কোন ভেদ॥
ভেদ বুদ্ধি করে যারা তারা পায় খেদ॥
বিষয় পাইয়া যেই করে অহঙ্কার।
নরকের কীট সেই শাস্ত্রের বিচার॥
রাজায় দরিদ্রে ভেদ কিছুমাত্র নাই।
ভেদ বুদ্ধি অজ্ঞানতা করি দেয় ভাই॥
এক মুষ্টি অন্নে পূরে রাজার উদর।
তাতেই দরিদ্র হয় সন্তুষ্ট অন্তর॥
ভূতলে শুইয়া নিঃস্ব সুখে নিদ্রা যায়।
রাজার নাহিক নিদ্রা অমূল্য শয্যায়॥
রাজা নাহি খায় সোণা হীরা পান্না মতি।
ধনমদে নাহি ভাবে অখিলের পতি॥
মৃত্যুকালে যেইরূপে দরিদ্র মরিবে।
সেইরূপে ভূস্বামী যমের ঘরে যাবে॥
রাজার নয়নে মায়া ঠুলি আছে বাঁধা।
ঘানীর বলদ সম সর্ব্বদা সে আঁধা॥
এক স্থানে ঘুরে মরে ঘানীর বলদ।
কোটি বৎসরেও তার না ফুরায় পথ॥
আত্মারাম উড়ে গেলে থাকিবে দেহ জড়।
ভাঙা পিঁজিরার ন্যায় করিবে নড়্ বড়্॥
আদরের দেহ যাবে পচিয়া সড়িয়া।
শৃগাল কুকুরে খাবে উদর পূরিয়া॥
অহঙ্কারে মত্ত জীব সংসারে মজিয়া।
বিষয় বিষয় করি মরে গুমরিয়া॥
কন্যা পুত্র অট্টালিকা পোকুর উদ্যান।
কামিনী কনক আদি পাইয়া অজ্ঞান॥
কেবা কার কন্যা পুত্র কেবা কার পতি।
সব জড় ভাব ছাড়ি কর কৃষ্ণে মতি॥
পুত্র মিথ্যা কন্যা মিথ্যা মিথ্যা ধন ধান্য।
এক মাত্র সত্য বস্তু হয় সে চৈতন্য॥
পচা গৃহস্থের কথা কব কত আর।
পুত্র কন্যা বিভবে মজিয়া জর জর॥
বিষয় বাড়িলে করে কতই মন্ত্রণা।
বিটকীট সম পায় বিস্তর যাতনা॥
সর্ব্বত্র কৃষ্ণের মূর্ত্তি করে ঝল মল।
সে দেখিতে পায় যার আঁখি নিরমল॥
চর্ম্ম চক্ষে দেখে মূর্খ বিষয়ে আসক্ত।
দিব্য জ্ঞান চক্ষে দেখে নিত্য মুক্ত ভক্ত॥
অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয় ধূলিতে।
কেমনে সে সূক্ষ্ম তত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥
প্রেম প্রেম করে সবে প্রেম জানে কেবা।
প্রেমের কি তত্ত্ব হয় রমণীর সেবা॥
অভেদ পুরুষ নারী যখন জানিবে।
তখন প্রেমের তত্ত্ব অবশ্য স্ফুরিবে॥
অপত্য লাগিয়া আর্ত্তি যদি প্রেম হয়।
তা হইলে প্রেমতত্ত্ব কিছুই ত নয়॥

† বলনা—গঠন।

ঈশ্বরের লাগি আর্ত্তি হয় যদি মনে।
নিশ্চয় তাহারে প্রেম কহে মহাজনে ॥
বিশুদ্ধ প্রেমের তত্ত্ব শুন মন দিয়া।
যার অল্প হিল্লোলে জুড়ায় দগ্ধ হিয়া ॥
যুবতীর আর্ত্তি যথা যুবক দেখিয়া।
সেইরূপ আর্ত্তি আর না দেখি ভাবিয়া ॥
একারণ ভক্তগণ ভজে যদুপতি।
পত্নীভাবে তাঁর প্রতি স্থির করি মতি ॥
আত্মারামের জন্য যার আর্ত্তি হয়।
তার কি মনের মধ্যে কামভাব রয় ॥
আলোর নিয়ড়ে যথা তম নাহি রয়।
কৃষ্ণের সমীপে তথা কাম ভস্ম হয় ॥
কেবল প্রেমের আর্ত্তি থাকে বিদ্যমান।
এইত বলিয়া দিনু প্রেমের সন্ধান ॥
এখন প্রেমের লাগি কর হানা পানা।
কৃতার্থ হইবে যাবে সংসার যাতনা ॥
কলহ বিবাদ দ্বেষ মিথ্যার কারণে।
সংসার নরক হয় ভেবে দেখ মনে ॥
অর্থের লাগিয়া গৃহী কহে মিথ্যা কথা।
প্রবঞ্চনা নরহত্যা করে যথা তথা ॥
পচা গৃহস্থের কথা কব কত তার।
পুত্রকন্যা বিষয় বিভবে জর জর ॥
তুমি কার কে তোমার নাহি ভাব মনে।
জড়পিণ্ড দেহ লাগি ব্যস্ত উপার্জ্জনে ॥
নিশ্চয় হইবে মৃত্যু তাহে দৃষ্টি নাই।
চিরকাল বাঁচিব কেবল ভাব তাই ॥
তন্ন তন্ন করি কত শাস্ত্র বা পড়িলা।
কিন্তু গণ্ডমূর্খ সবে পড়িয়া হইলা ॥
যত বিদ্যা যত বুদ্ধি তত স্বার্থপর।
যত পড় তত হয় মলিন অন্তর ॥
মুখে বল মাতৃবৎ পরের রমণী।
নির্জ্জনে পাইলে কামে মুগুধ অমনি ॥
কাম ক্রোধ রিপু হয় পরের বেলায়।
নিজের বেলায় কিন্তু বন্ধু তারা হয় ॥

এসকল নরকের অসীম যাতনা।
একবার হৃদয়েতে ভাবিও ভাবনা ॥
যদবধি ঈশ্বরেতে ভক্তি না হইবে।
তদবধি এইরূপে নরকে থাকিবে ॥
সামান্য অর্থের স্বার্থ পায় তেরাপিতে।
কিন্তু কোটি মুদ্রা তোমার পারে ভুলাইতে ॥
কলির জীবের সার এক হরিনাম।
সেই নাম লয়ে চলে যাও নিত্যধাম ॥
পুলকের সহ সদা বল হরিবোল।
কলির বাজারে কেন কর গণ্ডগোল ॥
অট্টালিকা কুটীরেতে কিবা ভেদ আছে।
জিজ্ঞাসিয়া দেখ ভাই পণ্ডিতের কাছে ॥
যেমন প্রাসাদে রাজা পালঙ্কে ঘুমায়।
সেইরূপ দরিদ্র কুটীরে নিদ্রা যায় ॥
জলপান করে রাজা সোনার পাত্রেতে।
কুঁড়েবাসী জলপিয়ে মাটির ভাঁড়েতে ॥
উভয়ের লক্ষ্য এক পিপাসার শান্তি।
রাজার সোনার পাত্র কেবল মাত্র ভ্রান্তি ॥
মুকুতার ডাল ভাজা রত্নের তরকারী।
ভূপতি কি খান হীরার অন্ন পাক করি ॥
অহঙ্কারে মত্ত রাজা দেখিতে না পায়।
পুনঃ পুনঃ এইভাবে আসে আর যায় ॥

এইরূপে শিক্ষা দেয় চৈতন্য গোসাই।
বহু বহু জনতা হইল এক ঠাঁই ॥
বিল্ববৃক্ষতলে বসি কণ্টক নগরে।
নানা উপদেশ দিলা অতি উচ্চস্বরে ॥
শ্রীমুখের বাণী হয় বেদান্তের সার।
যা শুনিলে জীবগণের বিমুক্ত সংসার ॥
এইরূপে দিন রাত্রি অতীত হইলা।
পরদিন প্রাতে প্রভু সিনান করিলা ॥
আঁচলে নয়ন চাপি কাঁদে নারীগণ।
ঝর ঝর অশ্রুধারা করে বরিষণ ॥

কেহ বলে রূপের বালাই লৈয়া মরি।
কেমনে ইহার মাতা রবে প্রাণ ধরি॥
কোটি মদনের গর্ব্ব খর্ব্ব এইখানে।
এমন কেশের শোভা দেখিনি নয়নে॥
চিবুকের কিবা শোভা অতি নিরমল।
নীল পদ্ম জিনি শোভে নয়ন কমল॥
এমন আশ্চর্য্যরূপ কভু দেখি নাই।
কেমনে কৌপীন দণ্ড ধরিবে নিমাই॥
পাষাণে গঠিত হয় কেশব ঠাকুর।
কেমনে মুড়াবে কেশ বড়ই নিঠুর॥
আহাঁ মরি কিবা শোভে কণ্ঠে বনমালা।
মুখ শোভা চারিদিক্ করিয়াছে আলা॥
নারীগণ এইরূপে কত কথা বলে।
হেনকালে প্রভু মোরে ডাকিলা কৌশলে॥
প্রভু বলে দ্রব্যজাত আনহ ত্বরিতে।
মুণ্ডন করিব কেশ সন্ন্যাস করিতে॥
আর না রহিব ঘরে বন্ধন দশায়।
নরক যন্ত্রণা গৃহে কথায় কথায়॥
এই কথা শুনি শুদ্ধসত্ব গদাধর।
অবধোত নিত্যানন্দ শ্রীচন্দ্রশেখর॥
সন্ন্যাসের উপযুক্ত বিবিধ সম্ভার।
আনিয়া পূরিল সবে ন্যাসীর ভাণ্ডার॥
দেবা* নামে নাপিতেরে ডাকিয়া আনিল।
বিল্ববৃক্ষতলে আসি নাপিত বসিল॥

নাপিতে বলিলা তবে চৈতন্য গোঁসাই।
মুণ্ডন করহ দেব ব্রজে চলে যাই॥
ভারতীয় আজ্ঞা পেয়ে নাপিত তখন।
বসিলা নিয়ড়ে গিয়া করিতে মুণ্ডন॥
যখন নাপিত শেষে কেশে ক্ষুর দিলা।
অমনি রমণীগণ ফুকারি উঠিলা॥
নারীগণ বলে নাপিত একাজ করো না।
এমন চুলের গোছা মুড়ায়ে ফেলো না॥
এই বলি কাঁদিয়া উঠিল নারীগণ।
মুণ্ডন করিতে দেবা লাগিল তখন॥
হাজার হাজার লোক সন্ন্যাস দেখিতে।
কণ্টক নগরে সবে লাগিলা আসিতে॥

দিবসের শেষ ভাগে মুড়াইয়া কেশ।
ধরিলা নিমাই তবে সন্ন্যাসীর বেশ॥
দণ্ডকমণ্ডলু হাতে কৌপীন পরিল।
কাষায় বসনে পুনঃ তাহা আবরিল॥
দাঁড়াইলা ভারতীর সম্মুখে গোঁসাই।
রূপে দিক্ আলো কৈলা বলিহারি যাই॥
অবধোত গদাধর আর গঙ্গাদাস।
একে একে দাঁড়াইলা সন্ন্যাসীর পাশ॥
প্রভুর আশ্চর্য্য রূপ দেখিয়া ভারতী।
মনে মনে পাদপদ্মে করিলা প্রণতি॥
মনে মনে বলে গোঁসাই তুমি সে ঈশ্বর।
তোমার অধীনে হয় বিশ্ব চরাচর॥
লোকশিক্ষা লাগি তুমি পরিলে কৌপীন।
ভক্তিমার্গ দেখাইতে দীনের অধীন॥

অপরাহ্ণ কালে প্রভু সন্ন্যাসী হইলা।
হুলুধ্বনি নারীগণ করিয়া উঠিলা॥
লতা পাতা শাখা বৃক্ষ প্রেমেতে ভাসিল।
পশু পক্ষী কীট যেন নাচিয়া উঠিল॥
লক্ষ লক্ষ লোকে করে পুষ্প বরষণ।
কণ্টক নগর হ'লো নন্দন কানন॥

---

* জন-প্রবাদ এই, যে নাপিত চৈতন্যের মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিল, তাহার নাম 'মধু'। কিন্তু কোন সন্ন্যাসীর মস্তক হয়ত কোন সময় 'মধু' নামক নাপিত মুণ্ডন করিয়াছিল—তৎপর হইতে "মধু" নামটি সন্ন্যাস-গ্রহণোদ্যত ব্যক্তির সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে। যেহেতু ময়নামতীর গানে গোপীচন্দ্রকে যে নাপিত ক্ষৌর করিয়াছিল, তাহার নাম ও 'মধু' দৃষ্ট হয়। আমাদের মতে এই 'দেবা' নামই প্রকৃত। "মধু নাপিত" নামে এক শ্রেণীর নাপিত আছে। 'দেবা' এই শ্রেণীর নাপিত হইতে পারে। এখন "মধুনাপিতে"রা ময়রার কার্য্য করিয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম রাখিলা ভারতী।
লক্ষ লক্ষ লোক তথি করে গতাগতি ॥
অঁাজলি পুরিয়া যত কুলবধূগণ।
প্রভুর মাথায় করে লাজ বরষণ ॥
হরিধ্বনি উঠিলেক গগন ভেদিয়া।
গড়াগড়ি যায় সবে ভক্তিতে রসিয়া ॥
আকাশ ভেদিয়া নাম ভ্রমিছে গগনে।
আনন্দে মাতিয়া শুনে যত দেবগণে ॥
রজনীতে প্রভু মোর করি জাগরণ।
হরিনামে মাতি রাত্রি করিলা যাপন ॥
প্রভাতে শেখরে * প্রভু বলিলা বচন।
তোমরা সকলে যাও নদীয়া ভবন ॥
ব্রহ্মানন্দ সহ যাও জননীর কাছে।
বল গিয়া নিমাই সন্ন্যাস করিয়াছে ॥
রোদন করেন যদি আমার জননী।
আশ্বাস বাক্যেতে তাঁরে বুঝাবে অমনি ॥
তারপর নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে।
ভারতীকে লয়ে চলিলেন নানা রঙ্গে ॥
পেছনে পেছনে আমি খড়ী লয়ে যাই।
নাম মদে মাতয়ারা চৈতন্য গোঁসাই ॥

লক্ষ লক্ষ লোক চলে প্রভুর পেছনে। *
বিস্তর পণ্ডিত চলে প্রভু দরশনে ॥
রুদ্রদেব রামরত্ন জগাই পণ্ডিত।
গঙ্গাদাস শম্ভুচন্দ্র ভুবনে বিদিত ॥
ঈশান শঙ্কর বলরাম গদাধর।
পণ্ডিতের শিরোমণি চণ্ডচণ্ডেশ্বর ॥
কাশীশ্বর ন্যায়রত্ন আর সিদ্ধেশ্বর।
পঞ্চানন বেদান্তিক আর রত্নাকর ॥
এই সব ...... পণ্ডিত চলে সঙ্গে। ১
প্রেমে মত্ত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চলে রঙ্গে ॥
নৃত্যপরায়ণ প্রভু আগে আগে ধায়।
কখন ধাবন লম্ফ পতন ধরায় ॥
ধারা বহি অশ্রুবারি বহিছে নয়নে।
ভারতী গোঁসাই কান্দে প্রেম আস্বাদনে ॥

* শেখর—চন্দ্র শেখর।

† সন্ন্যাস গ্রহণের সময় যে সকল ভক্তের নাম চৈতন্য ভাগবতে ও জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে পাওয়া যায়, তাঁহাদের সঙ্গে করচা-দত্ত নামের ঐক্য আছে। জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে নিত্যানন্দ, মকুন্দ দত্ত, জগদানন্দ গোবিন্দ কর্ম্মকার প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়, চৈতন্য ভাগবতে ও নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। "নিত্যানন্দ, গদাধর মুকুন্দ, গোবিন্দ। সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ। (অন্ত্য ২য়।) কিন্তু ঠিক সন্ন্যাসের সময় চৈতন্য ভাগবতে যে দুইটি ছত্রের উল্লেখ আছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করিতেছি। "নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ-সংহতি। গোবিন্দ পশ্চাতে আগে কেশব ভারতী ॥" করচায় "তার পর নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে। ভারতীকে লয়ে চলিলেন নানারঙ্গে ॥ পেছনে পেছনে আমি খড়ী লৈয়া যাই।" এই দুই বর্ণনা একরূপ। "গোবিন্দ পশ্চাতে" আর "পেছন পেছন আমি খড়ী লৈয়া যাই।" ঠিক মিলিয়া যাইতেছে। তৎসঙ্গে জয়ানন্দের এই উপলক্ষে "মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্ম্মকার' পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন, যে সেই স্মরণীয় ঘটনা যাঁহারা চাক্ষুষ দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা এক কথাই বলিয়া গিয়াছেন। গোবিন্দ নিজে দেখিয়াছিলেন এবং অপর দুই লেখক, প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে শুনিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে আর একটি কথা বলা দরকার। বৈষ্ণব ভক্তদের গণ্ডী ছাড়াইয়া কয়েক জন প্রধান পণ্ডিতের নাম পাওয়া যাইতেছে ; ইহারা চৈতন্য প্রভুর সন্ন্যাস দেখিতে আসিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে, এমন কি তৎসময়েও, বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের নাম মনে রাখার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কিন্তু গোবিন্দ তাঁহাদের নাম দিয়া গিয়াছেন, "রুদ্রদেব" হইতে রত্নাকর" পর্য্যন্ত ছত্র কয়েকটি দ্রষ্টব্য।

* এই জায়গার বর্ণনায় বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন "লক্ষ কোটি লোক পাছে পাছে কাঁদি যায়।"

১। এখানে যে সকল পণ্ডিতের নাম দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের অধিকাংশের নাম অন্য কোন পুস্তকে পাওয়া যায় না।

তারপর পূর্ব্বদিকে চলে আবেশেতে।
আচার্য্যের গৃহে ধায় মাতিয়া ভাবেতে ॥
কিছুকাল আচার্য্যের গৃহেতে রহিলা।
তারমধ্যে শচীমাতা আসি দেখা দিলা ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু মাতার চরণে।
প্রণাম করিয়া কথা কন সন্তর্পণে ॥
দুই চারি বাত কহি মায়া কাটাইয়া।
দক্ষিণে করিলা যাত্রা সকলে ছাড়িয়া ॥
ঈশান প্রতাপ গঙ্গাদাস গদাধর।
ন্যাসীর সহিত চলে আর বাণেশ্বর ॥

বর্দ্ধমানে যখন পৌছিনু মোরা সবে।
ভাবিতে লাগিনু মুহি ভাগ্যে কিবা হবে ॥
মোর প্রতি চাহি প্রভু কহিতে লাগিলা।
অমিয়ের ধারা যেন গলিয়া পড়িলা ॥
মোর পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া প্রভু কহে।
চল যাই গোবিন্দরে তোমাদের গৃহে ॥
এই কথা শুনি মুহি উঠিনু চমকি।
হাসিয়া চলিলা প্রভু ঠমকি ঠমকি ॥
প্রভুর সন্ন্যাস-কালে ধরেছি কৌপীন।
অহঙ্কার তেজিয়া হয়েছি অতি দীন ॥
আর ত বাসনা নাই সংসার করিতে।
প্রভুর সহিত যাই নাচিতে নাচিতে ॥
পথেতে যাইতে মুহি জোড় করি হাত।
উত্তরে কহিনু তথা দুই চারি বাত ॥
আরত যাবনা প্রভু কাঞ্চন নগরে।
বিষ্ঠাসম ত্যজিয়াছি জঘন্য সংসারে ॥

এই কথা বলিতে বলিতে মোর নারী।
কেমনে শুনিয়া তথা আইলা ত্বরা করি ॥
দর দর পড়িতেছে অশ্রু দুনয়নে।
পড়িলা আছাড় খেয়ে আমার চরণে ॥
অশ্রুমুখে বলিতে লাগিলা এই বাত।
ফিরে চল গৃহে মুহি যাই তব সাত ॥
সামান্য কথায় তুমি সংসার তেজিলে।
দাসীর উপায় তবে বল কি করিলে ॥
কার দ্বারে গিয়া ভিক্ষা করিব কোথায়।
দয়া করি কেবা ভিক্ষা দিবে গো আমায় ॥
কি আছে অদৃষ্টে মোর কার দ্বারে গিয়া।
ভিক্ষা করি বেড়াইব পেটের লাগিয়া ॥
শুনিয়া তাহার বাণী মাথা হেট করি।
মনে মনে বলিতে লাগিনু হরি হরি ॥
হরি স্মরণে কাটে যতেক বন্ধন।
সেকারণ মনে করি হরির চরণ ॥

দয়াময় শ্রীচৈতন্য হেরিয়া তখন।
কহিতে লাগিলা তবে মধুর বচন ॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী হইয়া দুঃখিনী।
অশ্রুজলে ভিজাইতে লাগিলা মেদিনী ॥
কান্দিয়া আকুল বামা চারিদিকে চায়।
তত্ত্বকথা বলি প্রভু তাহারে বুঝায় ॥
শুনিয়া প্রভুর সেই কথা আচম্বিতে।
চক্ষু চাপি আঁচলেতে লাগিলা কাঁদিতে ॥

তাহার রোদনে প্রভুর দয়া উপজিল।
অমনি ফিরিয়া মোরে কহিতে লাগিল ॥
প্রভু কহে গোবিন্দরে গৃহে থাক তুমি।
অন্য ভৃত্য সঙ্গে করি পুরী যাই আমি ॥

এই বাক্যে মোর চক্ষু হ'তে অশ্রু ঝরে।
অমনি চরণ ধরি পড়িনু কাতরে ॥
অশ্রুজলে পাখালিনু যুগল চরণ।
অমনি ফিরিয়া প্রভু করিলা গমন ॥

তবে মোর প্রতিবাসী একত্র হইয়া।
কহিতে লাগিল কথা মোরে ভুলাইয়া ॥
সংসার বিষের কথা লাগিনু কহিতে।
লাগিনু নারীর গুহ্য মুহি বাখানিতে ॥

শুন শুন ওহে ভাই রমণীর বাণী।
রমণী রমণ হয় একই পরাণী ॥

আত্ম অংশে দৃষ্টি যদি কর সবে এবে।
রমণী রমণ সব একই দেখিবে ॥*
অমৃত হইতে যারা সুস্বাদু ভাবিয়া।
রমণীর লালা পিয়ে নয়ন মুদিয়া ॥
নিত্যানন্দ ভুলে তাতে আনন্দ যাহার।
ধিক্ সে পামর জন্ম বৃথাই তাহার ॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন গৌরাঙ্গ আমার।
তেয়াগিয়া তাঁর সঙ্গ লইব সংসার ॥

এই কথা বলিতে বলিতে দামোদর।
পার হৈয়া চলিনু মোরা কাশী মিত্রের ঘর ॥†
কাশীমিত্র হয় একজন পুণ্যবান।
তার গৃহে প্রভু গিয়া কৈলা অধিষ্ঠান ॥
ভোগ লাগাইতে মিত্র ভাল চাউল দিলা।
চাউল দেখিয়া প্রভু প্রশংসা করিলা ॥
প্রভু বলে এই চাউল বড় চিকণিয়া।
ইহারে ডাকয়ে লোক কি নাম ধরিয়া ॥
মিত্র বলে জগন্নাথভোগ ইহার নাম।
ভোগ লাগাইলে হয় পূর্ণ মনস্কাম ॥
জগন্নাথভোগ শুনি প্রভু চমকিলা।
অমনি প্রেমের ধারা বহিতে লাগিলা ॥
কান্দিতে কান্দিতে বলে হাহা জগন্নাথ।
শীঘ্র টানিয়া মোরে লহ তব সাথ ॥
শাক সূপ নানা বস্তু রন্ধন করিয়া।
একত্র করিলা প্রভু আনন্দে মাতিয়া ॥
বেতো শাকের গন্ধে দিক আমোদ করিল।
ভোগ না হইতে মন চঞ্চল হইল ॥
প্রভু কহে তুলসী আনহ শীঘ্র করি।
ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ দিব প্রাণ ভরি ॥
বড় ক্ষুধা হইয়াছে বাছনি তোমার।
ইতি উতি চাহিতেছ তাই বারবার ॥
বড় লজ্জা পাইলাম প্রভুর কথায়।
হেটমুখে অমনি রহিনু তথায় ॥
ভোগ দিয়া প্রসাদ বণ্টন করি দিলা।
সুক্তার ঝোলে প্রাণ প্রসন্ন হইলা ॥
আষ্টখানা করলার ভাজি খাই সুখে ॥
বড় বড় গেরাস তুলিয়া দেই মুখে ॥
চুক্রাম্ল গুড় দিয়া অমৃত সমান।
কত খাব আনন্দেতে প্রসন্ন বয়ান ॥
অপরাহ্নে মিত্রগৃহ ছাড়ি গোরাচাঁদ।
ধাইল দক্ষিণ ভাগে পীরিতের ফাঁদ ॥

ক্রমে পৌঁছিনু মোরা হাজিপুর গ্রামে।
গ্রাম মাতাইলা প্রভু দিয়া হরিনামে ॥
প্রকাণ্ড এক বটবৃক্ষ গ্রামের বাহিরে।
সেইখানে বসিলাম মোরা ধীরে ধীরে ॥
সন্ধ্যাকালে সংকীর্ত্তন প্রভু আরম্ভিল।
আকাশ ভেদিয়া নাম গগনে উঠিল ॥
নাচিতে লাগিল প্রভু মাতাইলা দেশ।
কোথায় কৌপীন ডোর আলু থালু বেশ ॥

---

* সো নহ রমণ হাম নহ রমণী" রামরায়ের গান, (চৈ, চ)

† ইহার পরে চৈতন্য ভাগবত যে বর্ণনা দিয়াছেন, তৎসঙ্গে করচা-প্রদত্ত বর্ণনার মিল নাই। চৈতন্য-ভাগবত পর পর নিম্ন লিখিত স্থান গুলির নাম করিয়াছেন:—আটিসারা নগর, ছত্রভোগ, অম্বুলিঙ্গ-ঘাট, সুবর্ণরেখা নদী, জলেশ্বর, রেমুনা, যাজপুর। কটক, মহানদী, সাক্ষী-গোপাল, ভুবনেশ্বর, আঠারনালা, কমলপুরী। কিন্তু করচায় পর্য্যটনের পথ এইরূপ:—কাঞ্চন-নগর, দামোদর পার হওয়া, হাজিপুর, মেদিনীপুর, নারায়ণ গড়, সুবর্ণরেখা, হরিহরপুর, বালেশ্বর, নীলগড়, বৈতরণী পার হওয়া, মহানদী, সাক্ষীগোপাল, নিংরাজ।

এক্ষণ ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিবরণের সঙ্গে চৈতন্য ভাগবত ও করচার রেখায় রেখায় মিল দেখা যাইতেছে, অথচ পরবর্ত্তী বর্ণনায় গরমিল হওয়ার কারণ কি?

আছাড় খাইয়া কভু পড়য়ে ধরায়।
মুখে লালা ইতি উতি গড়াগড়ি যায়॥
শত শত লোক আসি সেখানে জুটিল।
নাম সংকীর্ত্তনে সবে মাতিয়া উঠিল॥
একত্রে মাতিল নামে যত নর নারী।
ধন্যরে নামের বল যাই বলিহারি॥
বালক বালিকা বৃদ্ধ যুবক যুবতী।
করতালি দিয়া নাচে করিয়া ভকতি॥
অর্দ্ধেক রজনী গেল এই মত করি।
তার পরে ভিক্ষা অন্ন পাকাইলা হরি॥
একজন গ্রাম্য ভক্ত ঘৃত আনি দিলা।
ঘৃত দিয়া প্রভু মোর করলা ভাজিলা॥
নিম্বস্ক্তা ঘৃত আর করলার ভাজা।
ভোগ লাগাইলা মোর নদিয়ার রাজা॥
মুষ্টিমেয় প্রসাদ পাইলা গৌরহরি।
অনন্তর বসিলাম মুহি পত্র করি॥
পত্র পূরি প্রসাদ দিলেন নরহরি।
প্রসাদ পাইয়া মুহি হাঁস ফাঁস করি॥
উদর ফুলিয়া মোর উঠিল যখন।
প্রভুর চরণে গিয়া লইনু শরণ॥
তবে প্রভু উদরেতে হাত বুলাইলা।
অমনি উদর মোর সমান হইলা॥
......করিলাম হরি হরি ধ্বনি।
চমকিয়া ভক্তগণ উঠিলা অমনি॥
পরদিন প্রাতে উঠি গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ভক্তগণে ডাকি কথা কহিলা বিস্তর॥
বিদায় মাগিলা ভক্তগণে বুঝাইয়া।
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করি চলিলা ধাইয়া॥*

মেদিনীপুরের কাছে যবে পঁহুছিলা।
এই বার্ত্তা শুনি লোক ধাইয়া আইলা॥
তার মধ্যে এক ধনী নিকটে আসিয়া।
অবাক্ হইলা প্রভুর মুরতি দেখিয়া॥
কেশব সামন্ত নাম বড় ধনী হয়।
বহু ছলা করি ধনী নানা কথা কয়॥
কখন বলিছে হাসি ওহে ন্যাসিবর।
টাকা কড়ি লহ কিছু যে চাহে অন্তর॥
কৌপীন তেজিয়া ফেলি পরহ বসন।
যুবা পুরুষের কেন সন্ন্যাস গ্রহণ॥
সুখলাভ কর যোগি ইন্দ্রিয় সেবিয়া।
মর কেন বৈরাগ্যের দাসত্ব করিয়া॥

শুনিয়া ধনীর বাণী ঈসৎ হাসিয়া।
তারে শিক্ষা দেন প্রভু বিনিয়া বিনিয়া॥
প্রভু কহে টাকা কড়ি সোণা মরকত।
মাটির বিকার সব শাস্ত্রেতে কথিত॥
মাটির বিকার সব কালে হবে মাটি।
তবে কেন অহঙ্কারে মর সবে ফাটি॥
ঈশ্বরের মায়াফাঁদে না দিও চরণ।
তা হলেই পুনঃপুনঃ হইবে মরণ॥
পুনঃপুনঃ মরিবারে চাহে যেই জন।
মায়ার বন্ধন তার না ছাড়ে কখন॥
সব ছাড়ি ভক্তিভাবে ভজ সেই জনে।
তাহলেই পরানন্দ উপজিবে মনে॥

---

* চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের পর দৃষ্ট হয় যে "তিনি প্রবল বায়ু-তাড়িত পুন্নাগ পুষ্পরেণুর ন্যায়" মহাভাব-পরিচালিত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন, নিত্যানন্দ তাঁহাকে অনুগমন করিতে পারিতেছেন না। "অহো বলবত বাতেন চালিতঃ কেশর পরাগ পুঞ্জ ইব চলত্যেষঃ। ময়াপি সত্বরেণানুগন্তুং ন শক্যতে।" (নিত্যানন্দ-বাক্য, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ৫ম অঙ্ক।) অদ্বৈত গৃহে কিছু কাল অবস্থানের পর নিত্যানন্দ প্রভৃতি পরিকরবৃন্দ কয়েক দিনের জন্য তাঁহার সঙ্গ বিচ্যুত হইয়াছিলেন "রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দ চন্দ্র। সংহতি তাঁহার সব শ্রীজগদানন্দ॥" (চৈ. ভা.) সুতরাং এই পর্য্যটনের সঙ্গী গোবিন্দদাস ভিন্ন আর কেহ সমগ্র পথ তাঁহার অনুগমন করেন নাই। মহাপ্রভু তাঁহার স্বগণবর্গের হাত এড়াইবার অতিমাত্র চেষ্টার দরুণ হয়তঃ তাঁহারা ঠিক

আমার আমার করি বেড়াও ঘুরিয়া।
জাননা যে কালমুখে আছ প্রবেশিয়া॥
দন্তে দন্তে পিসে যবে করিবে চর্ব্বণ।
সুন্দরী রমণী কতি থাকিবে তখন॥
কতি বা থাকিবে তব সোণা রূপা দানা।
কতি বা রহিবে তব ক্ষীর সর ছানা॥
এই আদরের দেহ পুড়ে ছাই হবে।
নাহি যদি পোড়ে তবে শৃগালে খাইবে॥
মাথা গড়াগড়ি যাবে মুচির বিষ্ঠায়।
ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ বৃথা কাল যায়॥
কিসের গৌরব কর অনিত্য সকল।
নিত্য বস্তু হয় কৃষ্ণ জুড়বার স্থল॥
ওহে ধনিবর শুন বচন আমার।
হীরক মৌক্তিক পান্না কর কি আহার॥
এক মুষ্টি অন্নে হয় ক্ষুধা নিবারণ।
তবে কেন অহঙ্কার কর অনুক্ষণ॥

এইরূপে ধনিজনে প্রভু শিক্ষা দিয়া।
দুই চারি বাক্য কহে মোপানে চাহিয়া॥
নারায়ণগড়পানে চল মোরা যাই।
সেইখানে গেলে যদি কোন সুখ পাই॥

এইমাত্র বলি উঠিলেন ত্বরা করি।
অমনি স্কন্ধেতে তুলি লইলাম খড়ী॥

আনন্দে মগন পথে চলে মোর গোরা।
সন্ধ্যাকালে সেই স্থানে পঁহুছিনু মোরা॥
নারগণগড়ে আছে শিব ধলেশ্বর।
তাঁর দরশনে ধায় হইয়া সত্বর॥

নারায়ণ গড়ের তেঁহ গ্রাম্যদেব হয়।
কান্দিতে লাগিল প্রভু অশ্রুধারা বয়॥
হর হর বলি প্রভু উচ্চরব করি।
আছাড় খাইয়া পড়ে ধরণী উপরি॥
প্রেমে গদ গদ হয়ে গড়াগড়ি যায়।
বসন করঙ্গ গিয়া পড়িল কোথায়॥
মহা সাত্ত্বিকের ভাব আসি উপজিল।
প্রেমে লোমকূপ দিয়া শোণিত ছুটিল॥
বহির্ব্বাস কৌপীন খসিয়া গেল কতি। *
সে ভাব হেরিতে সেথা আইলা কত যতি॥
বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারী কত ন্যাসিবর।
দেখিতে আইল সেথা নদের ঈশ্বর॥
প্রেমভাব ভক্তি দেখে আশ্চর্য্য সকলে।
দেবতা বলিয়া সবে পড়িলা ভূতলে॥
হরিধ্বনি করি প্রভু নাচিতে লাগিল।
সে বিরাট ভাব দেখি সবে শিহরিল॥
এইরূপে নৃত্য করে সবে তরুতলে।
আটা চূণা লাড্ডু আনি যোগায় সকলে॥

তাঁহাকে অনুসরণ করিতে পারেন নাই। শেষে পুরীতে আসিয়া তাঁহারা মিলিত হইয়াছিলেন। এই যে দীর্ঘপথটা পরিকরবর্গ তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারেন নাই, তৎসম্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতির উদ্ভব হইয়াছিল। অনেক পল্লীই হয়ত মহাপ্রভুর পথের দাবী করিয়া গৌরবান্বিত হইতে অগ্রসর হইয়াছিল। সুতরাং বৃন্দাবনদাস এই ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এদিকে গোবিন্দদাস চাক্ষুষ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

আর একটি কথা এই যে মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পর বাঙ্গালাদেশে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী অনেক স্থান দেখিয়া গিয়াছিলেন। জনশ্রুতিতে অনেক সময় ক্রম রক্ষিত হয় নাই। একবারের ঘটনা অন্যবারে আরোপ করা হইয়া থাকিবে।

* কতি—কোথায়।

চৈতন্য চরিতামৃত অতি সংক্ষেপে বৃন্দাবন দাসের কথার পুনরুক্তি করিয়া গিয়াছেন, এবং বৃন্দাবন দাস হইতে তিনি সে কথা গ্রহণ করিয়াছেন এই বলিয়া তৎকৃত চৈতন্য ভাগবতের উপর বরাৎ দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং চৈতন্য চরিতামৃতের কথায় কোন মৌলিকত্ব নাই।

মুহি পাপী নরাধম লাড্ডু পানে চাই।
লালসা হইল খেয়ে উদর পূরাই॥
অন্তর্যামী প্রভু মোর বুঝিয়া ইঙ্গিতে।
প্রসাদ করিয়া লাড্ডু দিলেন খাইতে॥
গণ্ডা পাঁচ লাড্ডু খেয়ে উদর পূরিল।
এক বিপ্র আনিয়া শীতল বারি দিল॥
ক্রমে গ্রাম্য লোক সব সংবাদ পাইয়া।
একে একে সেই স্থানে জুটিল আসিয়া॥
ভোগ লাগাইয়া প্রভু প্রসাদ বাঁটিল।
সবে মেলি সেই স্থানে প্রসাদ পাইল॥
প্রসাদেতে ভক্তি দেখে কতই ভাবিনু।
মুহি লোভী সর্ব্ব অগ্রে উদরে পূরিনু॥
তাই ভাবি অনুতাপ করি মনে মনে।
পাপক্ষয় লাগি ধরি প্রভুর চরণে॥
নানাবাক্যে বুঝাইয়া মাথে পদ দিল।
অমনি মনের ধন্ধা দূরে চলি গেল॥
তার পরে আবেশেতে নৃত্য আরম্ভিল।
হরিরস মদিরায় সকলে মাতিল॥
কেহ নৃত্য করে কেহ বিলুণ্ঠিত কায়।
ঐ কৃষ্ণ বলি কেহ বৃক্ষ পানে ধায়॥
ক্রমে সেই স্থানে বহু জনতা হইল।
নরনারী যুবা বৃদ্ধ সকলে ছুটিল॥
নবীন ন্যাসীর কথা শুনিয়া সকলে।
একে একে আসি বার দিলা সেই স্থলে॥
বীরেশ্বর সেন আর ভবানী শঙ্কর।
বহু লোক সঙ্গে আইল প্রভুর গোচর॥
চতুর্দ্দোলা হস্তী অশ্ব আর বহু যান।
সঙ্গে করি আইলা প্রভুর বিদ্যমান॥

ভবানী শঙ্কর হয় বড় ধনী জন।
শত শত লোক সঙ্গে করে আগমন॥
হস্তীর পৃষ্ঠেতে ডঙ্কা বিচিত্র নিশান।
চারিটা রূপার হুদ্দা চলে আগুয়ান॥ *
বিষয়ের কীট সবে মত্ত অহঙ্কারে।
তাহা হেরি দয়া হৈল প্রভুর অন্তরে॥
তাহাদের দশা হেরি দয়াল চৈতন্য।
ভক্তি দিয়া তাহাদের করিলেন ধন্য॥
ভক্তিশিক্ষা দিয়া প্রভু সকলে মাতায়।
লক্ষাধিক লোক শুনে পুতুলের প্রায়॥
দন্তে তৃণ করি প্রভু জোড় হস্তে বলে।
সামান্য বচন মোর শুনহ সকলে॥

প্রভু কহে শুন সব ধনী মহাশয়।
বেদিয়ার বাজী সম এ জগৎ হয়॥
ঘুমের আবেশে যবে চড় সিংহাসনে।
রাজা বলি তখন উদয় হয় মনে॥
কত শত পাত্র মিত্র করিছে বিচার।
লক্ষ লক্ষ প্রজা আসি দিছে উপহার॥
এ সকল কি ব্যাপার নাহি কর ধ্যান।
প্রতিচ্ছায়ার ছায়া ইহা ভাবরে অজ্ঞান॥
কৃষ্ণতত্ত্বের প্রতিচ্ছায়া জড়জগৎ হয়।
তার প্রতিবিম্ব স্বপ্ন বেদে ইহা কয়॥
দুটাই স্বপন হয় ভেবে দেখ মনে।
কেবল বিভেদ তার নিদ্রা জাগরণে॥
রাজার রাজত্ব সব জাগিয়া স্বপন।
সত্য মিথ্যা ভেবে দেখ বেদের বচন॥
স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তা মাটীর বিকার।
আদরের বস্তু কৃষ্ণ এই কথা সার॥
নিত্য বস্তু ভগবান বেদে ইহা কয়।
আর যাহা কিছু দেখ সব মিথ্যা হয়॥
জলের ভিতরে ডুবে থাকে যেইজন।
কেমনে ডাঙ্গার বস্তু করিবে দর্শন॥

চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃতে যে সকল স্থান দিয়া মহাপ্রভু গিয়াছেন লিখিত হইয়াছে সেই সকল স্থান সংশ্লিষ্ট অনেক দেবোপাখ্যান এই উপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে—কথা রেমুনায় গোপাল এবং সাক্ষী-গোপাল প্রভৃতির উপাখ্যান।

* আগুয়ান=অগ্রে অগ্রে।

জল হৈতে তারে যদি তুলি দাও তটে।
তখন ডাঙ্গার বস্তু দেখিবে নিকটে॥
সেইরূপ বিষয়েতে ডোবে যেই জন।
কেমনে সে রাধাকৃষ্ণ করিবে দর্শন॥
যাহার নয়নে মায়া ঠুলি আছে বাঁধা।
ঘানির বলদ সম সর্ব্বদা সে আঁধা॥
পর্ব্বতের গুহা মধ্যে কি আছে কে জানে।
বাহির হইতে তত্ত্ব জানিবে কেমনে॥
সেইরূপ জড়জগতের সূক্ষ্মভাব।
কার সাধ্য স্থূলভাবে করে অনুভাব॥
ঈশ্বরের মূর্ত্তি হয় অনন্ত ব্রম্ভাণ্ড।
সেই বুঝে যেই জন ত্যজে কর্ম্মকাণ্ড॥
জড়ভাব ছাড়ি যবে চৈতন্যময় হবে।
তখন কৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে॥
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা জড়ে দিলা শক্তি।
সেই দেখিবারে পায় যার আছে ভক্তি॥
জড়ে আর চেতন্যে গাঁইট লাগায়েছে।
সে খুলিতে পারে যার রজস্তম গেছে॥
জড়জগতের ভাব কে পারে বুঝিতে।
কলুর বলদ সম থাকয়ে ঘুরিতে॥
কলুর বলদ অল্প পথে ঘোরে বটে।
কিন্তু সীমা নাহি পায় পড়িয়া সঙ্কটে॥
চক্ষে ঠুলি এক পথে ঘুরে ঘুরে মরে।
সেইমত জীব ঘোরে সংসার ভিতরে॥
মায়াময় ঠুলি পরি জীব ঘুরে মরে।
এ কারণ সূক্ষ্মতত্ত্ব দেখিতে না পারে॥
পরের বিষয়ে পর রমণী তেমন।
কেমনে করিবে তবে কৃষ্ণের সাধন॥
নির্ব্বিকার-তত্ত্ব কৃষ্ণ বেদে ইহা কয়।
সবিকার চিত্তে তাঁরে ধরা নাহি যায়॥

এইরূপে নানাদেশ করি প্রভু ধন্য।
ধাইলা জলেশ্বরে দয়াল চৈতন্য॥
বিশ্বেশ্বর নামে শিব আছে জলেশ্বরে।
তাহা দেখি উছলিলা ভকতি অন্তরে॥
একই সন্ন্যাসী থাকে শিবের মন্দিরে।
তাঁহার নিয়ড়ে প্রভু গেলা ধীরে ধীরে।
ন্যাসীর সম্মুখে গিয়া প্রণাম করিলা।
প্রভুরে হেরিয়া ন্যাসী চমকি উঠিলা॥
ন্যাসী বলে কে তুমি সামান্য নর নহ।
আমার সম্মুখে কেন প্রণাম করহ।
আজি কোন পুণ্যফলে করিনু দর্শন।
তোমারে হেরিয়া মোর কাটিল বন্ধন॥
তপস্যার ফল তুমি ওহে দয়াময়।
তোমারে হেরিয়া সব পাপ হইল ক্ষয়॥
এইরূপে ন্যাসিবর প্রভুরে হেরিয়া।
প্রেমে তনু গদ গদ উঠিল কান্দিয়া॥
অমনি আমার প্রভু আকার গোপিতে।*
হরি বলি বাহু তুলে লাগিল নাচিতে॥
কৃষ্ণ বলি ঝাঁপ দিয়া কখন দৌড়ায়।
কখন পড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি যায়॥
নাম সঙ্কীর্ত্তনে বহু জনতা হইল।
জাগিয়া চৈতন্য মোর রাত্রি কাটাইল॥

পরদিন সুবর্ণরেখার ধারে গিয়া।
পুলকিত রঘুনাথ দাসেরে দেখিয়া॥
অনন্তর হরিহরপুর মোরা যাই।
সেথা গিয়া হরি নামে মাতিল নিমাই॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু অজ্ঞান হইল।
আছাড় খাইয়া তবে ভূতলে পড়িল॥
এইরূপে সেই দিন অতীত হইলা।
আনন্দে মাতিয়া প্রভু কান্দিতে লাগিলা।
তার পর দিন মোরা যাই বালেশ্বরে।
গোপালে হেরিয়া তথি আনন্দ অন্তরে॥

* গোপিতে—গুপ্ত করিতে।

পরদিন প্রাতঃকালে নীলগড় যাই।
নীলগড়ে গিয়া নামে মাতিল নিমাই।
নাচিতে নাচিতে ক্রমে অজ্ঞান হইল।
অসংখ্য দর্শকগণ আসি বার দিলা * ॥
গাইতে গাইতে নাম আনন্দ বাড়িল।
অচেতন হয়ে প্রভু ধরায় পড়িল ॥
এইরূপে ভক্তগণ একত্র হইয়া।
পরম আনন্দভোগে উঠিল মাতিয়া।

পরদিন বৈতরণী নদীতীরে গিয়া।
কৃষ্ণ পার কর বলি উঠিল কান্দিয়া ॥
প্রেমে গদ গদ তনু সর্ব্বদা উদাস।
হরি বলি চলে নাহি দেখে আশ পাশ ॥
পরদিন মহানদী পার হৈয়া যাই।
পথে গোপীনাথ দেবে দেখিবারে পাই ॥
গোপীনাথের মহাপ্রসাদ পাইনু সকলে।
প্রসাদ পাইয়া মনে আনন্দ উছলে।
অনন্তর সাক্ষী গোপাল দরশন লাগি।
চলিতে লাগিল সবে হয়ে অনুরাগী ॥
হরি বলি বাহু তুলি ধাইতে লাগিল।
অশ্রুধারা পড়ি ধরা পঙ্কিল করিল ॥
দূর হৈতে সাক্ষী গোপাল দরশন করি ॥
প্রেমে গদ গদ হোয়ে পড়য়ে বিছারি ॥ †
গোপালে দেখিয়া যেন কি মনে পড়িল।
অমনি বদন চাহি কাঁদিতে লাগিল ॥
গোপাল গোপাল বলি ডাকে বারে বারে।
কত যে প্রেমের বেগ কে কহিতে পারে।

তার পরে নিংরাজের মন্দিরে যাইয়া।
কি জানি কি ভাবে প্রভু উঠিল কান্দিয়া ॥
নিংরাজ ত্যজি যাই আটারনালায়।
ধ্বজা দেখি প্রভু মোর পড়িল ধরায় ॥
এমন অশ্রুর বেগ দেখি নাই কভু।
পঙ্কিল করিলা ধরা অশ্রুস্রোতে প্রভু ॥
হা হা প্রভু জগন্নাথ বলিয়া শ্রীহরি।
ভাসাইলা ভূমিতল অশ্রুপাত করি ॥
আছাড়ি বিছাড়ি পরে উভরায় কাঁদে।
সমুখে যাহারে দেখে বাহুপাশে ফাঁদে ॥
ঐ দেখ কৃষ্ণ মোর নাচে গোপালবেশে!
আহা মরি মত শোভা হইয়াছে কেশে ॥
প্রভুর মন্দির হেরি কাঁদে উভরায়। †
কখন আছাড় খেয়ে পড়িছে ধরায় ॥
বেগে গিয়া ধূলা পায় প্রভুর দুয়ারে।
অশ্রুস্রোতে বিষ্ণু মূর্ত্তি দেখিতে না পারে ॥
আছাড়ি বিছাড়ি চীৎকার বিলুণ্ঠন।
লক্ষ লোক আসে ভাব করিতে দর্শন ॥
বহু কষ্টে প্রেমধারা প্রভু নিবারিয়া।
মহাবিষ্ণু হেরি প্রভু উঠিল কান্দিয়া ॥
ভক্তগণ চমকিত রোদনের রোলে।
ধাইয়া গিয়া গদাধরে করিলেন কোলে ॥
গরুড়ের স্তম্ভ গিয়া আঁকড়ি ধরিলা।
কপাল কাটিয়া রক্ত বহিতে লাগিলা ॥
ইহা দেখি ধ্যানপুরী ‡ উত্তরীয় দিয়া।
প্রভুর শোণিতধারা দিলা মুছাইয়া ॥
দর্শন করিয়া গেলা মিশ্রের ভবনে।
শ্রেণীবদ্ধ আসিতে লাগিলা ভক্তগণে ॥

* বার দিলা—উপস্থিত হইলা।

† বিছারি—বিস্তৃত হইয়া।

* "শ্রীদেউল ধ্বজা মাত্র দেখিলেন দূরে। প্রবেশিলা প্রভু নিজ আনন্দ সাগরে ॥ অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুঙ্কার।" (চৈ, ভা, অন্ত্য ২য়)

† উভরায়—উচ্চৈঃস্বরে।

‡ ধ্যানপুরীর নাম অন্য কোন পুস্তকে পাওয়া যায় নাই।

এইরূপে কিছুদিন থাকিয়া পুরীতে।
নিত্য নব নব সুখ লাগিনু ভুঞ্জিতে ॥
অবধৌত কৃষ্ণদাস আর হরিদাস।
পরম আনন্দ ভুঞ্জে থাকি প্রভুর পাশ ॥
নামের ধ্বনিতে পুরী পূর্ণ আট পর *।
গড়াগড়ি দেয় সবে ভূমির উপর ॥
কেহ মালা গাঁথে কেহ ঘর্ষয়ে চন্দন।
কেহ কেহ করয়ে ভোগের আয়োজন ॥
ক্রমে সব সাঙ্গোপাঙ্গ মিলিল আসিয়া।
হইল পুরীর শোভা বৈকুণ্ঠ জিনিয়া ॥
বিপ্র কৃষ্ণদাস আর ভুঁড়ে শ্যামদাস।
দুইজনা রক্ষা করে প্রভুর দুই পাশ ॥
কখন আছাড় খায় প্রেমেতে মাতিয়া।
কখন বা সমুদ্রেতে পড়ে ঝম্প দিয়া ॥
প্রেমদাস গোপীদাস মোহান্ত ব্রাহ্মণ।
ভাগবত পাঠে করে অমৃত বর্ষণ ॥
রঘুনাথ দাস আর আচার্য্য শেখর।
দামোদর নরহরি আর গদাধর ॥
নিত্য নিত্য সবে মিলি যান শ্রীমন্দিরে।
আমার প্রভুরে সবে লয়ে যান ঘিরে ॥
মধুর মৃদঙ্গ বাজে কভু করতাল।
নামে মত্ত সদা তার নাহি কালাকাল ॥

এইরূপে প্রভু মোর মিশ্রের ভবনে।
আনন্দ করেন সদা ভক্তগণ সনে ॥
কাশীমিশ্র নিত্য আনে প্রসাদ প্রচুর।
সুগন্ধে হৃদয় হরে খাইতে মধুর।
নানাবিধ ভাজাপোড়া কতই কহিব।
কতই প্রসাদ আর উদরে পূরিব ॥
চানাভাজা চুরমারি মুদগ কলাই।
তিল তিষি গম যব বলিহারি যাই ॥

কত শত ফল মূল নারিকেল কোরা।
নিত্য হাতে তুলি দেন নদিয়ার গোরা ॥
চিনাচুর খুরমার লাড্ডু আর গজা।
আঁধসা পিষ্টক পুলি রসপূর গজা ॥
ঘৃতসিক্ত অন্ন ভৃতঘণ্ট বেতো শাক।
এ সব প্রসাদ পেয়ে নাহি সরে বাক্ ॥
অবাক্ হইয়া নিত্য পেট ভরে খাই।
তখনি উদরসাৎ যখন যা পাই ॥

এইরূপে যত দিন যাইতে লাগিল।
ক্রমে সব ভক্তগণ আসিতে লাগিল ॥
শঙ্কর ভারতী আর পরানন্দপুরী।
দামোদর স্বামী প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী ॥
চিদানন্দগিরি প্রেমানন্দ সরস্বতী।
প্রভুর নিকটে নিত্য করে গতাগতি ॥
বহুভক্ত একত্র হইয়া নীলাচলে।
ভজন করেন সবে অতি কুতূহলে ॥
এইকালে সার্ব্বভৌম আসি দেখা দিল।
সেই সঙ্গে বহু ভক্ত আসিয়া মিলিল ॥
মহাবিষ্ণু দেখিয়া প্রভুর হৈলা রতি।
পুনঃ পুনঃ করে প্রভু ভকতি প্রণতি ॥
মুরছিত হৈল প্রভু গোবিন্দ দেখিয়া।
যেন মৃতদেহ তথি রহিল পড়িয়া ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ছিলা সেই স্থানে।
কোলে তুলি লয়ে গেলা আপন ভবনে ॥
কত সেবা করিলেন প্রভুরে লইয়া।
সার্ব্বভৌমের ভক্তিরস পড়ে উছলিয়া ॥

অনন্তর সার্ব্বভৌমে ভক্তি করি দান।
দক্ষিণযাত্রার লাগি হৈলা আগুয়ান ॥
তিন মাস কাল মোর চৈতন্য গোঁসাই।
পুরীতে রহিলা সঙ্গে করিয়া নিতাই ॥

---

* অটপর — অষ্ট প্রহর।

তার পরে বৈশাখের সপ্তম দিবসে। *
দক্ষিণে করিলা যাত্রা ভাসি প্রেমরসে ॥
যাত্রার সময়ে নিতাই হইয়া চিন্তিত।
কহিতে লাগিলা বাণী ভক্তিতে বিনীত ॥
না যাহ একাকী কহে নিত্যানন্দ রায়।
সঙ্গে সঙ্গে যাই চল মোরা সম্প্রদায় ॥
বড় ব্যস্ত যাইতে প্রাণের গদাধর।
প্রেমানন্দ সরস্বতী ভারতী শঙ্কর ॥
এত শুনি প্রভু মোর ঈষৎ হাসিয়া।
বলে মুহি একা যাব সঙ্গী না লইয়া ॥
অবধৌত নিত্যানন্দ শুনিয়া বচন।
কহিতে লাগিল করি অশ্রু বরষণ ॥
দক্ষিণযাত্রায় তুমি যাবে অতিদূর।
সঙ্গে যা'ক্ কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ ঠেকুর ॥
পবিত্র হইয়া বিপ্র তাহাই করিবে।
যখন ইহারে যাহা করিতে বলিবে ॥
তোমারে ছাড়িয়া মোরা কেমনে রহিব।
তাই বলি সবে মোরা তব সঙ্গে যাব ॥
এত শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
বারণ করিলা সবে উপদেশ দিয়া ॥
সেই কথা শুনি সবে বলিতে লাগিল।
তব সঙ্গে দাস তব গোবিন্দ চলিল ॥

এত শুনি প্রভু মোর কন হাসি হাসি।
গোবিন্দের সঙ্গ আমি বড় ভালবাসি ॥
যে যাক্ সে নাহি যাক্ গোবিন্দ যাইবে।
আমার যে কার্য্য তাহা গোবিন্দ করিবে ॥
এত বলি শ্রীচৈতন্য লইয়া বিদায়।
চলিলা দক্ষিণ দিকে সব ভক্ত ধায় ॥ *

ক্রমে ক্রমে আলাল নাথের শ্রীমন্দিরে।
পৌঁছিনু মোরা সব অতি ধীরে ধীরে ॥
আলালনাথেরে হেরি ভাব উথলিল।
অশ্রুজলে সে স্থানের মাটি ভিজাইল ॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু অজ্ঞান হইয়া।
পড়িলেন ভূমিতলে আছাড় খাইয়া ॥
পরদিন প্রাতে সবে লইয়া বিদায়।
তিনজনে বাহিরিনু দক্ষিণ যাত্রায় ॥

এইকালে সার্ব্বভৌম বলে ধীরে ধীরে।
মিলিবে রায়ের সঙ্গে গোদাবরী তীরে ॥
রসজ্ঞ ভক্তের শ্রেষ্ঠ রামানন্দরায়।
কৃষ্ণ নামে সদাসিক্ত নয়ন ধারায় ॥
বিশুদ্ধ আনন্দভোগ রামরায় করে।
হরি নামে হয় তাঁর আনন্দ অন্তরে ॥

ইহা শুনি গোদাবরী তীরেতে ধাইল।
সেই স্থানে রামানন্দ আসিয়া মিলিল ॥
নবীন সন্ন্যাসী দেখি ভক্তি উপজিল।
পদধরি রামরায় কান্দিতে লাগিল ॥
রামানন্দরায় বলে তুমি ত ঈশ্বর।
দর্শন পাইনু মুহি বড় ভাগ্যধর ॥
প্রভু কহে রায় তুমি কহ কৃষ্ণ কথা।
তোমার সিদ্ধান্তে যাবে হৃদয়ের ব্যথা ॥
রায় বলে প্রভু মুঞি কিছুই না জানি।
তুমি না বলালে মোরে নাহি সরে বাণী ॥
হৃদয়ে থাকিয়া তুমি সমস্ত পড়াও।
মূকজনে কৃপা করি বাচাল করাও ॥
প্রভু কহে কোন তত্ত্বে শুদ্ধ হয় মন।
রায় বলে সেই তত্ত্ব সাধুর মিলন ॥
তাহতেও সূক্ষ্মতর চাই তব ঠাঁই।
রায় কহে ত্যাগ বিনু আর তত্ত্ব নাই ॥
প্রভু কহে সূক্ষ্ম তত্ত্ব হয় অনুরক্তি।
রায় কহে তাহ'তেও উচ্চ প্রেমভক্তি ॥

---

* "বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন।" (চৈ, চ, মধ্য, ৭ ম পঃ ৫। এথানে "বৈশাখ প্রথমে" অর্থ বৈশাখের প্রথম ভাগে।

* পুরীর বিবরণটী অতি সংক্ষিপ্ত। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্য চন্দ্রোদয় প্রভৃতি পুস্তকে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

প্রভু কহে আরো সার কহ মহামতি।
রায় কহে সর্ব্ব সার রাই রসবতী॥
রামরায় আরো সার বলিবারে চায়। *
অমনি বদন চাপি ধরে গোরারায়॥
প্রভু কহে দুগ্ধে ঘৃত আছে গুপ্ত ভাবে।
সে পাবে আস্বাদ তার যে জন মথিবে॥ †
প্রভু কহে রায় আমি কিছুই না জানি।
কহ কহ কৃষ্ণ কথা তব মুখে শুনি॥

বিরক্ত বৈষ্ণব তুমি ওহে রাম রায়।
কহ কহ কৃষ্ণ তত্ত্ব জুড়াক হৃদয়॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী রামানন্দ রায়।
দৈন্যভাবে দুটী হাত জোড় করি কয়॥
বার বার কেন ছল জগৎ ঈশ্বর।
কৃপাকরি এ দাসেরে কর অনুচর॥
দেশময় ভক্তিরস ছড়াইলে তুমি।
দয়া করি পবিত্র করিলে এই ভূমি॥
অধম জনেরে দয়া কর জগন্নাথ।
হৃদয়ে বৈরাগ্য দিয়া লহ মোরে সাথ॥

এত শুনি রায়ে প্রভু কৈলা আলিঙ্গন।
হাটু ধরি রামরায় করেন ক্রন্দন॥
অশ্রুধারে রামানন্দের ভাসিল হৃদয়।
তাহা হেরি গদ গদ স্বরে প্রভু কয়॥
বৈষ্ণবের চূড়ামণি তুমি রামরায়।
অধোমুখে রামানন্দ রাম রাম কয়॥

প্রভু কহে রায় তুহু বড় ভাগ্যবান্।
তোমার ভাগ্যের কথা না যায় বাখান॥
রায় বলে মুঞি অতি অধম পামর।
স্পর্শদোষ হইয়াছে তোমার গোচর॥
কৃপাকরি ক্ষমি মোর সেই অপরাধ।
হৃদয়ে বসিয়া করাও ভক্তির আস্বাদ॥
সে রজনী এইরূপ কথোপকথনে। *
কাটাইলা রামানন্দ গোরাচাঁদ সনে॥
পরদিন রায় প্রভুর চরণ ধরিয়া।
চলি গেলা নিজ কার্য্যে বিদায় লইয়া॥
প্রভু কহে রামানন্দ এবে আমি যাই।
নীলাচলে গিয়া তুহু থেকো মোর ঠাঁই॥ †
তুমি আমি আর ভট্ট থাকি নিরজনে।
আলোচিয়া কৃষ্ণ তত্ত্ব জুড়াব জীবনে॥

এত বলি প্রভু রায়ে দিলেন বিদায়।
প্রণমিয়া রামানন্দ গৃহে চলি যায়॥
প্রভুর সহিত রায় যতেক কহিল।
তাহার শতাংশ এহি গ্রন্থে না রহিল॥
এইরূপে রামানন্দ দশদিন আসি।
আনন্দিত হয় হেরি নদের সন্ন্যাসী॥
দেখি রামানন্দে প্রভু বড় প্রীতি পান।
প্রভুরে দেখিলে রায় হয়েন অজ্ঞান॥

---

* চৈতন্য-চরিতামৃত এই আলোচনা বিস্তৃতভাবে পাওয়া যাইবে।

† এই উপলক্ষে চৈতন্য-চরিতামৃত লিখিয়াছেন—
"সহজে চৈতন্য চরিত ঘন দুগ্ধ পূর। রামানন্দচরিত আছে খণ্ড প্রচুর॥ রাধাকৃষ্ণলীলা তাতে কর্পূর মিলন। ভাগ্যবান যেই সেই করে আস্বাদন॥"
(চৈ. চ, মধ্য ৮ম পঃ ১৯০)

* এই মতে দুই জনে কৃষ্ণ কথা বেশে।
নৃত্য গীত রোদনে হইল রাত্রি শেষে॥
(চৈ, চ, ৮ম পঃ ১৬৯)

† বিদায়ের কালে তারে এই আজ্ঞা দিল।
বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে॥
আমি তীর্থ করি তাহা আসিব অল্প কালে।
দুইজনে নীলাচলে রহিব এক সঙ্গে॥"
(চৈ, চ, ৮ম পঃ ১৮৭। ৮৮)

রায়ের নিকট হৈতে লইয়া বিদায়।
ত্রিমন্দ নগরে প্রভু প্রবেশ করয়॥ *
বহুবৌদ্ধ বাস করে ত্রিমন্দ নগরে।
আসিয়া মিলিল সবে গৌরাঙ্গসুন্দরে॥
বৌদ্ধগণ সহ প্রভু বিচার করিলা।
ত্রিমন্দের রাজা আসি মধ্যস্থ হইলা॥
বৌদ্ধগণ বিচারেতে পরাস্ত মানিল।
পণ্ডিত দর্শক সবে হাসিতে লাগিল॥
সবে বলে এ সন্ন্যাসী মানুষ ত নয়।
যে বিচার কৈল তাহা কহনে না যায়॥
বৌদ্ধগণের পতি রামগিরি রায়।
প্রণমিয়া বলে পথ দেখাও আমায়॥
তুমি ত মানুষ নহ নবীন সন্ন্যাসী।
থাকিতে তোমার সহ বড় ভালবাসি॥
পাষণ্ডের শিরোমণি ছিলাম সংসারে।
কৃপাকরি ভক্তিমার্গ দেখাও আমারে॥

হাসিয়া চৈতন্য প্রভু কৃপা করি কয়।
মাথার ঠাকুর তুমি রামগিরি রায়॥
হরি বলি পুলকিত হয় যেই জন।
মাথার ঠাকুর সেই এই ত সাধন॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী রামগিরি রায়।
অমনি আছাড় খেয়ে পড়িল ধরায়॥
পড়িয়া চরণ তলে রামগিরি কয়।
নরাধমে কি বলিলে তুমি দয়াময়॥

সর্ব্বজীবে থাকি তুমি দেখিছ সকল।
কৃপা করি রাঙ্গাপায় দেহ মোরে স্থল॥
রামগিরি পাষণ্ডের ভক্তি উপজিল।
ইহা হেরি প্রভু মোর আনন্দে পূরিল॥
পণ্ডিতের শিরোমণি যত বৌদ্ধগণ।
রামগিরি পথে সবে করিলা গমন॥
নবীন সন্ন্যাসী করে বাদীর নিরাশ।
ইহা হেরি রামানন্দ চাহে চারি পাশ॥

বিচার করিতে শেষে হয়ে অভিলাষী।
ঢুণ্ঢিরামতীর্থ আসে তুঙ্গভদ্রাবাসী॥
অহঙ্কারে সদামত্ত পণ্ডিতাভিমানী।
নাহি বুঝে ভক্তিমার্গ শুষ্কতর্কে জ্ঞানী॥
বড়ই পণ্ডিত বটে ঢুণ্ঢিরাম হয়।
বিচার করিতে কিন্তু পায় বড় ভয়॥
ঢুণ্ঢিরাম স্বামী গিয়া করিতে বিচার।
অশ্রুফেলি ধরণী লোটায় বার বার॥
প্রভু কহে শুন শুন ঢুণ্ঢিরাম স্বামী।
তোমার সহিত তর্কে হারিলাম আমি॥
জয় পত্র লিখে আমি দেই সঙ্গোপনে।
হারিল চৈতন্য এবে তোমার সদনে॥
বাণীর কৃপায় তুমি পণ্ডিত গোঁসাই।
কার সাধ্য তর্ক শাস্ত্রে জিনে তব ঠাঁই॥
ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল বেদান্ত দর্শন।
সর্ব্ব শাস্ত্রে অধিকারী তুমি গো সুজন॥
মূরখ সন্ন্যাসী মুহি কিছু নাহি জানি।
বার বার তোমার নিকটে হারি মানি॥
আগেকার ঢুণ্টি * হতে তুমি সুপণ্ডিত।
তোমার পাণ্ডিত্য হয় ভুবনে বিদিত॥

এত বলি ঢুণ্ঢিরাম করিলা বিদায়।
যাইতে না চায় ঢুণ্টি চারিদিকে চায়॥

---

* দক্ষিণের যে বিবরণ কবিরাজ গোস্বামী দিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। পুরী ও গোদাবরী তীর পর্য্যন্ত ঘটনা তিনি পার্শ্বচরদিগের নিকট শুনিয়াছিলেন। রামানন্দের সঙ্গের বিচার তিনি দামোদর স্বরূপের করচা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (চৈ,চ, ৮ম পঃ ১৯৩) কিন্তু দক্ষিণাপথ ভ্রমণ সম্বন্ধে "কহিতে না পারি কথা যথা অনুক্রম।" (চৈ, চ, মধ্য ১২ পঃ ৪) বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে ত্রিমন্দ স্থলে ত্রিমল্ল।

* "ঢুণ্টি" সম্ভবতঃ নাম নহে—উপাধি।

ইতি উতি চেয়ে ঢুণ্টি প্রভুর চরণে।
লোটাইয়া পড়িলেক অতি শুদ্ধ মনে॥

পাষণ্ড ঢুণ্টিরে ভক্তি বিতরণ করি।
পন্থ-গুহা যাত্রা করে স্মরিয়া শ্রীহরি॥
ঢুণ্টিরাম হরিদাস নামে খ্যাত হয়।
কানাকানি পাষণ্ডেরা কত কথা কয়॥
আমারে ডাকিলা প্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
স্কন্ধেতে লইনু তুলে দুইটি খড়িয়া॥
খড়ুম করঙ্গা আদি সম্বল যা ছিল।
লইনু সংগ্রহ করি রায় যাহা দিল॥

অক্ষয় নামেতে বট বহু দূরে ছিল।
সন্ধ্যাকালে সেই স্থানে প্রভু উত্তরিল॥
বটেশ্বর নামে শিব আছেন তথায়।
ভক্তি করি সেই খানে গোরাচাঁদ ধায়॥
ভক্তিসহ বটেশ্বর প্রভু প্রণমিলা।
অনাহারে সেই থানে রজনী যাপিলা॥
প্রভাতে যাইলা প্রভু স্নান করিবারে।
ভিক্ষা করিবারে মুই ফিরি দ্বারে দ্বারে॥
ভিক্ষামাগি আইলাম মধ্যাহ্ন সময়ে।
পাক করি সেবা করে মোর গোরা রায়ে॥

প্রসাদ পাইনু মুহি অমৃত সমান।
হেনকালে আইলা সেথা তীর্থ ধনবান্॥
দুইজন বেশ্যা সঙ্গে আইলা দেখিতে।
সন্ন্যাসীর ভারি ভুরি পরীক্ষা করিতে॥
সত্যবাই লক্ষ্মীবাই নামে বেশ্যাদ্বয়।
প্রভুর নিকটে আসি কত কথা কয়॥

ধনীর শিক্ষায় সেই বেশ্যা দুই জন।
প্রভুরে বুঝিতে বহু করে আয়োজন॥

তীর্থরাম মনে মনে নানা কথা বলে।
সন্ন্যাসীর তেজ এবে হরে সব ছলে॥*
কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবালা হাসে।
সত্যবালা হাসি মুখে বসে প্রভু পাশে॥
কাঁচলি খুলিয়া সত্য দেখাইলা স্তন।
সত্যরে করিলা প্রভু মাতৃ সম্বোধন॥
থর থরি কাঁপে সত্য প্রভুর বচনে।
ইহা দেখি লক্ষ্মী বড় ভয় পায় মনে॥
কিছুই বিকার নাহি প্রভুর মনেতে।
দেখে গিয়া সত্যবালা পড়ে চরনেতে॥
কেন অপরাধী কর আমারে জননি।
এইমাত্র বলি প্রভু পড়িলা ধরণী॥
খসিল জটার ভার ধূলায় ধূসর।
অনুরাগে থর থর কাঁপে কলেবর॥
সব এলো থেলো হলো প্রভুর আমার।
কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্য নাহি দেখি আর॥
নাচিতে লাগিলা প্রভু বলি হরি হরি।
লোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দর দরি॥
গিয়াছে কৌপীন খসি কোথা বহির্বাস।
উলাঙ্গ হইয়া নাচে ঘন বহে শ্বাস॥
আছাড়িয়া পড়ে নাহি মানে কাঁটা খোঁচা।
ছিড়ে গেল কণ্ঠ হ'তে মালিকার গোছা॥
না খাইয়া অস্থিচর্ম্ম হইয়াছে সার।
ক্ষীণ অঙ্গে বহিতেছে শোণিতের ধার॥
হরি নামে মত্ত হয়ে নাচে গোরা রায়।
অঙ্গ হতে অদভুত তেজ বাহিরায়॥
ইহা দেখি সেই ধনী মনে চমকিল।
চরণতলেতে পড়ি আশ্রয় লইল॥

---

* 'ছল' শব্দটি করচায় নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে ইহার অর্থ কৌশল। কিন্তু "গৃহ বিচ্ছেদের ছলা হৈল ভাগ্য ক্রমে।" প্রভৃতি স্থানের অর্থ ভিন্ন রূপ।

চরণে বলেন তারে নাহি বাহ্যজ্ঞান।
হরি ব'লে বাহুতুলে নাচে আগুয়ান্॥
সত্যরে বাহুতে ছাঁদি বলে বল হরি।
হরি বল প্রাণেশ্বর মুকুন্দ মুরারি॥
কোথা প্রভু কোথায় বা মুকুন্দ মুরারি।
অজ্ঞান হইলা সবে এই ভাব হেরি॥

হরি নামে মত্ত প্রভু নাহি বাহ্য জ্ঞান।
ঘাড়ি ভেঙ্গে পড়িতেছে আকুল পরাণ॥
মুখে লালা অঙ্গে ধুলা নাহিক বসন।
কণ্টকিত কলেবর মুদিত নয়ন॥
ভাব দেখি যত বৌদ্ধ বলে হরি হরি।
শুনিয়া গোরার চক্ষে বহে অশ্রুবারি॥

পিচকিরি সম অশ্রু বহিতে লাগিল। *
ইহা দেখি তীর্থরাম কাঁদিয়া উঠিল॥
বড়ই পাষণ্ড মুহি বলে তীর্থরাম।
কৃপা করি দেহ মোরে প্রভু হরি নাম॥
তীর্থরাম পাষণ্ডেরে করি আলিঙ্গন।
প্রভু বলে তীর্থরাম তুমি সাধুজন॥
পবিত্র হইনু আমি পরশি তোমারে।
"তুমি ত প্রধান ভক্ত" কহে বারে বারে॥

তীর্থরাম ধনী তবে চরণে পড়িয়া।
আকুল হইল কত কান্দিয়া কান্দিয়া॥
কান্দিতে কান্দিতে যবে ভক্তি উপজিল।
অমনি ধরিয়া হাত প্রভু আলিঙ্গিল॥
প্রভু কহে তৃণসম গণহ বৈভবে।
ভক্তিধন অমূল্য রতন পাবে তবে॥
দূরেতে নিক্ষেপ কর বসন ভূষণ।
ছাড়িয়া অনিত্য ধনে ভজ নিত্য ধন॥

বার বার যাতায়াতে পাইবে যন্ত্রণা।
নিষ্কাম জনের হয় এই ত মন্ত্রণা॥
এই যে সাধের দেহ ঢাকা চর্ম্ম দিয়া।
কিছুদিন পরে ইহা যাইবে পচিয়া॥
দেহ হতে প্রাণ পাখী উড়ে যাবে যবে।
হয় কীট নয় ভস্ম নয় বিষ্ঠা হবে॥
গৌরবের ধন কিছু নাহি ত্রিভুবনে।
কেবল গৌবব আছে ঈশ্বর ভজনে॥
বিলাস বৈভব সব অনিত্য জানিয়া।
একে একে ফেলে দাও দূরেতে টানিয়া॥
ঈশ্বরের বিশ্বাস ঈশ্বর আনিয়া মিলায়।
আর কিছু প্রমাণ ত কহেন না যায়॥
অসংখ্য জগৎ হয় প্রমাণের ঠাঁই।
প্রমাণ নাহিক চাহে পণ্ডিত গোঁসাই॥
নাহি প্রয়োজন বহু বাদ বিতাণ্ডয়।
কৃষ্ণ আনি সাধকের বিশ্বাসে মিলায়॥
বহুশাস্ত্র আলাপনে কিবা প্রয়োজন।
বিশ্বাস করিয়া কৃষ্ণ করহ ভজন॥
অর্থের গৌরব যেই করে বার বার।
দিন দিন তার দুঃখ হয় অনিবার॥
সম্ভ্রম লাগিয়া করে গৌরব যে জন।
বল তার দুঃখ কেবা করে নিবারণ॥
এ আমার আমি তার সবে এই কয়।
মুদিলে নয়ন দুটি কেহ কার নয়॥
মিছামিছি আত্মীয়তা করে সব লোক।
ভাঙ্গা পুতুলের ন্যায় মৃতদেহে শোক॥

পুত্র হয় পিতার আত্মজ সবে জানে।
দুই চিত্ত এক বলি বেদে না বাখানে॥
ছাড়িলে পুত্রের দেহ তাহার জীবন।
তাহে নাহি সিদ্ধ হয় পিতার মরণ॥
জননীর দেহ হতে পুত্র জন্ম লয়।
কিন্তু দুহে এক নহে জানিহ নিশ্চয়॥

* "পিচকারির ধারা যেন অশ্রু নয়নে" (চৈ, চ। ১১ শ পঃ ১১১, মধ্য)।

কেহ কারু নহে এই প্রমেয়ের ধারা।
না হয় করিতে সিদ্ধ প্রমাণের দ্বার॥
ঈশ্বর প্রমেয় হন তাহার প্রমাণ।
মনুষ্য হৃদয় মাঝে আছে বিদ্যমান॥
দূর হতে দূরে তিনি মূঢ়জনে জানে।
অত্যন্ত নিকটে তেঁহ জ্ঞানী ইহা মানে॥
সার তত্ত্ব কহিলাম বেদের বাখান।
মূর্খলোকে ইহার না রাখয়ে সন্ধান॥
এই সব সত্য তত্ত্ব জানে যেই জন।
পুনঃ পুনঃ সে জনার না হয় মরণ॥

প্রভুমুখে এহ সব শুনি তীর্থরাম।
বিষয়ে আসক্তি ছাড়ি করে হরিনাম॥
হরি সংকীর্ত্তনে প্রভু মাতিয়া উঠিল।
ক্রমে তার সঙ্গিগণ আসিয়া জুটিল॥
ধনিজন তীর্থরাম পড়িলা বিপাকে।
ইহা বলি পাষণ্ডেরা কত কথা তাকে॥

তীর্থরাম তৃণসম বিষম ছাড়িয়া।
হরি বলি নাচে দুই বাহু পশারিয়া॥
সর্ব্বাঙ্গে তিলক ধরে পরণে কৌপীন।
ভক্তিতে করিলা তারে অতি দীন হীন॥

এই কথা কাণে শুনি তাহার রমণী।
কাঁদিতে কাঁদিতে ধেয়ে আইলা অমনি॥
তীর্থের চরণ ধরি কাঁদিতে লাগিল।
তীর্থরাম তার কথা কাণে না শুনিল॥
কমল কুমারী নাম বড়ই সুন্দরী।
তার রূপে চারিদিক দিলা আলা করি॥

কমলে বলিলা তীর্থ কর ধরি করে।
বিষয় সম্পত্তি সব দিলাম তোমারে॥
নরক হইতে ত্রাণ পাইয়াছি আমি।
বিষয় বৈভব সব ভোগ কর তুমি॥

এই কথা কাণে শুনি কমলকুমারী।
আছাড় খাইয়া পড়ে পৃথিবী উপরি॥

কমলের মায়াজাল দেখে তীর্থরাম।
ঈষৎ হাসিয়া বলে কর হরি নাম॥
কাঁদিতে কাঁদিতে তবে কমলকুমারী।
ফিরে গেল তীর্থ হলো পথের ভিকারী॥

উদ্ধারিয়া তীর্থরামে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ছাড়িলেন তবে প্রভু সিদ্ধ বটেশ্বর॥
কত লোক কত বস্ত্র আনি জুটাইল।
কিন্তু এক খণ্ড প্রভু হাতে না ছুইল॥
গোবিন্দ বলিয়া প্রভু ডাক দিয়া শেষে।
চাপড় মারিলা এক মোর পৃষ্ঠ দেশে॥

সাত দিন গোঁয়াইনু এই বটেশ্বরে।
নন্দীশ্বরে যাই চল দর্শনের তরে॥
এই কথা শুনি কাঁধে লইলাম খড়ি।
চলিলাম প্রভু সনে বটেশ্বর ছাড়ি॥
পথে যেতে যেতে এক বিশাল জঙ্গল।
দেখিয়া আমার মন হইল বিকল॥
দশক্রোশ ব্যাপিয়া সে জঙ্গল বিথার।
উপজিল ভাবনা কেমনে হব পার॥
অন্তর্যামী প্রভু মোর ঈষৎ হাসিয়া।
আগে চলি গেলা মুহি থাকিনু হঠিয়া॥
প্রভুর পেছনে মুড়ি পথ বাহি যাই।
তাঁহার ইচ্ছায় কোন ভয় নাহি পাই॥
তার মধ্যে কত জন্তু বাসা করি আছে।
একটিও দেখা নাহি দিল আগু পাছে॥

জঙ্গল পার হৈয়া মুন্না নগরের পাশে।
বৃক্ষতলে বসিলেন বিশ্রামের আশে॥
মুন্নাবাসী দুই জন গৃহস্থ আসিয়া।
আটা আনি যোগাইল যতন করিয়া॥

ভাল মন্দ কোন কথা প্রভু না কহিলা।
ক্রমে তারা দুইজন নিকটে বসিলা॥
নবীন সন্ন্যাসী হেরি তারা দুই জন।
এক দৃষ্টে চেয়ে আছে না পড়ে নয়ন॥
ক্রমে বড় গোলমাল হল সন্ধ্যাকালে।
দেখিতে নগরবাসী আসে পালে পালে॥
আগুনের মত তেজ প্রভু অঙ্গে বহে।
ইহা দেখি স্তব্ধ হয়ে সব লোক রহে॥

ক্রমে ক্রমে আগুয়ান হয়ে মুন্নাবাসী
একে একে প্রণাম করিল সবে আসি॥
ভক্তিভাবে সব লোক কহিতে লাগিলা।
চলহ নগরমধ্যে ছাড়ি গাছ তলা॥
প্রেমে মত্ত মোর প্রভু নাহি শুনে কথা।
অন্তরেতে হরি বলি কাঁদিছে সর্ব্বথা॥
ক্রমে ক্রমে অন্তরেতে ভাব উপজিল।
অমনি উঠিয়া প্রভু নাচিতে লাগিল॥
আছাড় খাইয়া পড়ে হরি হায় বলি।
সেই সঙ্গে গ্রাম্য লোক হৈল কুতুহলী॥
করতালি দিয়া সবে নাচিতে লাগিল।
তাহা হেরি প্রভু মোর কান্দিয়া উঠিল॥
যে পাষণ্ড এই ভাব দেখেছে নয়নে।
ভক্তি উছলিয়া তার পড়িয়াছে মনে॥

এইরূপে অর্দ্ধেক রজনী গেলা চলি।
নাচিতেছে সব লোক হরি হরি বলি॥
অবশেষে কুল হতে কুলবধূগণে।
গৌরাঙ্গ দেখিতে আসি মিলে সেই স্থানে
দেখিয়া নয়ন মেলি গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
নারীগণ যাইতে না পারে ফিরে ঘরে॥
মুখ তাকাতাকি করি এ বলে উহারে।
সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রাণ আকু বাবু করে॥
এমন সুন্দর দিদি কভু দেখি নাই।
ইহাকেই বলে সবে চৈতন্য গোঁসাই॥

আহা মরি না খাইয়া অস্থি চর্ম্ম সার।
এ বয়সে বাঁধিয়াছে কেন জটা ভার॥

এই কথা বলি যত মুন্নাবাসী নারী।
কাঁদিয়া আকুল হৈল চক্ষে বহে বারি॥
এইভাবে রাত্রি গেল নিদ্রা না আইল।
প্রাতে উঠি প্রভু মোর দক্ষিণে চলিল॥
ঝাঁকি বাঁধি মুন্নাবাসী থাকিতে কহিল।
প্রভু মোর কোন উপরোধ না শুনিল॥

তথাকার একজন অতি দুঃখী নারী।
সেই বৃক্ষতলে কান্দে চক্ষে বহে বারি॥
যবে যাত্রা করে প্রভু যাইবার তরে।
সেই বৃদ্ধা কেঁদে অন্ন বস্ত্র ভিক্ষা করে॥
পহিরণে ছিন্ন বাস পেটে অন্ন নাই।
তারে দেখি দাঁড়াইলা চৈতন্য গোঁসাই॥
তার ভাব দেখে প্রভু মনেতে বুঝিয়া।
ইতি উতি ভিক্ষা মাগে ঈষৎ হাসিয়া॥

বলে মোরে ভিক্ষা দেহ মুন্নাবাসী ভাই।
অন্ন বস্ত্র ভিক্ষা পেলে তবে চলে যাই॥
মুন্নাবাসী নর নারী আনন্দে ভাসিয়া
রাশি রাশি অন্ন বস্ত্র দিলেক আনিয়া॥
সবে বলে পথের সম্বল তরে চায়।
এ কারণ রাশি রাশি আনিয়া যোগায়॥
সকলে ব্যাকুল বস্ত্র প্রভু হস্তে দিতে।
গণ্ডগোল দেখি প্রভু লাগিলা হাসিতে॥
সবে বলে বসনের তুল্য মুল্য নাই।
আগে মোর বস্ত্র লবে চৈতন্য গোঁসাই॥
প্রভুর মনের ভাব কেহ নাহি জানে।
তাই সবে ব্যস্ত হয়ে অন্ন বস্ত্র আনে॥

প্রভু কেহ শুন শুন মুন্নাবাসিগণ।
তোমাদের ভিক্ষা আমি করিমু গ্রহণ॥

বৃক্ষতলে এই যে দুঃখিনী বসে আছে।
এই সব অন্ন বস্ত্র দেহ ওর কাছে॥
দয়া দেখে লোক সব আশ্চর্য্য হইল।
কেহ বলে বৃদ্ধালাগি ভিক্ষা মাগি নিল

এত বলি প্রভু মোর বহির্বাস পরি।
যাত্রা করিলেন মুখে বলি হরি হরি॥
ইঙ্গিত করিলা প্রভু মোর পানে চাই।
করঙ্গা খড়ম লয়ে পিছে পিছে যাই॥
বহুতর লোক সঙ্গে চলিতে লাগিল।
তাহে প্রভু একবার ফিরে না চাহিল॥
একে একে সব লোক ফিরিয়া চলিল।
রামানন্দ স্বামী তাঁর সঙ্গ না ছাড়িল॥
বড় সদাচার হয় রামানন্দ স্বামী।
গোপনেতে তার তত্ত্ব পুছিলাম আমি॥
রামানন্দ বলে ভাই প্রভুরে দেখিয়া।
আমার কঠিন মন গিয়াছে গলিয়া॥
যদি প্রভু শিষ্য নাহি করেন আমায়ে।
তখনি ত্যজিব প্রাণ না রব সংসারে॥

তার পর প্রভু মোর বেঙ্কট নগরে।
উপনীত হৈল গিয়া দিবা দ্বিপ্রহরে॥
সেই খানে ছিল এক পণ্ডিত গোঁসাই।
বেদান্তে পণ্ডিত বড় তুল্য তার নাই॥
বিচার করিতে চাহে পণ্ডিতপ্রবর
হারিলাম বলি প্রভু করয়ে উত্তর॥
তথাপি না ছাড়ে স্বামী বিচার করিতে।
বদন বিকাসি প্রভু লাগিলা হাসিতে॥
অদ্বৈতবাদের কথা স্বামী যত কয়।
দ্বৈতাদ্বৈত বাদ তুলি চৈতন্য বুঝায়॥
অবশেষে ঘোরতর বিচার বাধিল।
ক্রমে ক্রমে দণ্ডিস্বামী হারি মানি নিল॥

রামানন্দ নাম তার বড়ই পণ্ডিত।
হরিনামে রামানন্দ হইলা দীক্ষিত॥
হরিনাম সুধা কর্ণে দিলেন ঢালিয়া।
পড়িল স্বামীর মনে ভক্তি উছলিয়া॥
রামানন্দ স্বামী তবে প্রণাম করিয়া।
প্রভুর আজ্ঞায় মঠে গেলেন ফিরিয়া॥
সকল শিষ্যেরে স্বামী হরিনাম দিলা।
ভক্তিরসে মন তাঁর মাতিয়া উঠিলা॥
তিন দিন থাকি প্রভু বেঙ্কট নগরে।
অকপটে হরিনাম দেন ঘরে ঘরে॥
কিবা নর কিবা নারী মাতিল সবাই।
সেই সঙ্গে নাচে মোর চৈতন্য গোঁসাই॥
মাতিল নগর পল্লী বালক বালিকা।
কত লোক আসে যায় কে করে তালিকা॥
ভক্তি তত্ত্ব উপদেশ দেন সর্ব্বজনে।
......মূঢ় যত লুটায় চরণে॥
পাষণ্ড দেখিতে প্রভু আগে দেন কোল।
কোল দিয়া তারে কন হরি হরি বোল॥

পন্থভীল নামে তথা এক দস্যু ছিল।
এই বাক্য শুনি প্রভু তথায় চলিল॥
সবলোক বলে সাধু না যাহ তথায়।
যদি পন্থভীল বধ করে হে তোমায়॥
পাপাচার পন্থভীল নাহি কোন জ্ঞান।
আপনারে পেয়ে পাছে একে করে আন॥
না শুনিলা কারো কথা চেতন্য গোঁসাই
ধাইল বগুলা পানে পন্থভীল ঠাঁই॥

বগুলা নামেতে বনে পন্থভীল থাকে
পথিক জনেরে পেলে ফেলায় বিপাকে॥
বাধা সাধা নাহি মানি ভয়ঙ্কর বনে।
কৌতুক দেখিতে প্রভু চলিলা সেখানে॥
করঙ্গ লইয়া আমি পেছু পেছু যাই।
কিছু না বলিল মোরে চৈতন্য গোঁসাই॥
প্রভুরে পাইয়া পন্থ আতিথ্য করিল
সেই খানে মহাপ্রভু ত্রিরাত্রি রহিল॥

প্রভু বলে পন্থ তুমি সাধু মহাশয়।
তোমারে দেখিয়া সব পাপ হৈল ক্ষয়॥
গৃহস্থের ন্যায় তুমি নহ গৃহবাসী।
তুমিত পরম সাধু বিরক্ত সন্ন্যাসী॥
বিষয়ের কীট নহ গৃহস্থের ন্যায়।
যাতে তাতে তুষ্ট দেখি তোমার হৃদয়॥
পুত্র নাই কন্যা নাই নাহি তব জায়া।
বিষয়েতে মত্ত নহ নাহি কোন মায়া॥
ধন্য পন্থরাজ তুমি সাধু শিরোমণি।
তোমারে দেখিয়া সুখী হইল পরাণি॥
তৃণ তুল্য জ্ঞান করি বিষয় বিভব।
এখনি ত্যজিতে পার যত আছে সব॥
রমণীর সঙ্গে তুমি নাহি কর বাস।
তাই আইলাম এথা মিটাইতে আশ॥
শিষ্যগণে থাক তুমি সদাই বেষ্টিত।
তোমাকে দেখিলে চিত্ত পুলকিত॥
মায়ামোহে বদ্ধ তুমি নহ সদাশয়।
তুমিই সাধুর শ্রেষ্ঠ এই মন লয়॥

নীরবে শুনিয়া ভীল প্রভুর বচন।
ভক্তিভাবে প্রণাম করিলা সেইক্ষণ॥
প্রভুমুখে হরিনাম শুনি বার বার।
উছলিল তার মনে ভক্তি পারাবার॥
লোটায়ে পড়িল ভীল প্রভুর চরণে।
কোলে করি প্রভু নাম দিলেন শ্রবণে॥
হরিনামে মত্ত হয়ে যত দস্যুগণে।
সেই বনে করিলেন আনন্দ কানন॥
সেই দিন হৈতে পন্থ পরিল কৌপীন।
হইল সাধুর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেতে প্রবীণ॥
পাপ কর্ম্ম ছাড়ি পন্থ প্রভুর কৃপায়।
হরিনাম করি সদা নাচিয়া বেড়ায়॥
লইতে হরির নাম অশ্রু পড়ে আসি।
আনন্দে মাতিল সেই নবীন সন্ন্যাসী॥

যত দস্যু ছিল বনে সকলে মিলিয়া।
হরি হরি ধ্বনি করে কুকর্ম্ম ছাড়িয়া॥
সবে মিলি সেই বনে আনন্দে মাতিল।
প্রভু লাগি পাপ কর্ম্ম সকলে ছাড়িল॥

পন্থভীলে এইরূপে পবিত্র করিয়া।
চলে মোর ধর্ম্মবীর আনন্দে ভাসিয়া॥
অনাহারে শীর্ণ দেহ চলিতে না পারে।
তবু প্রভু হরিনাম দেন ঘরে ঘরে॥
সে দেশের লোক সব করে কাঁই মাই।
তথাপি বিলান নাম চৈতন্য গোঁসাই॥
কোন অভিলাষ নাই আমার প্রভুর।
যখন যেখানে যান সামগ্রী প্রচুর॥
যেই জন প্রভুরে দেখয়ে একবার।
চলিয়া যাবার শক্তি না হয় তাহার॥
এমনি প্রভুর শক্তি কি কহিব আর।
ভক্তিসাগরের বাঁধ কাটিল আবার॥
উথলিয়া ভক্তিসিন্ধু ডুবাইল দেশ।
কেহ বা সন্ন্যাসী কেহ হৈলা দরবেশ॥
বিরক্ত বৈষ্ণব কেহ হৈলা সেইখানে।
আউল বাউল হয়ে নাচিছে প্রাঙ্গণে॥
এই ভাবে নামে মত্ত হয়ে প্রভু মোর।
গড়াগড়ি দেন ভূমে হইয়া বিভোর॥
জড় সম কখন থাকে না বাহ্য জ্ঞান।
পুলকিত কলেবর কদম্ব সমান॥
আধ নিমীলিত চক্ষুঃ যেন মৃতদেহ।
এমন আশ্চর্য্য ভাব না দেখেছে কেহ॥
কাঁটা খোঁচা নাহি মানে পড়ে আছাড়িয়া।
কি ভাবে কখন মত্ত না পাই ভাবিয়া॥
ত্রিরাত্রি চলিয়া গেল বৃক্ষের তলায়।
অনাহারে উপবাসে কিছু নাহি খায়॥
বহিছে হৃদয়ে দর্ দর্ অশ্রু ধারা।
শত ডাকে কথা নাই পাগলের পারা॥

কভু গড়াগড়ি দেন উলাঙ্গ হইয়া।
কোলে তুলি লহি মুছি যতন করিয়া॥

চতুর্থ দিবসে এক রমণী আসিয়া।
আতিথ্য করিলা তবে আটা চূর্ণা দিয়া॥
আর এক বৃদ্ধ নারী দুগ্ধ আনি দিল।
আটা দুধে গুলি প্রভু ভোগ লাগাইল॥
তথা হৈতে তিনক্রোশ আছয়ে মন্দির।
গিরীশ্বর নামে লিঙ্গ স্থাপিত বিধির॥
লোকে বলে বিশ্বকর্ম্মা মন্দির গঠিল।
পিতামহ নিজ হস্তে শিব আরাধিল॥
বড় এক বিল্ববৃক্ষ আছে সেইখানে।
পোয়াপথ জুড়িয়াছে শাখার বিতানে॥
ফল নাহি ধরে বৃক্ষে শুনি এই বাণী।
হেরিলাম তথা গিয়া অশ্চর্য্য কাহিনী॥
মন্দিরের তিন ভিত পর্ব্বতে বেষ্টিত।
দক্ষিণ ভাগেতে বিল্ববৃক্ষ বিরাজিত॥
নিজ হস্তে বিল্বদল তুলি প্রভু মোর।
অঞ্জলি দিলেন শিবে প্রেমেতে বিভোর॥
তার পরে প্রেমে মত্ত হয়ে গোরারায়।
আছাড়িয়া বিছাড়িয়া পড়িলা ধরায়॥

কভু হাসি কভু কান্না পাগলের মত।
দরদরে অশ্রু হৃদে পড়ে অবিরত॥
রোমাঞ্চিত কলেবর যেন জড় প্রায়।
আশ্চর্য্য প্রেমের ভাব কহনে না যায়॥
কোন ইচ্ছা নাই প্রভু মত্ত হরি নামে।
কাটিল দিনেক দুই সেই শৈবধামে॥
তৃতীয় দিবসে এক জটিল সন্ন্যাসী।
পর্ব্বত শিখর হতে দেখা দিলা আসি॥
মৌন ব্রতধারী সেই সন্ন্যাসী-প্রবর।
পূজা করি চলি গেলা পর্ব্বতশিখর॥
কিছু নাহি অঙ্গে তাঁর একলি সন্ন্যাসী।
তাঁহারে হেরিলে হয় বিষয়ী উদাসী॥

চেতনা পাইলে প্রভু সন্ন্যাসীর কথা।
একে একে কহিলাম সব যথা যথা॥

শুনিয়া ন্যাসীর কথা মোর গোরা রায়।
ধাইল পর্ব্বতপানে দেখিতে তাঁহায়॥
পেছনে পেছনে ধাই আশ্চর্য্য হইয়া।
ক্রমে উপনীত মোরা সেইখানে গিয়া॥
পর্ব্বত উপরে উঠি দেখিবারে পাই।
এক বৃক্ষতলে সেই সন্ন্যাসী গোঁসাই॥
বস্ত্র নাই পাত্র নাই কিছু নাহি কাছে।
দাণ্ডাইয়া থাকিলাম চৈতন্যের পাছে॥
ধ্যানে মগ্ন ন্যাসিবর নাহি বাহ্য জ্ঞান।
যে দেখে তাঁহারে সেই হয় পুণ্যবান্॥

বিনয় করিয়া কত কহে গোরা রায়।
তবু নাহি সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হয়॥
যোড়হাতে প্রভু তবে স্তব আরম্ভিল।
তাহাতে সন্ন্যাসিবর চাহিতে লাগিল॥

প্রভুরে দেখিয়া সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর।
হাসিয়া উঠিল মনে আনন্দ প্রচুর॥
কিজানি কিসের লাগি সন্ন্যাসী হাসিল।
ক্রমে প্রভু সন্ন্যাসীর পাশেতে বসিল॥
মিলিল তথার দুই বিরক্ত সন্ন্যাসী।
আতিথ্য লাগিয়া ন্যাসী হৈলা অভিলাষী॥
পরটা নামেতে ফল আনি যোগাইল।
তার দুই ফল প্রভু গ্রহণ করিল॥
মোরে দিলা চারি ফল করিতে ভক্ষণ।
প্রসাদ নহিলে মুঞি না করি গ্রহণ॥

এত শুনি-প্রভু মোর চৈতন্য গোঁসাই।
প্রসাদ করিয়া ফল দিলা মোর ঠাঁই॥
বড় মিষ্ট সুধাসম পরটার ফল।
ফল খেয়ে চিত্ত মোর হইল চঞ্চল॥

লোভ করি কতবার এ পাপ নয়ন
প্রভুর ফলের পানে চাহে অনুক্ষণ ॥
গৌরাঙ্গ সুন্দর তাহে ঈষৎ হাসিয়া।
নিজ ফল দুটি দিলা আমারে ধরিয়া ॥
কেমনে খাইব ফল ত্রাস হয় মনে।
অমনি পড়িল মনে অঞ্জনা-নন্দনে ॥
সাত পাঁচ ভাবি মুঞি ফল নাহি খাই।
হাসিয়া বলিলা তবে চৈতন্য গোঁসাই ॥
অষ্টি নাহি বাধিবে গোবিন্দ তোর গলে।
প্রসাদ পাইতে কিছু না করিহ ছলে ॥
ফল খাইবার ইচ্ছা হয়েছে প্রবল।
আটি বাধিবার ভয়ে হইছ বিকল ॥

মনের কথাটী যবে কহিলা গোঁসাই।
অমনি রাখিয়া ফল চরণে লোঠাই ॥
প্রভুর আদেশে শেষে খাইতে হইল।
আর দুটা ফল আনি ন্যাসী যোগাইল ॥

ভোজনান্তে নির্ঝরেতে আজলি পাতিয়া।
জলপান করিলাম আনন্দিত হিয়া ॥
সুশীতল সুনির্ম্মল নির্ঝরের জল।
পান করি সব অঙ্গ হইল শীতল ॥
হরি নামে মত্ত প্রভু প্রেম উপজিল।
কদম্বের মত অঙ্গ শিহরি উঠিল ॥
প্রেমভরে খুলে গেল জটার বন্ধন।
চরণে চরণ বাধি পড়িল তখন ॥
কপাল কাটিয়া গেল পাথরের ঘায়।
রুধিরের ধারা কত পড়িল ধরায় ॥
মুখে লালা বহে কত জল নাসিকায়।
জড়ের সমান পড়ি রহে গোরা রায় ॥
ইহা দেখি সন্ন্যাসীর ভক্তি উপজিল।
প্রভুর চরণে পড়ি কাঁদিতে লাগিল ॥
পোড়া কাষ্ঠ সম দেহ অঙ্গে নাহি বাস
খুলিল জটার ভার বহিল নিশ্বাস ॥
শ্মশ্রুবহি অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।
প্রেমে সেই পোড়া কাষ্ঠ ফুলিয়া উঠিল ॥

চেতনা পাইয়া তবে মোর প্রভুবর।
উঠিয়া বসিল অঙ্গ ধুলায় ধুষর ॥
ছটফটি করিতে লাগিল ন্যাসিবর।
প্রভুরে নেহারি বলে তুমি সে ঈশ্বর ॥

সন্ন্যাসীর বাক্যে প্রভু কর্ণে দিয়া হাত।
বার বার বলে ন্যাসী ছাড় ইহ বাত ॥
সন্ন্যাসী কহিলা তুমি কভু নহ নর।
প্রভু কহে ন্যাসী তুমি আমার ঈশ্বর ॥
আশ্চর্য্য তোমার প্রেম ঈশ্বরের প্রতি।
তোমারে হেরিলে হয় পাষণ্ড সুমতি ॥
বস্ত্র নাই পাত্র নাই স্পৃহা নাহি ধনে।
কোটি কোটি নমস্কার তোমার চরণে ॥
পার্থিব সুখের বশীভূত নহ তুমি।
তোমাকে দেখিলে তুচ্ছ হয় স্বর্গভূমি ॥

তার পরে তৃপদীনগরে প্রভু যায়।
শ্রীরামের মূর্ত্তি দেখি পড়িলা ধূলায় ॥
বহুতর রামাত বৈষ্ণব তথা থাকে।
বিচার করিতে তারা ফেরে কত পাকে
মথুরা নামেতে এক রামাত পণ্ডিত।
বড়ই তার্কিক বলি নগরে বিদিত ॥
প্রভুর সম্মুখে আসি বিচার মাগয়ে।
জোড়হাতে প্রভু কন জড় সড় হয়ে ॥
মথুরা ঠাকুর মুহি বিচার না জানি।
তোমার নিকটে শতবার হারি মানি ॥
শ্রীরামের ভক্ত তুমি বৈষ্ণব গোঁসাই।
তোমারে ভজিলে কত তত্ত্ব কথা পাই ॥
বিরক্ত রামাত হয়ে জিগীষার বশী।
শুক্লবস্ত্রে কেন দাও দুই হাতে মসী ॥
বল কিছু তত্ত্বকথা শুনিয়া শ্রবণে।
পবিত্র হউক লোক তোমার বচনে ॥

শুনিতেছি তর্কে তুমি বড়ই নিপুণ।
শুষ্কতর্ক করিয়া নাহিক কোন গুণ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব জীবতত্ত্ব মায়াবাদ।
ব্যাখ্যা করি সুধারস করাও আস্বাদ॥
যেই তত্ত্বে জীবগণ চরিতার্থ হয়।
সেই কথা ব্যাখ্যা করি বল মহাশয়॥
নাহি প্রয়োজন বহু বাদ বিতণ্ডায়।
দয়া করি সূক্ষ্মতত্ত্ব বলহ আমায়॥

বলিতে বলিতে প্রভু হরিবোল বলি।
মাতিয়া উঠিল নামে হয়ে কুতুহলী॥
কোথায় বসন কোথা উত্তরীয় বাস।
লোমাঞ্চিত কলেবর ঘন বহে শ্বাস॥
আছাড় খাইয়া তবে পড়িলা ধরায়।
অচেতন হৈলা প্রভু যেন জড়প্রায়॥
যতেক রামাতগণ ভাব নিরখিয়া।
নাচিতে লাগিল সবে প্রভুরে বেড়িয়া॥

কেহ বলে এ সন্ন্যাসী মানুষত নয়।
চরণে পড়িয়া কেহ বিলুণ্ঠিত হয়॥
অতঃপর সেই স্থান ছাড়িয়া চলিলা।
পিছে পিছে কতদূর মথুরা ধাইলা॥

হাসিয়া মথুরানাথে করিয়া বিদায়।
পান্নানরসিংহে প্রভু দেখিবারে ধায়॥
নৃসিংহ দেবের ভোগ লাগে চিনিপানা।
পানানরসিংহ বলি ডাকে সর্ব্বজনা॥
নৃসিংহের স্তব করে প্রভু দয়াময়।
ইহা দেখি লোক সব মানিল বিস্ময়॥
নৃসিংহের অধিকারী মাধবেন্দ্র ভুজা।
নিত্য আসি নরসিংহ দেবে করে পূজা॥
তুলসীর মালা আনি দিলা প্রভুর গলে।
মালা পরি প্রভু মোর হরি হরি বলে॥
পূজারি প্রসাদ কিছু আনিলা ত্বরিতে।
কণামাত্র প্রসাদ লইলা প্রভু হাতে॥
হাতে করি প্রসাদের বহু স্তব করে।
প্রসাদ পাইতে দুই চক্ষে অশ্রু ঝরে॥

শর্করের পানা মোরে দিলা আনাইয়া।
পিয়ে পিয়ে খাই পানা উদর পূরিয়া॥
নৃসিংহের পানা হয় অমৃত সমান।
হেরিলে নৃসিংহ দেবে ব্রহ্মপদ জ্ঞান॥

আঁখি মুদি বলে প্রভু মুখে হরিনাম
ক্রমে আসি উপনীত বিষ্ণুকাঞ্চীধাম।
ভবভূতি নামে শেঠী বিষ্ণুকাঞ্চী স্থানে
লক্ষ্মীনারায়ণ সেবা করয়ে যতনে॥
বড় ভক্ত হয় শেঠী সাধুচূড়ামণি।
লক্ষ্মীনারায়ণগত তাহার পরাণী॥
নিত্য সেবা ভক্তি করে শেঠী মহাশয়।
সেবার লাগিয়া করে বহু অর্থ ব্যয়॥
মন্দির পাখালে নিত্য তাহার রমণী।
সেবার লাগিয়া ব্যস্ত সাধুশিরোমণি॥
নিত্য দুই মণ ক্ষীরে পায়সান্ন হয়।
প্রসাদ পাইতে কত উদাসীন যায়॥

লক্ষ্মীনারায়ণ দেখি গৌরাঙ্গ সুন্দর।
প্রণাম করিয়া স্তব করিলা বিস্তর॥
লক্ষ্মীনারায়ণ হতে ছয় ক্রোশ দূরে।
ত্রিকাল ঈশ্বর শিব আছয়ে প্রান্তরে॥
চারি হস্ত পরিমিত গৌরীপট্ট তাঁর।
শিব দেখি প্রভুর হইল চমৎকার॥

সেই স্থান হতে পক্ষগিরি দেখা যায়।
তার নিম্নে পক্ষ তীর্থ ভদ্রা নদী বয়॥
গৌরাঙ্গ সুন্দর সেই স্থানে স্নান করি।
চাম্পি ফল খায় যাহা পাই ভিক্ষা করি॥
বৃক্ষতলে রহিলাম শয়ন করিয়া।
রজনীতে আক্রমিল শার্দ্দূল আসিয়া॥
তর্জ্জন গর্জ্জন দেখি মোর গোরাচাঁদ।
হাসিয়া পাতিলা প্রভু হরিনাম ফাঁদ॥

হরিধ্বনি শুনি ব্যাঘ্র লেজ গুটাইয়া।
পিছাইয়া গেল এক বনে লম্ফ দিয়া॥
আশ্চর্য্য প্রভাব মুহি স্বচক্ষে হেরিয়া।
সেই পদরজ মাথে লইনু তুলিয়া॥

ভদ্রানদীতীর হৈতে পঞ্চক্রোশ দূরে।
কালতীর্থ নামে তীর্থ যেখানে বিহরে॥
বরাহ দেবের মূর্ত্তি আশ্চর্য্য গঠন।
যাহা হেরি মুগ্ধ হয় মুনি ঋষিগণ॥
দর্শন করিয়া প্রভু প্রণাম করিলা।
এক পাণ্ডা প্রভুকণ্ঠে মালা আনি দিলা॥
নির্ম্মাল্য পাইয়া প্রভু পুলকিত মন।
কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ ঝরিল নয়ন॥
পিচকিরি সম অশ্রু বহিতে লাগিলা।
ফুলে ফুলে কান্দি প্রভু আকুল হইলা॥

পঞ্চ ক্রোশ দক্ষিণেতে সন্ধিতীর্থ আছে।
যাত্রা করিলেন প্রভু মুহি পাছে পাছে॥
নন্দা ভদ্রা দুই নদী মিলেছে সেখানে।
স্নান করিলেন গিয়া সেই সন্ধি স্থানে॥
সেই তীর্থস্বামী সদানন্দপুরী হয়।
বড়ই পণ্ডিত তেঁহ হৈল পরিচয়॥
তুলিলা অদ্বৈতবাদ সদানন্দ পুরী।
এক তর্কে পুরীর ভাঙ্গিল ভারিভূরি॥
অবশেষে সদানন্দ আশ্চর্য্য হইয়া।
ভক্তি ভরে প্রভুপদে পড়ে লোটাইয়া॥

তাঁরে ভক্তিতত্ত্ব দিয়া সন্ন্যাসী আমার।
চাঁইপল্লীতীর্থে যান দেখিতে আচার॥
বড় সদাচার হয় সেই তীর্থবাসী।
তথি গিয়া উপনীত শচীর সন্ন্যাসী॥
সিদ্ধেশ্বরী নামে এক ভৈরবী সুন্দরী।
তেজস্বিনী মহাতপা যেন মহেশ্বরী॥

অস্থিচর্ম্ম অবশিষ্ট হইয়াছে তপে।
বসিয়া আছেন এক বিল্বমূলে জপে॥
স্থিরভাবে বসি তিনি করিছেন ধ্যান।
তাঁহারে দেখিলে পাপী পায় বহু জ্ঞান॥
শতবর্ষ বয়ঃক্রম হয়েছে তাঁহার।
তথাপি না চিনা যায় হেরিলে আকার॥
শৃগালী ভৈরবী নামে আর এক মুরতি।
নদীর কূলেতে হয় তাঁহার বসতি॥
ভক্তি সহকারে করি শৃগালী দর্শন।
কাবেরীর কূলে গেলা শচীর নন্দন॥

স্নান করি কাবেরীতে গৌরাঙ্গ-কিশোর।
হরিনাম সুধাপানে হইল বিভোর॥
অপরাহ্নে মোরে বলে ভিক্ষা করিবারে।
ভিক্ষা লাগি যাইলাম নগর মাঝারে॥
থোড়া থোড়া চূণা আটা সংগ্রহ করিয়া।
প্রভুর সম্মুখে আনি দিলাম ধরিয়া॥
রুটি পাকাইয়া প্রভু লাগাইয়া ভোগ।
প্রসাদ পাইয়া মোর হৈল উপযোগ॥

আমার দয়াল প্রভু নাগর নগরে।
প্রাতে উঠি চলিলেন কৃষ্ণ প্রেমভরে॥
ধূলা মাখা জটাবাঁধা অন্য কথা নাই।
পথে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি চলিছে নিমাই॥
নাগর নগরে আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সেই খানে গিয়া প্রভু করিলা বন্দন॥
নাগরেতে বহুতর লোক করে বাস।
সেই খানে হরিনাম করিলা প্রকাশ॥
প্রভুর প্রেমের গতি হেরি পুরবাসী।
আবাল বনিতা সবে হইলা উদাসী॥
তিন দিন নৃত্যগীত সেই খানে করে।
এই কথা প্রচারিল নগরে নগরে॥
দশ ক্রোশ হতে লোক আসিয়া জুটিল।
একে একে সবে প্রভু হরিনাম দিল।

এমন দয়াল প্রভু কভু দেখি নাই।
ঘরে ঘরে নাম দেয় চৈতন্য গোঁসাই ॥

এইখানে ছিল এক দুরাত্মা ব্রাহ্মণ।
প্রভুরে কপট বলি করিল তাড়ন॥
দলবল লয়ে সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
দয়াল প্রভুরে বলে দূর দূর দূর ॥
ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলে অরে জুয়াচোর।
কপট সন্ন্যাসী সেজে করিতেছ জোর।
গ্রাম্য লোকে মজাইছ ধর্ম্মশিক্ষা ছলে।
এইদণ্ডে তাড়াইব প্রকাশিয়া বলে ॥
প্রভুর সম্মুখে আসি কত গালি দিলা।
তার কটুবাক্য প্রভু হাসি উড়াইলা ॥
ব্রাহ্মণে ডাকিয়া শেষে চৈতন্য গোঁসাই।
বলে মোরে মেরে তুমি হরি বল ভাই ॥
আর যত লোক ছিল তাঁর চারি ভিতে।
বিপ্রের আচার দেখি ধাইল মারিতে ॥
দয়াল চৈতন্যদেব মনে বিচারিয়া।
কহিতে লাগিলা বাণী বিপ্রে সম্বোধিয়া ॥

শুন ওহে দয়াময় ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
হরি হরি বল সুখ পাইবে প্রচুর ॥
অনিত্য দেহেতে আর কোন সুখ নাই।
হরিনামে মজিয়া আনন্দ কর ভাই ॥
জড়পিণ্ড এই দেহ মরণসময়।
কেহ নাহি সঙ্গে যাবে এই ত নিশ্চয় ॥
ভাই বন্ধু দারা সুত কেহ কার নয়।
সবে বস্ত্র অলঙ্কার অর্থদাস হয় ॥
শৃগাল কুক্কুরে খাবে অনিত্য শরীর।
পচিয়া গলিয়া যাবে এই কর স্থির ॥
হরি বলি বাহু তুলি নাচ মোর সনে।
যাইতে হবে না আর শমন-সদনে ॥
দারা বল পুত্র বল বেদিয়ার খেলা।
দিন দুই তরে করে সংসারেতে মেলা ॥

খাবার লাগিয়া ছল করে পরিবার।
ভাব দেখি ভাই তুমি কে হয় তোমার ॥
গলে দিয়া প্রেম ফাঁশি নারী জোরে টানে।
সেই টানে বোকা কর্ত্তা মরেন পরাণে ॥
মুখেতে মধুর ভাষা অন্তরেতে বিষ।
অর্থ না পাইলে হাতে করে খিশমিশ ॥ *
যেতে নাহি দেয় কদাচন তত্ত্বপথে।
বন্ধনে ফেলিয়া ধ্বংস করে মনোরথে ॥
রমণীর প্রেম হয় গরল সমান।
অমৃত বলিয়া তাহা মুর্খ করে পান ॥
মৃতুকালে পুত্র কন্যা নিকটে আসিয়া।
বলে বাবা মোর তরে গেলা কি করিয়া ॥
এই সব মনে করি সাধু বিপ্র ভাই।
ভক্তিসহ হরি বল এই ভিক্ষা চাই ॥
আমাকে আঘাত কর তাতে দুঃখ নাই।
প্রাণভরি হরি বল এই ভিক্ষা চাই ॥
ভক্তিভরে হরি বল নাম সঙ্গে যাবে
তাহাতে অনন্তকাল নিত্য সুখ পাবে ॥
চারিদিকে যত লোক ছিল দাঁড়াইয়া
প্রভুর কথায় সবে উঠিল মাতিয়া ॥
হরিবোল বলি সবে নাচিতে লাগিল
পাষণ্ড বিপ্রের চিত্ত বিশুদ্ধ হইল
বিপ্র মাতি হরিনামে প্রভুর কৃপায়
প্রভুর চরণতলে পড়িলা ধরায় ॥

এইরূপে ব্রাহ্মণেরে কৃতার্থ করিয়া।
চলিলা চৈতন্য দেব নাগর ছাড়িয়া ॥
যাত্রা করিবার কালে সন্ন্যাসিপ্রবর
ইঙ্গিত করিলা মোরে উঠিতে সত্বর ॥

* খিশ মিশ কিংবা গিশ গিশ। পুথির পাঠ হয়তঃ অস্পষ্ট ছিল, কিন্তু শব্দটি যাহাই থাকুক না কেন, ইহার অর্থ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করা।

খড়ম দুখানি লই মাথায় বাঁধিয়া।
দুহ কাঁধে লইলাম দুইটি খড়িয়া।
কুলবধূ ধায় কত দেখিতে প্রভুরে।
তাঞ্জোর নগরে চলে সাত ক্রোশ দূরে॥

ধলেশ্বর নামে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
তাঞ্জোরে থাকেন করি কৃষ্ণের সেবন॥
রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি আছে তাহার মন্দিরে।
সেইখানে মোর গোরা গেলা ধীরে ধীরে॥
ধলেশ্বর ব্রাহ্মণের আঙ্গিনার মাঝে।
প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষ তথায় বিরাজে॥
তথি রহে বহুতর বৈষ্ণব সন্ন্যাসী।
যে স্থান দেখিলে হয় গৃহস্থ উদাসী॥
গোসমাজ শিব রহে তার বাম ভাগে।
শিব দরশন কৈলা প্রভু অনুরাগে॥
তাহার নিয়ড়ে ছিল রম্য সরোবর।
পথ দেখাইয়া দিলা বিপ্র ধলেশ্বর॥
কুম্ভকর্ণ-কর্পরেতে সরোবর হয়।
সরসী দেখিয়া প্রভু মানিলা বিস্ময়॥

চণ্ডালু নামাতে গিরি তাহার নিকটে।
দাঁড়াইয়া আছে যেন লেখা চিত্রপটে॥
বহুতর গোফা আছে তার চারি ভিতে।
অনেক সন্ন্যাসী থাকে তপস্যা করিতে॥
ধ্যান-পরায়ণ কত সন্ন্যাসী গোঁসাই।
আছেন মুদিয়া আঁখি অঙ্গে মাখা ছাই॥
সেইখানে ভট্টনামে এক বিপ্রবর।
প্রভুরে লইয়া গেলা আপনার ঘর॥
কৃষ্ণনাম শুনি বিপ্র পাগল হইল।
দয়াল চৈতন্য কৃপা তাহারে করিল॥
হরিনামে সদা মত্ত ভট্ট মহাশয়।
লইতে কৃষ্ণের নাম অশ্রুপাত হয়॥
তার প্রেমাবেশ দেখি গৌরাঙ্গ সুন্দর।
বলে বিপ্র তুমি হও সাধুর প্রবর॥

তোমারে দেখিলে নাহি রহে যমভয়।
তোমারে দেখিলে মহা পাপ হয় ক্ষয়॥
মাথার ঠাকুর তুমি বিপ্র মহাশয়।
তোমারে দেখিলে শোক তাপ নাহি রয়॥

প্রশংসাবাদেতে বিপ্র অতি লজ্জা পাইয়া।
প্রভুর চরণ তলে পড়ে গিয়া ধাইয়া॥
বলে কেন কর প্রভু এত বিড়ম্বনা।
স্তববাক্যে অধমের বাড়িছে যাতনা॥
নরকের কীট আমি পাপি-শিরোমণি।
উদ্ধারিলা মোরে কৃপা করিয়া আপনি॥
আমাকে যে স্পর্শ করে সে নরকে যায়।
পাপক্ষয় হইল আজি তোমার কৃপায়॥

ব্রাহ্মণের দৈন্য দেখি শচীর নন্দন।
বলে বিপ্র তুমি ধন্য তুমি সাধুজন॥
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু ব্রাহ্মণের ঘরে।
তাহা হেরি ব্রাহ্মণের পুলক অন্তরে॥
প্রধান সন্ন্যাসী এক নাম সুরেশ্বর।
তার মধ্যে হরি সেবা করে নিরন্তর॥
আর ছয় জন হয় তাহার অধীন।
ভজন করেন বনে সবে উদাসীন॥
বড় বড় গাছ চারিদিকে শোভা পায়।
আশ্চর্য্য বনের শোভা কহনে না যায়॥
ক্ষুদ্র এক নদী সেই বনের মাঝারে।
বড় মনোহর বহে কুলু কুলু স্বরে॥
ঝরণার জল সব একত্র মিলিয়া।
নদী হয়ে যায় সেই কানন ভেদিয়া॥
সেই খানে থাকে সবে কোথা নাহি যায়।
গ্রাম্যলোক ভিক্ষা আনি সেখানে যোগায়॥
বড় পুণ্যভূমি হয় সেই রম্য স্থান।
সেই খানে মহাপ্রভু হৈল আগুয়ান্॥

প্রভুরে দেখিয়া সেই বিরক্ত সন্ন্যাসী।
পুলকে বিভোর হৈল আনন্দেতে ভাসি॥
সেই স্থানে দিন কত থাকি গোরা রায়।
আনন্দে মাতিয়া প্রভু হরিগুণ গায়॥
আশ্চর্য্য মানিয়া তবে সুরেশ্বর ন্যাসী।
প্রভুর সহিতে নাচে প্রেমনীরে ভাসি॥
জয়সিংহ ভূপতির রাজ্য সেই খানে।
কর নাহি লন রাজা সন্ন্যাসীর স্থানে॥
বৈকণ্ঠ ধামের তুল্য সেই স্থান হয়।
প্রবেশিলে সেই স্থানে জুড়ায় হৃদয়॥

সেই বন ছাড়ি তবে শচীর নন্দন।
পদ্মকোট তীর্থে চলে করিতে দর্শন॥
পদ্মকোট দেবী অষ্টভুজা ভগবতী।
সেই খানে প্রভু গিয়া করিলা প্রণতি॥
বহু স্তুতি কৈলা তবে মোর গোরা রায়।
দেখিতে তাহারে শত শত লোক ধায়॥
সেই খানে প্রভু বসি উপদেশ দিলা।
কত শত লোক তথি আসিয়া জুটিলা॥

প্রভু বলে সবে ভাই কর হরিনাম।
নাম বলে সবে ভাই পাবে নিত্য ধাম॥
বল দেখি জড় দেহে কিবা প্রয়োজন।
মারলে শৃগালে কাকে করিবে ভক্ষণ॥
মায়াজালে পড়িয়াছ তোমরা সকলে।
জাল ছিঁড়ে ফেল ভাই হরিনাম বলে॥
কেবা কন্যা কেবা পুত্র সব মিছে ভাণ।
আমার আমার করি সবে হতজ্ঞান॥
তুমি কার কে তোমার কেবা আত্মপর।
মায়াবিটি খেলিতেছে যেন বাজীকর।
যারা করে সংসারেতে বিষয়বাসনা।
যাতায়াতে পায় তারা অনেক যাতনা॥
গর্ভের ভিতরে করে বিষ্ঠা মাঝে বাস।
মল মূত্র খাইয়া পূরায় অভিলাষ॥

জড়দেহে চিৎ বুদ্ধি যাহাদের হয়।
কেমনে উত্তীর্ণ হবে তাহারা নিরয়॥
যারা অবয়বে অবয়বী জ্ঞান করে।
চিরবাস করে তারা নরক ভিতরে॥
সংসার বিষম ফাঁদ না জানিয়া লোক।
সেই ফাঁদে পড়ি সবে পায় বহু শোক॥
আত্মার মরণ নাই মরে পাপ দেহ।
ভ্রমে মায়ামুগ্ধ জীব দেহে করে স্নেহ॥
এই উপদেশে সবে আশ্চর্য্য হইল।
অষ্টভুজা দেবী যেন কাঁপিতে লাগিল॥
চৈতন্য প্রভুর মুখে শুনি হরিধ্বনি।
চারিদিকে প্রতিধ্বনি হইল অমনি॥
বালক বালিকা যুবা ক্ষেপিয়া উঠিল।
অষ্টভুজা দেবী যেন দুলিতে লাগিল॥
পদ্মগন্ধ চারিদিকে লাগিলা বহিতে।
সেই খানে পুষ্পবৃষ্টি হৈলা আচম্বিতে॥
যতেক রমণীজন ফুল দেয় ফেলি।
ভক্তিভরে রমণীরা করে ফুল-কেলি॥

সেইখানে ছিল এক অন্ধ সাধুজন।
ভক্তিভরে ধরিলেক প্রভুর চরণ॥
প্রভু বলে ছাড় মোরে অহে সাধুবর।
অন্ধ বলে কৃপা কর জগৎ-ঈশ্বর॥
প্রভু বলে এই খানে জগৎ-ঈশ্বরী।
অন্ধ বলে দীন জনে দয়া কর হরি॥
দয়া কর মোরে তুমি প্রভু দয়াময়।
না দেখিয়া তব রূপ কাঁদিছে হৃদয়॥
আমি অন্ধ দুরাচার দেখিতে না পাই।
দেখাও আমারে রূপ চৈতন্য গোঁসাই॥

প্রভু বলে চর্ম্ম চক্ষু নাহিক তোমার।
জ্ঞান চক্ষে দেখ তুমি অন্তর সবার॥
অজ্ঞ লোক চক্ষু দিয়া করে দরশন।
জ্ঞানবান্ দেখে সব মুদিয়া নয়ন॥

সেই জ্ঞানবান্ তুমি অন্ধ মহাশয়।
অন্তরে দেখিছ সব মোর জ্ঞান হয়॥
অন্ধ বলে কেন ছল করুণানিধান।
অন্ধ বলি দয়া কর তুমি ভগবান্॥
বহুকাল আছি আমি মন্দিরে পড়িয়া।
স্বপ্নে ভগবতী মোরে দিয়াছে বুঝিয়া॥
তুমি সেই ভগবান্ অগতির গতি।
বলিলা একথা মোরে স্বপ্নে ভগবতী॥
দয়াময় তোমারে জানিব তবে আমি।
দেখাও যদ্যপি রূপ আঁধালারে তুমি॥
পর্ব্বত উপাড় পিপীড়ার পদ দিয়া।
পঙ্গু লঙ্ঘে হিমালয় তোমারে স্মরিয়া॥
অগস্ত্য শোষিলা সিন্ধু তোমার কৃপায়।
বিষপানে প্রহ্লাদের মৃত্যু নাহি হয়॥
বস্ত্র রূপে দ্রৌপদীর রাখিলে সম্মান।
অন্ধ বিল্বমঙ্গলের চক্ষু দিলা দান॥

অন্ধের শুনিয়া বাণী চৈতন্য গোঁসাই।
বলে অপরাধী মোরে কেন কর ভাই॥
সকল হৃদয়ে হরি করেন বসতি।
জিজ্ঞাসিয়া দেখহ বলিবে ভগবতী॥
উচ্চারিলে যে কথা শুনিতে তাহা নাই।
মিছে কেন অপরাধী কর মোরে ভাই॥
সামান্য মনুষ্য আমি অধম পামর।
ভ্রান্তি-কূপে পড়িয়াছে তোমার অন্তর॥

অন্ধ বলে কথায় অধিক কাজ নাই।
দেখাও তোমার রূপ এই ভিক্ষা চাই॥
কান্দিয়া আকুল অন্ধ প্রভুর লাগিয়া।
অন্ধের নিয়ড়ে প্রভু গেলেন চলিয়া॥
অন্ধের ভকতি দেখি গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ধীরে ধীরে প্রভু তার ধরিলেন কর॥
বাহু পশারিয়া গোরা অন্ধে আলিঙ্গিল।
প্রভুর পরশে অন্ধ শিহরি উঠিল॥

বিদ্যুতের ন্যায় শীঘ্র নয়ন মেলিয়া।
কৃতার্থ হইল অন্ধ প্রভুরে দেখিয়া॥

যেই দণ্ডে হেরিলেক মোর ধর্ম্মবীর।
অমনি পড়িয়া অন্ধ ত্যজিল শরীর॥
হরিবোল বলি প্রভু অন্ধকে বেড়িয়া।
নাচিতে লাগিল প্রেমে উন্মত্ত হইয়া॥
অন্ধের সমাধি সেই আঙ্গিনাতে দিয়া।
চলিলা গৌরাঙ্গ পদ্মকোট তেয়াগিয়া॥

পদ্মকোট ছাড়ি প্রভু ত্রিপাত্র নগরে।
গিয়া চণ্ডেশ্বর শিব দরশন করে॥
করিলে ববোম্ শব্দ তাঁহার মন্দিরে।
প্রতিধ্বনি করি শব্দ দণ্ড কাল ফিরে॥
প্রকাণ্ড এক বিল্ববৃক্ষ আছে সে অঙ্গনে।
সিদ্ধ বিল্ববৃক্ষ তারে বলে সর্ব্বজনে॥
সেস্থানে অনেক শৈব করেন বসতি।
সুপণ্ডিত ভর্গদেব সেই দলপতি॥
বড়ই পণ্ডিত ভর্গদেব দর্শনেতে।
করেন হরের পূজা নিত্য আনন্দেতে॥
সেই খানে মোর প্রভু শচীর নন্দন।
ভক্তিভরে স্তব করে মুদিয়া নয়ন॥
বৃদ্ধ ভর্গদেব শচীতনয়ে দেখিয়া।
সব উদাসীন জনে বলে ডাক দিয়া॥
শুনেছ সকলে এক আশ্চর্য্য সন্ন্যাসী।
এই দেশে ঘুরিতেছে তীর্থ অভিলাষী॥
অদ্ভুত মহিমা তাঁর সর্ব্বলোকে কয়।
এই ত সন্ন্যাসী সেই শচীর তনয়॥
সর্ব্বদা শাম্ভবী মুদ্রা নয়ন মাঝারে।
না রহিল পাপী তাপী হেরিয়া ইহারে॥
হরিনাম সুধাদানে দেশ ভাসাইল।
আবালবনিতাবৃদ্ধে নামে মাতাইল॥
শুনেছি পাষণ্ডগণে হরিনাম দিয়া।
উদ্ধারিতে আসিয়াছে স্বদেশ ছাড়িয়া॥

এই সেই নবীন সন্ন্যাসী দেখ ভাই।
ইহাকেই বলে সবে চৈতন্য গোঁসাই ॥
যেমন শুনেছি আজি দেখিলমে তাই।
আহা মরি কিবা রূপ কভু দেখি নাই ॥
মানুষ না হয় এই সন্ন্যাসীপ্রবর।
ইহারে দেখিয়া কেন গলিল অন্তর ॥
ঈশ্বরের অবতার হয় এই জন।
প্রণাম করহ সবে ধরিয়া চরণ ॥

এই কথা বলি ভর্গ প্রণাম করিল
দশনে রসনা কাটি প্রভু পিছাইল ॥
প্রভু বলে ছি ছি ভর্গ কি বলিলে তুমি।
নদীয়ানগরে হয় মোর জন্ম ভূমি ॥
সামান্য মানুষ আমি এইত নিশ্চয়।
অবতার বলি কেন কর মিছে ভয় ॥
ঈশ্বরের অবতার বলি বারে বারে।
অপরাধী কর কেন তোমরা আমারে ॥
তীর্থ করিবারে আসিয়াছি তব ঠাঁই।
হরি বলি বাহু তুলে নাচ সবে ভাই ॥
অবতার বলি কেন কর গণ্ডগোল।
এস সবে মিলে বলি হরি হরি বোল ॥
ঈশ্বরের অবতার না বলিও কভু।
সাক্ষাৎ শঙ্কর তুমি জগতের প্রভু ॥

প্রতি নমস্কার করে প্রভু করপুটে।
ত্রাস পেয়ে ভর্গদেব চমকিয়া উঠে ॥
চরণতলেতে ভর্গ গড়াগড়ি যায়।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ পড়িয়া ধরায় ॥
ভর্গ বলে শুন শুন চৈতন্য গোঁসাই
বৃদ্ধ বলি কৃপা কর এই ভিক্ষা চাই ॥
ভজন সাধন মুহি কিছু নাহি জানি।
বিরক্ত সন্ন্যাসী বলি সদা অভিমানী ॥
তার কাছে গিয়া প্রভু কর ভারিভুরি।
যে জন না বুঝিয়াছে লীলার চাতুরী ॥
যে তোমারে না চিনেছে তার কাছে গিয়া।
রাখহ কৌশলে নিজ রূপ লুকাইয়া ॥
বৃদ্ধ বলি চক্ষু দোষে দৃষ্টি মোর ঘোর।
সেই লাগি দেখিতেছি শ্যামল কিশোর ॥
সোণার মতন বর্ণ তব লোকে বল।
অভাগা হেরিছে কাল অদৃষ্টের ফলে ॥
একবার দয়া করি চৈতন্য গোঁসাই।
দেখাও যদ্যপি রূপ দেখিবারে পাই ॥
কৃপা করি দেহ প্রভু মোরে চক্ষুদান।
দয়া করি কর তুমি মোরে ভাগ্যবান্ ॥
কৃপা করি দেখা যদি দিলে অধমেরে
চরণ তুলিয়া দেহ মাথার উপরে ॥

বৃদ্ধের বচন শুনি শচীর কুমার।
বলে কেন অপরাধী কর বার বার ॥
এথায় আসিনু সাধুদরশন লাগি।
আছুক পুণ্যের কথা কলুষের ভাগী ॥
এই বাক্য শুনি ভর্গ করি যোড় পাণি।
এথা ভিক্ষা কর আজি এই মোর বাণী ॥

ত্রিপাত্র নগরে প্রভু সপ্তাহ রহিল।
বহুতর লোক তথা আসিয়া জুটিল ॥
সাত দিন করে প্রভু হরিসঙ্কীর্ত্তন।
হরিনামে মাতিয়া উঠিল সর্ব্বজন ॥
সেই স্থানে বহু লোক বৈষ্ণব হইল।
কণ্ঠে সবে তুলসীর মালা দুলাইল ॥

আমার প্রভুর কথা কি কহিব আর
আশ্চার্য্য প্রভাব তাঁর বিচিত্র আকার ॥
দিনান্তে সামান্য ভোজ্য খায় গোরারায়।
না খাইয়া দেহ তাঁর ক্ষীণ যষ্টি প্রায় ॥
অস্থিচর্ম্ম অবশিষ্ট হইয়াছে তার।
তথাপি দেহের জ্যোতিঃ অগ্নির আকার

মোহিত হয়েছে সবে অঙ্গের শোভায়।
বিনা যত্নে পদ্মগন্ধ সদা কাল গায়॥
যেজন তাহান প্রতি আঁখি মেলি চায়।
তেজের প্রভাবে চক্ষু ঝল্‌সিয়া যায়॥
সাত দিন পরে ভর্গে কৃপা বিতরিয়া।
চলিলা সন্ন্যাসী মোর ত্রিপাত্র ছাড়িয়া॥

সহচর হয়ে ভর্গ পেছু পেছু ধায়।
হাত ধরি ভর্গদেবে করিলা বিদায়॥
লক্ষ লক্ষ লোক আসে প্রভুকে দেখিতে।
কাতর না হন প্রভু কৃষ্ণনাম দিতে॥
হরিনাম বিনা কেহ নাহি কহে আন।
বহু কৃষ্ণভক্ত দেখি সকলে অজ্ঞান॥
ক্ষেপা হরিবোলা * বলে প্রভুরে সকলে।
ক্ষেপাইতে কতলোক হরিবোল বলে॥
হরি বলি কতলোক পেছু পেছু ধায়।
নাম শুনি প্রভু মোর ধূলা মাখে গায়॥
হরিনামে গোরাচাঁদ উন্মত্ত হইয়া।
গড়াগড়ি দেন কভু ধূলায় পড়িয়া॥
যবে প্রভু ভর্গদেবে বিদায় করিলা।
সেই কালে বহুশিশু সে স্থানে আইলা॥
কেহ বলে ওরে ভাই সেই ক্ষেপা যায়।
হরি হরি বলি সবে ক্ষেপাও ইহায়।
আরম্ভিল ক্ষেপাইতে যত শিশুগণ।
সেই সঙ্গে নচে প্রভু শচীর নন্দন॥
কখন হাসেন কভু করেন ক্রন্দন।
আছাড় খাইয়া কভু ধরায় পতন॥

ক্রমে সব লোকজন কোথা গেল চলি।
পথ মধ্যে পড়িল প্রকাণ্ড বনস্থলী॥
নাম তার ঝারিবন পঞ্চাশ যোজন।
তার মধ্যে প্রবেশিল শচীর নন্দন॥
ভয় নাহি মনে সুড়ি পথে চলে যাই।
আগে আগে চলে মোর চৈতন্য গোঁসাই॥
বৃক্ষতলে থাকি সেথা নাহি লোকজন।
বৃক্ষফল খেয়ে করি ক্ষুধা নিবারণ॥
কত যে আশ্চর্য্য ফল কহিব কেমনে॥
অমৃত নিছিয়া খাই সে ফল যতনে।
তিন দিন পরে এক সন্ন্যাসীর দল।
পাইয়া বাড়িল বড় মোর কুতূহল॥
সেই সঙ্গে মিলি মোরা যাই ধীরে ধীরে।
একপক্ষ পরে আসি বনের বাহিরে॥

বনের বাহিরে হয় শুদ্ধ রঙ্গধাম।
সেই স্থানে গিয়া প্রভু দেন হরিনাম॥
রঙ্গধামে নরসিংহ দেবের মূরতি।
হেরিলে পাষণ্ডচিত্তে উপজে ভকতি॥
প্রহ্লাদ অঞ্জলি বান্ধি সম্মুখে তাহার।
করিছেন প্রভু দৈত্যরাজের সংহার॥
এমন মুরতি আমি কভু দেখি নাই।
পাগল হইল হেরি চৈতন্য গোঁসাই॥
কভু পড়ে কভু উঠে শচীর নন্দন।
কভু ধ্যানে মগ্ন প্রভু মুদিয়া নয়ন॥
নৃসিংহ দেখিয়া প্রেম সাগর উথলে।
আছাড় খাইয়া কভু পড়ে ভূমিতলে॥
কখন পাগল প্রভু এলোমেলো বকে।
মুখদিয়া ফেনা উঠে ঝলকে ঝলকে॥
কভু ঘর্ম্মজলে উত্তরীয় ভিজে যায়।
কাঁপিয়া কাঁপিয়া কভু পতিত ধরায়॥
কোথাকার পাগল এসেছে কেহ বলে।
কেহ পড়ে আসিয়া প্রভুর পদতলে॥

---

* রামেশ্বরের শিবমন্দিরে "হরিবোলা"র বিগ্রহ আছে। মৎপ্রণীত "চৈতন্য এ্যাণ্ড হিজ এজ্" পুস্তক দ্রষ্টব্য।

যুধিষ্ঠির নামে এক সাধক ব্রাহ্মণ।
বৈষ্ণবের চুড়ামণি সাধু আচরণ॥
বিপ্র করে এই ক্ষেত্রে বন্দন পূজন।
নিত্য গীতা পড়ি করে অশ্রু বিমোচন॥
মূর্খ বিপ্র গীতা পড়ে সবে উপহাসে।
গ্রাহ্য নাহি করে বিপ্র তাই ভাল বাসে॥
কার কথা নাহি মানে গীতা অধ্যয়নে।
হৃদয় নিবেশ করি পড়ে নিরজনে॥
যতক্ষণ পড়ে গীতা কান্দয়ে ব্রাহ্মণ।
অশ্রু দেখি প্রভুর গলিয়া গেল মন॥
প্রভু বলে কেন কাঁদ ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
বিপ্র বলে গীতা পড়ি আনন্দ প্রচুর॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণে দেখিবারে পাই।
সেই লোভে গীতা পড়ি সন্ন্যাসি-গোঁসাই॥

প্রভু বলে কৃষ্ণে তুমি পাও দরশন।
তবে মোরে দয়া করি দেহ আলিঙ্গন॥
তোমার সমান সাধু কভু দেখি নাই।
তোমারে ভজিলে কৃষ্ণ দেখিবারে পাই॥
ব্রাহ্মণ প্রভুর প্রতি একদৃষ্টে চায়।
প্রভুর চরণতলে লোটাইলা কায়॥
প্রভু কহে শুন শুন বিপ্র মহাশয়।
এই কথা নাহি কবে যথায় তথায়॥
বড় ভাগ্যবান্ তুমি সাধুশিরমণি।
নিত্য দেখা দেন কৃষ্ণ তোমারে আপনি॥
বিপ্র বলে তুমি কৃষ্ণ কৃতার্থ করিলা।
এত বলি পদযুগ সাপটি ধরিলা॥
বিদায় হইতে প্রভু ব্রাহ্মণে বলিলা
সব ছাড়ি প্রভু সঙ্গে ব্রাহ্মণ ধাইলা॥

ব্রাহ্মণে বিদায় করি শচীর নন্দন।
ঋষভ পর্ব্বত তবে করিলা গমন॥

ঋষভ পর্ব্বতে থাকে পরানন্দ পুরী।
তাহারে দেখিতে প্রভু হৈল আগুসারী॥
পুরীসহ কৃষ্ণকথা বহুত করিলা।
অতঃপর রামনাথ নগরে আইলা॥

রামনাথ নগরেতে রামের চরণ।
হেরিয়া করিলা প্রভু অশ্রু বরষণ॥
পুলকে পূরিত দেহ কাঁপিতে লাগিল।
অজ্ঞান হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িল॥
পাদপদ্ম পরশিয়া মোর দয়াময়।
শিহরি শিহরি উঠে ঘনশ্বাস বয়॥
পাদপদ্ম নিরখিয়া শচীর নন্দন।
আর আর তীর্থে চলে করিতে দর্শন॥

রামেশ্বর তীর্থে গিয়া তথি স্নান করি।
শিব দরশন করে মোর গৌরহরি॥
রামেশ্বর নামে শিব আশ্চর্য্য গঠন।
শিব দেখি মহাপ্রভু করিলা বন্দন॥
বহুতর সাধু সেথা থাকে সর্ব্বক্ষণ।
একে একে সব সাধু আইলা তখন॥
প্রভুরে দেখিয়া এক পণ্ডিত উদাসী।
বিচার করিতে বড় হৈলা অভিলাষী॥
প্রভু বলে বিচার না করিবারে চাই।
হইলাম বিচারে পরাস্ত তব ঠাঁই॥
আশ্চর্য্য বিনয় তাঁর হেরিয়া নয়নে।
অজ্ঞান হইয়া ন্যাসী ভাবে মনে মনে॥
প্রভু বলে কি ভাবিছ সন্ন্যাসী-ঠাকুর।
আতাল পাতাল কথা সব কর দূর॥
আতাল পাতাল দূর করি ভক্তি ভরে।
কৃষ্ণগুণ গাও ভাই বিশুদ্ধ অন্তরে।
ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম।
করিয়া কৃষ্ণের নাম যাও নিত্য ধাম॥
কৃষ্ণ বিনা গতি নাই এই ত মন্ত্রণা।
বারংবার যাতায়াত পাইবে যন্ত্রণা॥

অহঙ্কারে কিবা কাজ ওহে সাধু জন।
বিচারে পণ্ডিত হয়ে কিবা প্রয়োজন॥
নরকেতে ঘর বান্ধে পাপাত্মা পণ্ডিত।
এই কথা সবে বলে শাস্ত্রের লিখিত॥
বহু শাস্ত্র জানিয়া যে হয় কামাচার।
কি করিবে সেই মুর্খ করিয়া বিচার॥
অর্থ লাগি প্রবঞ্চনা করে যেই জন।
নাহি বুঝে সে পাষণ্ড শাস্ত্রের বচন॥
কামিনী কণক লাগি যার ব্যস্ত মন।
বিড়ম্বনা হয় তার বেদ অধ্যয়ন॥
মৎসর যাহার চিত্তে সদা খেলা করে।
পিতৃপতি * নিজ হস্তে তার দণ্ড করে॥
হরিনামে গলে যায় যাহার হৃদয়।
সেই ত পণ্ডিত বড় আমার নিশ্চয়॥
হরিনাম করিতে আনন্দধারা বহে।
যাহার নয়নে তারে সুপণ্ডিত কহে॥
পড়িয়া শুনিয়া যার কৃষ্ণে নাই রুচি।
সেই মুর্খ হয় ভাই সর্ব্বদা অশুচি॥

শুনিয়া প্রভুর মুখে এতেক বচন।
নিঃশব্দ হইয়া যোগী রহে কতক্ষণ॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী সব প্রভুরে বেড়িয়া।
শুনিতে লাগিল বাণী অজ্ঞান হইয়া॥
অবশেষে গোরাচাঁদ দুই বাহু তুলি।
হরিনামে মত্ত হয়ে পড়িলেন ঢুলি॥
পড়িলা চৈতন্য প্রভু আছাড় খাইয়া।
পাথরের ঘায় গেল থুঁতনি কাটিয়া॥
দর দর রক্তধারা পড়িতে লাগিল।
যতনে পণ্ডিতবর তাহা মুছাইল॥

তিন দিন সেতুবন্ধে করিয়া কীর্ত্তন।
বামে চলে মাধবীবন * করিতে দর্শন॥
মাধবীবনে থাকে এক মৌন ব্রতধারী।
তাঁহারে দেখিতে যায় আমার ভিখারী॥
আশ্চর্য্য রূপের ছটা সন্ন্যাসীর হয়।
শ্বেতশ্মশ্রু ঢাকিয়াছে তাহার হৃদয়॥
বড় বড় নখ পড়িয়াছে উলটিয়া।
বসিয়া আছেন মৌনে উলাঙ্গ † হইয়া॥
বস্ত্র দণ্ডকমণ্ডলু কিছু কাছে নাই।
স্থির ভাবে হেরিলেন চৈতন্য গোঁসাই॥
অতি শান্তভাব তাঁর মুদ্রিত নয়ন।
বৃক্ষ তল গৃহ হয়, আকাশ বসন॥
কোন বাঞ্ছা নাই তাঁর মগ্ন তপস্যায়।
জোড় হস্তে প্রভু মোর সম্মুখে দাঁড়ায়॥
অনেক বিনয় স্তুতি চৈতন্য করিলা।
তথাপি সন্ন্যাসিবর ফিরে না চাহিলা॥

তিন দিন পরে ভিক্ষা আনি ফল মূল।
যোগাইয়া যান যত উদাসীনকুল॥
তিন দিন পরে সেই যোগিমহাজন।
করেন আহার করি জীবন ধারণ॥
ধ্যান ভাঙ্গি যোগিবর ফিরে তাকাইলা।
সেই কালে প্রভু কথা কহিতে লাগিলা॥
কিছু নাহি বুঝে যোগী প্রভুর বচন।
সংস্কৃত ভাষায় তবে করে আলাপন॥

স্থিরভাবে শুনি বাণী যোগিমহাশয়
প্রভুর সহিতে দুই চারি কথা কয়॥

---

* পিতৃপতি—যমরাজ।

* রামায়ণে সুগ্রীবের অধিকারভুক্ত, যে মধুবনের বর্ণনা আছে ইহা তাহাই কিনা বিবেচ্য।

† 'উলঙ্গ' স্থানে অনেক স্থলেই 'উলাঙ্গ' পাঠ দৃষ্ট হয়, যথা—'উলাঙ্গ হইয়া নাচে ঘন বহে শ্বাস" ২৪ পৃঃ।

দুই চারি কথা কহি যোগিমহাজন।
চাম্বনি শিঙড়ি * বলি হাসিলা তখন
চাম্বনি শিঙড়ি বলি অতি শুদ্ধমনে।
হাসিয়া প্রণাম করে প্রভুর চরণে ॥
প্রতি নমস্কার করি মোর গোরারায়।
আনন্দে ভাসিয়া তবে কৃষ্ণ গুণ গায় ॥

প্রণাম করিতে দেখি সেই যোগিবরে।
সকল সন্ন্যাসী তবে প্রভুপদ ধরে ॥
সেই খানে ইষ্ট গোষ্ঠী করি গোরারায়।
তথা হতে সাত দিন পরে বাহিরায় ॥

তত্ত্বকুণ্ডী নামে তীর্থ আছে সেই স্থানে।
স্নান করিবারে প্রভু চলিলা সেখানে ॥
তারপরে তাম্রপর্ণী নদী দেখা দিল।
স্নান করিবারে প্রভু সেখানে চলিল ॥
মাঘী পূর্ণিমার দিনে তাম্রপর্ণীধারে।
বহুত অতিথি আসে স্নান করিবারে ॥
সেই স্থানে একপক্ষ অপেক্ষা করিয়া।
মাঘী পূর্ণিমার দিন স্নান করি গিয়া।
তাম্রপর্ণী পার হয়ে সমুদ্রের ধারে।
প্রভু কন্যাকুমারী চলিল দেখিবারে ॥

পর্ব্বত কানন দেশ নাহি সেই ঠাঁই।
কেবল সিন্ধুর শব্দ শুনিবারে পাই ॥
বড় বড় তরঙ্গ আসিয়া সেই খানে।
ঈশ্বরের গুনগান করিছে সজ্ঞানে ॥
সে ভাব দেখিলে চিত্ত হয় আনন্দিত।
ভাবের উদয়ে দেহ হৈল পুলকিত ॥
পর্ব্বত সমান বালি হয়ে স্তূপাকার।
ঈশ্বরের গুণ যেন করিছে বিস্তার ॥
হুঁ হুঁ শব্দে সমুদ্র ডকিছে নিরন্তর।
কি কব অধিক সেথা সকলি সুন্দর ॥
দেখিবার কিছু নাই তথাপি শোভন।
সেখানে সৌন্দর্য্য দেখে যার শুদ্ধ মন ॥

গোবিন্দ বলিয়া প্রভু মোরে ডাক দিয়া।
স্নান করিবারে বলে ঈষৎ হাসিয়া
বেগে আসিতেছে ঢেউ পর্ব্বত সমান।
ভক্তিভরে সেই খানে করিলাম স্নান ॥
স্নান করি প্রভু মোর কান্দে হরি বলি।
হৃদয়ের প্রেম যেন পড়িল উথলি ॥
লোমাঞ্চিত কলেবর কপাল ঘামিল।
সেই শীর্ণ দেহ তাঁর পুলকে পূরিল ॥
স্নান করি গোরারায় মনে মনে ভাবে।
আমারে ডাকিয়া বলে কোন দিকে যাবে ॥
কহিলাম যেই দিকে প্রভুর গমন।
সেই দিকে যাবে দাস করিতে সেবন ॥

স্নান করি বড় এক সন্ন্যাসীর দল।
ফিরিয়া চলিল তারা সাঁতাল পর্ব্বত ॥
তাহাদের সঙ্গে মিশি চলিলা নিমাই।
ছায়ার সমান আমি পেছু পেছু যাই ॥
পঞ্চদশ ক্রোশ গিয়া মিলিল সাঁতল
সেই খানে স্থিতি করে সন্ন্যাসীর দল ॥
এক বৃক্ষতলে বসে চৈতন্য গোঁসাই।
কি ভিক্ষা করিব কোথা ভাবিয়া না পাই

* "চাম্বনি শিঙড়ি" শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। তামিল ও তেলেগুর অধ্যাপকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহারা বলিতে পারিলেন না, সম্ভবতঃ পুথিলেখক কর্তৃক শব্দটির পাঠ বিকৃতি ঘটিয়াছে। "শিঙরি" শব্দ "শৃঙ্গারী" শব্দের রূপান্তর বা বিকৃতি কিনা বলা যায় না। দাক্ষিণাত্যে "শিঙ্গারী মঠ" আছে, এই শব্দের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, তৎসম্বন্ধে অনুমান-মূলক কোন সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। ইহার পরের এক পৃষ্ঠায় "শিঙারির মঠে"র উল্লেখ আছে।

অন্তরের ভাব বুঝি ঈষৎ হাসিয়া।
বলে প্রভু ভাব তুমি কিসের লাগিয়া॥
*হরিনাম সুধাপানে রজনী কাটাব।
প্রভাতে উঠিয়া যথা ইচ্ছা চলি যাব
ইহা বলি গোরাচাঁদ নয়ন মুদিয়া।
স্থির ভাবে বসিলেন বৃক্ষে ঠেস দিয়া॥
খঞ্জনী বাজায়ে যত সন্ন্যাসী ঠাকুর।
গান আরম্ভিলা বড় শুনিতে মধুর॥
হেন কালে এক শ্রেষ্ঠী সেখানে আসিয়া।
সকলেরে ভিক্ষা দিয়া গেলেন চলিয়া॥

গোটা গোটা ফল মূল দুগ্ধ আর চিনি।
ভক্তি করি সকলেরে ভিক্ষা দেন তিনি॥
ভিক্ষা পেয়ে মন মোর পুলকে পূরিল।
দুগ্ধ চিনি লয়ে প্রভু ভোগ লাগাইল॥

সন্ন্যাসি-ঠাকুর সব প্রভাতে উঠিয়া।
চলিলা ত্রিবঙ্কু দেশে পর্ব্বত ভেদিয়া॥
ত্রিবঙ্কু দেশের রাজা বড় পুণ্যবান্।
পালন করেন প্রজা পুত্রের সমান॥
নগরের লোক সব অতিথি কুশল।
অতিথি লইয়া সবে করে কোলাহল।
অতিথি লইয়া সবে টানাটানি করে।
অতিথির সেবা করে বড়ই আদরে॥
এথাকার রাজা তার নাম রুদ্রপতি।
কাঙালের মাতা পিতা অগতির গতি॥
এ রাজার রাজ্যে প্রজা বড় সুখী হয়।
রাজার লাগিয়া সবে ব্যাকুল হৃদয়॥
কত হাতী ঘোড়া বাঁধা রাজার দুয়ারে।
অন্নের অভাব নাই তাঁহার ভাণ্ডারে॥

নগরের তিন স্থানে অন্নছত্র হয়।
অতিথি পথিক আসি সেই ছত্রে রয়॥
যার যত দিন ইচ্ছা রহে সেই খানে।
ধন্য ধন্য রাজা বলি সকলে বাখানে॥

সন্ধ্যাকালে আসিলাম ত্রিবঙ্কু নগরে।
বৃক্ষতলে বসে প্রভু প্রফুল্ল অন্তরে॥
একজন গ্রাম্য লোক চূণা আনি দিলা।
বৃক্ষতলে থাক প্রভু রজনী যাপিলা॥
পরদিন এই কথা রটিয়া পড়িল।
নগরের লোক ক্রমে আসিয়া জুটিল॥

গোরার আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়া সকলে।
জোড় হস্তে আসিয়া দাঁড়ায় সেই স্থলে
হরিনাম করে গোরা মুদ্রিত নয়নে।
দাঁড়াইয়া স্তব করে সবে শুদ্ধ মনে॥
বসিয়া আছেন প্রভু অঙ্গ নাহি নড়ে।
নয়নের কোণ বাহি অশ্রুধারা পড়ে॥
লোমাঞ্চিত কলেবর পুলক অন্তরে।
ভাব দেখি গ্রাম্যলোক কত স্তব করে॥
কেহ বলে মোর গৃহে চলহ সন্ন্যাসী।
কেহ বলে তোমারে দেখিতে ভালবাসি॥
কেহ কেহ ফল মূল আনিয়া যোগায়।
নয়ন খুলিয়া মোর প্রভু নাহি চায়॥
কেহ বলে এ সন্ন্যাসী মানুষ ত নয়।
ইহারে দেখিয়া কেন এত ভক্তি হয়॥
ইচ্ছা হয় এরে দেখি বিষয় ছাড়িতে।
মন নাহি যায় আর সংসার করিতে॥
কেহ বলে আজি সুখে রজনী পোহালো।
সন্ন্যাসী দেখিয়া মোর চিত্ত শুদ্ধ হৈল॥
একজন বুড়া আসি বলে ভক্তি ভরে।
কোথায় সন্ন্যাসী আছে দেখাও আমারে॥
তাহার আগ্রহ দেখি মোর গোরা রায়।
তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার কাছে যায়॥
*প্রভুর সম্মুখে বৃদ্ধ প্রণাম করিয়া।
ফল মূল চূণা আনি দেয় যোগাইয়া॥
এই কথা লয়ে সবে করে কাণাকাণি।
দর্শন মানসে আসে কত শত জ্ঞানী॥

একজন ব্রহ্মবাদী নিকটে আসিয়া।
তুলিলা অদ্বৈতবাদ চৈতন্য হাসিয়া॥
বেদ বেদান্তের কথা শাস্ত্রের প্রমাণ।
বলিয়া বুঝান তারে শুনিয়া অজ্ঞান॥

প্রভু বলে শুন শুন জ্ঞানী মহাশয়।
সর্ব্ব সাধনের সিদ্ধি রাধাপ্রেম হয়॥
রাধিকার সূক্ষ্ম প্রেম পর্ব্বত সমান।
ভক্তি বিনা কেহ তার না পায় সন্ধান॥
আত্মসুখ তেয়াগিয়া রাধিকাসুন্দরী।
কৃষ্ণ সুখে পাগলিনী সব পরিহরি॥
শ্রীরাধার গাঢ় প্রেম বুঝে যেই জন।
পুনঃ পুনঃ সে জনার না হয় মরণ॥
যেই জন মায়াবাদে ভাসে অনুক্ষণ।
তার কাছে ভক্তিতত্ত্ব না পায় স্ফুরণ॥
প্রেমের বাছনি সার মহা ভাব হয়।
সেই মহাভাবময়ী শ্রীরাধা নিশ্চয়॥
এই তত্ত্ব যেই বুঝে বুদ্ধ মহাশয়।
জন্ম মৃত্যু পুনঃ পুনঃ তার নাহি হয়॥
প্রভুর মহিমা পরে দেশে প্রচারিল।
নানা লোক আসি ক্রমে জুটিতে লাগিল॥

এ দেশের রাজা কত আগ্রহ করিয়া।
প্রভুকে লইতে দিলা লোক পাঠাইয়া॥
প্রভু বলে সেথা মোর নাহি প্রয়োজন।
বিষয়ীর কাছে আমি না করি গমন॥
রাজদূত বলে শুন সন্ন্যাসি ঠাকুর।
কেন নাহি যাবে পাবে সম্পত্তি প্রচুর॥
বস্ত্র অলঙ্কার আদি যাহা তুমি চাবে।
তথা তুমি অনায়াসে সেই ধন পাবে॥

দূতমুখে অভিপ্রায় ভাবেতে বুঝিয়া।
কহিতে লাগিলা তবে তারে বুঝাইয়া॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু বলিলা বচন।
শুন রাজদূত ধনে নাহি প্রয়োজন॥
বিষয়ের কীট যারা তাদের সংস্রবে।
কভু নাহি যাই মুহি কি হবে বিভবে॥
বিষয়ের কীট করে ধনে অভিলাষ।
অনর্থের মূল ধন এই ত বিশ্বাস॥
ধনমদে মত্ত যারা ভুলি তত্ত্ব কথা।
বিষয় নরকে তারা থাকয়ে সর্ব্বথা॥
অনিত্য শরীর ধনী ইহা নাহি জানে।
জীবনের সার্থক বলিয়া ধনে মানে॥

এই কথা শুনি তবে দূত করি ক্রোধ।
রাজদ্বারে চলি গেলা দিতে প্রতিশোধ॥
দূতমুখে বার্ত্তা শুনি রাজা রুদ্রপতি।
কিছু নাহি ক্রোধ করে সন্ন্যাসীর প্রতি॥
গোটা গোটা * বাত শুনি দূতের বদনে।
সন্ন্যাসী দেখিতে ইচ্ছা করিলা আপনে॥
সন্ন্যাসী হেরিতে চলে রাজা রুদ্রপতি।
ভক্তিভরে বাহিরিয়া আসে শীঘ্রগতি॥
হস্তী অশ্ব তেয়াগিয়া অতি দূর দেশে।
সন্ন্যাসীর কাছে আসে অতি দীন বেশে॥

দুই চারি মন্ত্রী সহ রাজা মহাশয়।
প্রভুর নিয়ড়ে আসি ভক্তিভরে কয়॥
জোড় হস্তে রুদ্রপতি কহে বার বার।
দয়া করি অপরাধ ক্ষমহ আমার॥
না বুঝিয়া ডাকিয়াছিলাম আপনারে।
সেই অপরাধ মোর ক্ষম এই বারে॥
জ্ঞান শিক্ষা দেহ মোরে অধমতারণ।
শোক দুঃখ পায় জীব কিসের কারণ॥

বড়ই পণ্ডিত রাজা নানা শাস্ত্রে হয়।
ভাগবতে বড় জ্ঞানী সর্ব্ব লোকে কয়॥

---

* গোটা গোটা বাত—সহজ ও সরলার্থ পূর্ণ নির্ভীক উক্তি।

দুই চারি পণ্ডিত গোঁসাই তাঁর সনে।
উপনীত হইয়াছে শিক্ষার কারণে ॥
প্রভু কহে রাজা তুমি বড় ভাগ্যবান্।
ভাগবত জান তুমি কি কহিব আন ॥
নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত তুমি বড় জ্ঞানী।
রাধাকৃষ্ণ বিনা আমি কিছু নাহি জানি ॥
লইতে কৃষ্ণের নাম প্রেম উপজিল।
দর দর অশ্রু ধারা পড়িতে লাগিল ॥
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত প্রভু অমনি উঠিয়া।
নাচিতে লাগিল দুই বাহু পশারিয়া ॥
গোরা বলে হরিবোল অজ্ঞান হইয়া।
নাচিতে নাচিতে পড়ে আছাড় খাইয়া ॥
পাছাড়িয়া * রাজা তবে প্রভুরে তুলিলা।
সেই সঙ্গে মহারাজ মাতিয়া উঠিলা ॥
হরি বলি মহারাজ নাচিতে লাগিল।
নয়নের জলে তাঁর হৃদয় ভাসিল ॥
লোমাঞ্চিত কলেবর পুলকে পূরিল।
ধুলায় পড়িয়া অঙ্গ ধূসর হইল ॥

দেখিয়া রাজার ভক্তি আমার নিমাই।
কোল দিয়া রাজারে বলেন এস ভাই ॥
হরি নামে যার চক্ষে বহে অশ্রুধারা।
সেইজন হয় মোর নয়নের তারা ॥
দেখিয়া তোমার ভক্তি রাজা মহাশয়।
জুড়াল আমার প্রাণ জানিহ নিশ্চয় ॥
এত বলি মহারাজে বিদায় করিয়া।
স্নান করিবারে প্রভু গেলেন চলিয়া ॥
বহুতর ফল মূল রাজা পাঠাইল।
আহ্নিক করিয়া প্রভু ভোগ লাগাইল ॥
লোক জন রাখি রাজা প্রভুর সেবায়।
প্রফুল্ল অন্তরে রাজধানী চলি যায় ॥

কেহ ফল মূল আনে কেহ আনে আটা।
কেহ চুণা আনি দেয় অতিথির বাটা ॥
বিশ্বম্ভর লাগি লোক করে হানাপানা। *
মাঝে মাঝে বহু লোক আসি দেয় থানা ॥
যার যাহা ইচ্ছা হয় আনিয়া যোগায়।
ভাল মন্দ কিছু নাহি কহে গোরা রায় ॥
পর্ব্বতে বেষ্টিত দেশ দেখিতে সুন্দর।
ঝরণার জল চলে অতি মনোহর ॥
বড় বড় নিম্ববৃক্ষ চারিদিকে হয়।
আশ্চর্য্য তাহায় শোভা কহনে না যায় ॥

রামগিরি †। নামে গিরি আছে সেই খানে।
আশ্চার্য্য মহিমা তার সকলে বাখানে ॥
সবে বলে রামচন্দ্র ইহার উপরে।
সীতা সহ তিন দিন আসি বাস করে ॥
লঙ্কার সমর জিনি রাম গুণধাম।
এই গিরিকূটে উঠি করেন বিশ্রাম ॥
সীতাসহ রামচন্দ্র ঠাকুর লক্ষ্মণ।
এই খানে বিরাম করেন তিন জন ॥
শুনিয়া প্রভুর মনে লালসা বাড়িল।
সেই স্থান দেখিবারে পর্ব্বতে উঠিল ॥
যেই স্থানে রাম সীতা বিশ্রাম করিলা।
সেই খানে মোর গোরা গিয়া প্রণমিলা ॥
ভক্তিসহ সেই রামগিরি নিরখিতে।
কতশত লোক উঠে প্রভুর সহিতে ॥
আড়ে দীঘে এই দেশ বড়ই বিস্তর।
এক পক্ষকাল গেল তাহার ভিতর ॥

তার পর পয়োষ্ণি নগরে প্রবেশিলা।
শিব নারায়ণ দেখি প্রফুল্ল হইলা ॥

---

* পাছাড়িয়া—পৃষ্ঠদেশ আঁকড়াইয়া।

* হানাপানা—ছুটাছুটি, ব্যস্ততাপ্রদর্শন।
† "রামগির্য্যাশ্রমেষু" কালিদাস—মেঘদূত।

শিঙারির মঠে থাকে শঙ্করের চেলা।
সেই খানে গিয়া প্রভু করিলেন মেলা॥
শঙ্করের শিষ্য যত একত্র হইয়া।
বিচার করিতে বসে তত্ত্ব বিচারিয়া॥

বিচারে সকল চেলা মানে পরাজয়।
মঠ হৈতে মৎস্য তীর্থ দেখিবারে যায়॥
মৎস্য তীর্থ করি প্রভু কাচাড়ে আইলা।
কাচাড়তে ভগবতী দর্শন করিলা॥
এই খানে কৃষ্ণাপুত্রী ভদ্রা নামে নদী।
স্নান করি চলি গেলা নাগপঞ্চপদী॥
এথাকার লোক সব রাম ভক্ত হয়।
এইস্থানে প্রভু ভিক্ষা করিবারে কয়॥
তিন বাড়ী ফিরিলাম ভিক্ষা করিবারে।
আটা ভিক্ষা দিলা সবে যহুত আমারে॥

এইস্থানে প্রভু মোর ত্রিরাত্রি থাকিয়া।
চিতোল চলিলা সবে পর্ব্বত ভেদিয়া॥
চিতোল ছাড়িয়া পুনঃ তুঙ্গভদ্রাতীরে।
স্নান করিবার তরে যায় ধীরে ধীরে॥
তুঙ্গভদ্রানদী তীরে সিনান করিয়া।
কৃষ্ণগুণ গায় মোর গোরা বিনোদিয়া॥
কাবেরীর জন্মস্থান হয় কোটিগিরী।
সেইখানে উপনীত নানাদেশ ফিরি॥

কাবেরীর জন্মস্থানে করিয়া সিনান
চণ্ডপুর গ্রামে যায় প্রভু ভগবান্॥
বামভাগে শোভা পায় সত্যনামে গিরি।
সত্যগিরি তার শোভা বর্ণিতে না পারি॥
দূর হৈতে নীলবর্ণ রেখা দেখা যায়।
হেরিলে তাহার শোভা নয়ন জুড়ায়॥
সত্যগিরি দেখি প্রভু প্রণাম করিল।
বামে সত্যগিরি রাখি ডাহিনে চলিল॥

চণ্ডপুর নগরের নিকটে আসিয়া।
এক বটবৃক্ষ তলে বসিলেন গিয়া॥
চণ্ডপুর থাকে এক বিরক্ত গোঁসাই।
লোক মুখে শুনি তারে ভেটিল নিমাই॥
পণ্ডিত গোঁসাই বটে নানা শাস্ত্র জানে।
সোনার কুণ্ডল তাঁর দোলে এক কাণে॥
ক্রমেতে গোঁসাই তোলে শাস্ত্রের বচন।
গর্ব্বভরে করিতে লাগিল আলাপন॥
ঈশ্বর ভারতী হয় সন্ন্যাসীর নাম।
লোকে বলে এ গোঁসাই সর্ব্বগুণধাম॥
সন্ন্যাসীর অহঙ্কার মনেতে বুঝিয়া।
অলপ হাসিল প্রভু মুখ ফিরাইয়া॥
ভাল মন্দ নাহি কহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিরক্ত হইয়া অবশেষে ন্যাসিবর॥
প্রভুরে বলেন তুমি নাহি কহ বাণী।
সুপণ্ডিত বলিয়া তোমারে নাহি মানি॥
সর্ব্বলোকে বলে তুমি বড়ই পণ্ডিত।
মুহি দেখি জ্ঞান নাহি তোমার কিঞ্চিত॥
দেশশুদ্ধ হরিবোলা করিয়াছ তুমি।
তোমার কিঞ্চিত গুণ নাহি দেখি আমি॥
শুনেছি শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু মুখে নাহি কথা।
ভ্রমিয়া বেড়াও ভিক্ষা করি যথাতথা॥
বিদ্যা নাই জ্ঞান নাই বিচার করিতে।
তবে কেন মূর্খলোক ভোলে আচম্বিতে॥
কি জানি কেমন ছলে কৌশল করিয়া।
সূক্ষ্ম তত্ত্ব সর্ব্বলোকে দেহ দেখাইয়া॥
এদেশের মূর্খলোকে হরিবোলা করি।
কেমনে যাইবে তুমি বুঝিব চাতুরী॥
শক্তি যদি থাকে তবে করহ বিচার।
এইবারে বুদ্ধি শুদ্ধি বুঝিব তোমার॥

এত বলি ভারতী গোঁসাই দৌড় দিল।
তিন সঙ্গিসহ পুনঃ আসিয়া বসিল॥
চারিজনে বসিলা প্রভুর চারি ভিতে।
এই রঙ্গ দেখি প্রভু লাগিলা হাসিতে॥
ভারতী বলিলা তুমি উড়াও হাসিয়া।
মুহি যাহা বলি তাহা দেখ আলোচিয়া॥
কে হয় উপাস্য দেব বলহ আমারে।
প্রভু বলে কৃষ্ণ ভিন্ন কি আছে সংসারে॥
ভারতী বলেন শুন শাস্ত্রের প্রমাণ।
এক ব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বর বেদের বাখান॥
যেদিকে তাকাই দেখি সব ব্রহ্মময়।
এ বাদের নিরাস বলহ কিসে হয়॥

প্রভু বলে বিচার না করিবারে জানি।
মানিলাম সর্ব্বতত্ত্বে তুমি হও জ্ঞানী॥
বিচারে বড়ই তুমি পণ্ডিত গোঁসাই।
তোমার নিকটে হলো পরাস্ত নিমাই॥
চাহ যদি জয়পত্র লিখে দিতে পারি।
তোমার বিচারে আজি মানিলাম হারি॥
এত শুনি যোগী করে খুটুর খাটুর। *
প্রভু বলে ভক্তি কর তর্ক বহুদূর॥
ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ এইত বিচার।
বেদ বেদান্তের মত কর ছার খার॥
বহুশাস্ত্র আলোচিয়া বল কিবা ফল।
কৃষ্ণ বিনা নাহি আছে দাঁড়াবার স্থল॥

এত বলি প্রভু মোর নয়ন মুদিল।
লোমাঞ্চিত কলেবর ভক্তি উছলিল॥
পড়িতে লাগিল অশ্রু হৃদয় বাহিয়া।
কৌপীনের গ্রন্থি ক্রমে যাইল খসিয়া॥
থর থরি হৃৎকম্প শরীর ঘামিল।
কৃষ্ণবলি ডাক দিয়া ঢুলিতে লাগিল॥

কৃষ্ণহে কোথায় আছ প্রভু দয়াময়।
ভক্তি বিতরিয়া কর বিশুদ্ধ হৃদয়॥
এই কথা বলি প্রভু কান্দিতে লাগিল
মনের আবেগ যেন দ্বিগুণ বাড়িল॥
ভাল মন্দ নাহি শুনে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ফুলে ফুলে কান্দিতে লাগিল নিরন্তর॥
তমালের বৃক্ষ এক সম্মুখে দেখিয়া।
কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়া ধরে জড়াইয়া॥

এই ভাব দেখি যোগী আপন নয়নে।
জড়াইয়া ধরে তবে প্রভুর চরণে॥
যোগী বলে বিচার না করিবারে মাগি।
উৎকণ্ঠা বাড়িছে মোর এবে কৃষ্ণ লাগি॥
দেখিয়া তোমার ভাব নবীন সন্ন্যাসী।
বিচার করিতে মুহি নাহি অভিলাষী॥
অপূর্ব্ব রতন ভক্তি দেহ মোর মনে।
এই নিবেদন করি তোমার চরণে॥
যোগীর এতেক বাণী শুনিতে না পায়।
অশ্রু জলে প্রভু মোর পৃথিবী ভিজায়॥
মহাভাবাবেশে অঙ্গ স্তম্ভিত হইল।
সোণার দোসর * দেহ ধূলায় পড়িল॥
কৃষ্ণ বলি পৃথিবীতে প্রভু গড়ি যায়।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ বিন্ধিল কাঁটায়॥
সম্মুখে বসিয়া যোগী কান্দিতে লাগিল।
অমনি তাহার প্রতি দয়া উপজিল॥

ভারতীর ভক্তি দেখি পৃষ্ঠে দিলা হাত।
পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলে দুই চারি বাত॥ *
যোগীর হইল ভক্তি প্রভুর পরশে।
মজিল তাঁহার মন কৃষ্ণ ভক্তিরসে॥
কেমন প্রভুর কৃপা কহনে না যায়।
প্রেমে মত্ত হয়ে যোগী ধূলায় লুটায়॥

---

* খুটুর খাটুর—অসন্তোষ বিজ্ঞাপক অস্পষ্ট বাক্য।

* দোসর—তুল্য।

যোগী বলে তুমিই আমার কৃষ্ণ হবে।
পুনঃ আসি প্রভু মোরে দেখা দিবে কবে ॥

প্রভু বলে এহ বাণী না কহিও আর।
বৃন্দাবনপতি কৃষ্ণ এই ত বিচার ॥
ভক্তি বিনা কৃষ্ণ তত্ত্ব না হয় উদয়।
ভক্তিডোরে বাঁধা কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয় ॥
যোগী বলে বুঝেছি তোমার ভারি ভূরি।
চক্ষে ধুলা দাও কেন করিয়া চাতুরী ॥
ভক্তিডোরে আজি আমি তোমারে বাঁধিব
খড়ম দুখানি আজি কাড়িয়া লইব ॥
ঈশ্বর ভারতী তবে এতেক বলিয়া।
জোরে টানাটানি করে খড়ম ধরিয়া ॥
প্রভু বলে কৃষ্ণে তুমি করহ বিশ্বাস।
আজি হৈতে তব নাম হইল কৃষ্ণদাস ॥

এত বলি চলে প্রভু ছাড়ি চণ্ডপুর।
যোগিবর সঙ্গে সঙ্গে আসে বহুদূর ॥
হাসিয়া যোগীরে প্রভু করিলা বিদায়।
প্রণাম করিয়া তবে যোগিবর যায় ॥
দুই দিবা রাত্র যায় পর্ব্বত ভেদিয়া।
তার মধ্যে গ্রাম পুরী না পাই খুজিয়া ॥
বড়ই দুর্গম পথ চলিতে না পারি।
কেবল কদম্বরৃক্ষ দেখি সারি সারি ॥
কদম্বের গাছ দেখি প্রভু মোরে বলে।
মোর কৃষ্ণ কেলি করে এই বৃক্ষ তলে ॥
এত বলি কান্দিয়া আকুল প্রভু মোর।
দুলিতে দুলিতে চলে কৃষ্ণ প্রেমে ভোর ॥
চলিতে চলিতে দেখি ক্ষুদ্র জলাশয় ॥
সেইখানে এক ব্যাঘ্র দেখে হয় ভয় ॥
ইঙ্গিত করিয়া ব্যাঘ্র প্রভুরে দেখাই।
ভালমন্দ প্রভুমুখে শুনিতে না পাই ॥
জলপান করিতেছে ব্যাঘ্র সেই স্থানে।
প্রভুপার্শ্বে গুড়ি গুড়ি যাই সাবধানে ॥

চলিলা ডাইনে গোরা ব্যাঘ্র রাখি বামে
আবেশে অবশ অঙ্গ মত্ত হরিনামে ॥
ফিরে না চাইল ব্যাঘ্র মোদিগের প্রতি।
পিছনে তাকাই আর চলি দ্রুতগতি ॥
মোর ভাবগতি দেখে ঈষৎ হাসিয়া।
বলে প্রভু ভয় কর কিসের লাগিয়া ॥
হরিনাম বলে নাহি রহে যমভয়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাক না কর সংশয় ॥
এই কথা শুনি মোর শক্তি সঞ্চারিল।
শরীরের বল যেন দ্বিগুণ বাড়িল ॥
চলিতে চলিতে এক ক্ষুদ্র পল্লীপাশে।
উপনীত হইলাম আশ্রমের আশে ॥
অতি অজ্ঞাত পল্লী সব দুঃখী অধিবাসী।
সেইখানে গিয়া বসে নিমাই সন্ন্যাসী ॥
পর্ব্বতে বেষ্টিত পল্লী দেখিতে সুন্দর।
ভিক্ষা লাগি যাই আমি গ্রামের ভিতর ॥
বড়ই দরিদ্র হয় একই ব্রাহ্মণ।
ভিক্ষা করি কোনরূপে কাটায় জীবন ॥
ভিক্ষা করিবারে আমি তার গৃহে যাই।
বিপ্র বলে ক্ষণেক অপেক্ষা কর ভাই ॥
কিছুক্ষণ বৈস এথা ফিরে না যাইবে।
অতিথি ফিরিলে মোর নরক হইবে ॥
ভিক্ষা মাগি এনে দিব ভিক্ষা তব ঠাঁই।
কিছুকাল এখানে অপেক্ষা কর ভাই ॥
এত বলি সেই বিপ্র ভিক্ষায় চলিল।
দুটী নারিকেল আনি মোরে ভিক্ষা দিল
ভিক্ষা আনি প্রভুরে যোগাই বৃক্ষতলে।
ফলভোগ লাগাইলা প্রভু কুতূহলে ॥
ব্রাহ্মণের কথা শুনি মোর গোরা রায়।
সন্ধ্যার সময়ে বিপ্রে দেখিবারে যায় ॥
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দুটী থাকে সেই স্থানে।
গোপালের সেবা লাগি ভিক্ষা মেগে আনে
আপনার ঘরে বিপ্র প্রভুরে দেখিয়া।
জোড়হস্তে দাঁড়াইলা সম্মুখে আসিয়া ॥

বিপ্র বলে কি দিয়া পুজিব অতিথিরে।
কেমনে বলিব প্রভু যাহ তুমি ফিরে॥
গেপোলের সেবা লাগি আছি এইখানে।
ভিক্ষা করে সেবা করি আমরা দুজনে॥
আসন নাহিক মোর কি দিব বসিতে।
ব্রাহ্মণী বলিলা বিপ্র মাথা দাও পেতে॥
বিদ্যুত খেলিছে দেখ অতিথির পায়।
তুলসী আনিয়া দেহ অতিথির গায়॥
তাড়াতাড়ি বিপ্র তবে তুলসী আনিয়া।
প্রভুর চরণে দিতে গেলেন ধাইয়া॥

হাত ধরি বিপ্রে তবে চৈতন্য বুঝায়।
তুলসী অর্পণ কর গোপালের পায়॥
এই কথা শুনি বিপ্র কান্দিতে লাগিল।
অমনি দয়াল প্রভু তারে আলিঙ্গিল॥
প্রভু বলে তুমি বিপ্র বড় ভাগ্যবান্।
তব গৃহে বিরাজেন নিজে ভগবান॥
কি কব ভাগ্যের কথা ঠাকুর তোমার।
গোপাল তোমার গৃহে করেন বিহার॥
সাক্ষাৎ কমলা হন তোমার ঘরণী।
মনে বিচারিয়া তুমি দেখহ আপনি॥
বিপ্র বলে ভাগ্য মানি তোমার কৃপায়।
সামান্য মানুষ তুমি নহ দয়াময়॥
তব অঙ্গে সৌদামিনী খেলা করে কেন।
তব দেহে পদ্মগন্ধ অনুমানি হেন॥
তুমি যদি ভগবান্ নহ দয়াময়।
তবে কেন তব অঙ্গে পদ্মগন্ধ বয়॥
মোর মাথে তুলে দেহ তোমার চরণ।
এত বলি মাথা পাতি দিলেন ব্রাহ্মণ॥

এই বাক্যে দশনেতে রসনা কাটিয়া।
দয়াল চৈতন্যদেব গেলেন পিছিয়া॥
ব্যাকুল হইয়া বিপ্র ব্রাহ্মণীর সাথে।
ধাইয়া গিয়া পদতলে নোয়াইলা মাথে॥

বাহু পশারিয়া প্রভু ব্রাহ্মণে তুলিলা।
তারপরে ভক্তিভরে গান আরম্ভিলা॥
ব্রাহ্মনের গৃহ যেন হৈল বৃন্দাবন।
হরিনাম শুনিবারে আসে গ্রাম্যজন॥
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥
দয়াল চৈতন্য এই গান আরম্ভিল।
সেই সঙ্গে শ্রোতা সব মাতিয়া উঠিল॥
নাম শুনি গ্রাম্যলোক প্রভুর বদনে।
গড়াগড়ি দেয় সবে প্রভুর চরণে॥
গাইতে গাইতে গান রাত্রি পোহাইল।
প্রাতঃকালে মোর প্রভু বিদায় লইল॥
বিদায় লইয়া যবে প্রভু বাহিরায়।
তাকাইয়া রহে লোক পুতুলের প্রায়॥
ইঙ্গিত করিলা মোরে গোবিন্দ বলিয়া।
কাঁধে তুলি লইলাম তখনি খড়িয়া॥

কাণ্ডার দেশের কাছে শোভে নীলগিরি।
অপরাহ্নে সেইখানে যাই ধীরি ধীরি॥
কিবা শোভা পায় আহা নীলগিরিরাজে।
ধ্যানে মগ্ন যেন মহাপুরুষ বিরাজে॥
কত শত গুহা তার নিম্নে শোভা পায়।
আশ্চর্য্য তাহার ভাব শোভিছে চূড়ায়॥
বড় বড় বৃক্ষ তার শিরে আরোহিয়া।
চামর ব্যজন করে বাতাসে দুলিয়া॥
ঝড়ুঝড়ু শব্দে পড়ে ঝরণার জল।
তাহা দেখি বাড়িল মনের কুতূহল॥
পর্ব্বতের নিয়ড়েতে ঘুরিয়া বেড়াই।
নবীন নবীন শোভা দেখিবারে পাই॥
কতশত লতা বৃক্ষে করিয়া বেষ্টন।
আদরেতে দেখাইছে দম্পতী-বন্ধন॥
ময়ুর বসিয়া ডালে কেকা রব করে।
নানা জাতি পক্ষী গায় সুমধুর স্বরে॥

নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা।
প্রকৃতির গলে যেন দুলিতেছে মালা॥
রজনীতে কত লতা ধগ ধগি জ্বলে।
গাছে গাছে জোনাকী জ্বলিছে দলে দলে॥
ক্ষুদ্র এক নদী বহে ঝুরু ঝুরু স্বরে।
তার ধারে বসি প্রভু সন্ধ্যা পূজা করে॥

রজনীতে বসি গিয়া এক বৃক্ষতলে।
আজি রাত্রি যাপ ইহ প্রভু মোরে বলে॥
এই মাত্র বলি গোরা মুদিয়া নয়ন।
হরিনামে করিলেন রজনী যাপন॥
ক্ষুধাতৃষ্ণা নাহি লাগে প্রভুর কৃপায়।
সেই লাগি পড়ে থাকি যথায় তথায়॥
যেই দিন বলে প্রভু ভিক্ষা করিবারে।
সেইদিন যাই মুহি গৃহস্থের দ্বারে॥

প্রাতে উঠি যাই মোরা গুর্জ্জরী নগরে।
বহুতর লোক এথা সুখে বাস করে॥
এইখানে বহু অট্টালিকা শোভা পায়।
নগরের ধারে গিয়া বৈসে গোরারায়॥
এস্থানে অগস্ত্যকুণ্ড নামে কুণ্ড হয়।
কুণ্ডে স্নান করি হৈলা আনন্দ উদয়॥
গোরারায় অগস্ত্য কুণ্ডেতে করি স্নান।
কুণ্ডতীরে বসি করে হরিগুণ গান॥
ক্রমে দুই চারি জন লোক দেখা দিল।
এক বিপ্র দুগ্ধ চিনি আনি কাছে দিল॥
কেহ বলে অতিথি হে মোর গৃহে চল।
কেহ বলে পুনঃ তুমি কৃষ্ণনাম বল॥
তব মুখে হরিনাম বড়ই মধুর।
নাম শুনি শোক তাপ সব হৈল দূর॥
তব মুখে কৃষ্ণনাম অমৃত সমান।
কহ কহ কৃষ্ণকথা জুড়াক পরাণ॥

কার কথা কেবা শোনে না কহিলা বাণী।
দেখিতে প্রভুরে আসে কত কত জ্ঞানী॥
চক্ষু মুদি গোরাচাঁদ দুলিতে লাগিল।
নয়ন ফাটিয়া অশ্রু আসি দেখা দিল॥
লোকজন নাহি দেখে মোর গোরারায়।
কৃষ্ণ হে বলিয়া কান্দি মৃত্তিকা ভিজায়॥
ফোঁপারি ফোঁপারি প্রভু কান্দিতে লাগিল।
বাঁধন খুলিয়া পৃষ্ঠে জটা এলাইল॥
লোমাঞ্চিত কলেবর কান্দিয়া আকুল।
আলুথালু বেশে প্রভু কহে নানা ভুল॥
কভু প্রভু মত্ত হয়ে গড়াগড়ি যায়।
আছাড়ি বিছাড়ি কভু পড়য়ে ধরায়॥
ঐ মোর প্রিয়সখা মুকুন্দ মুরারি।
এই বলি ধাইয়া যান চৈতন্য ভিখারী॥
কখন বলেন এস প্রাণ নরহরি।
কৃষ্ণনাম শুনি তোরে আলিঙ্গন করি॥ *
এই ভাবে নানাকথা কহে গোরারায়।
ভাবে মত্ত হয়ে প্রভু ছুটিয়া বেড়ায়॥
আশ্চর্য্য প্রভাব শুনি যত মহাজন।
প্রভুর সমীপ সবে করে আগমন॥

অর্জ্জুন নামেতে এক পণ্ডিত মহান্।
বুঝায় প্রভুরে বলি শাস্ত্রের প্রমাণ॥
অর্জ্জুন বলিলা জীবতত্ত্ব নাহি মানি।
আত্মতত্ত্ব জীবতত্ত্ব দুই এক জানি॥
প্রভু কহে আপনি পণ্ডিত মহাশয়।
শাস্ত্রের প্রমাণ শুনি করহ নিশ্চয়॥

---

* এই নরহরি যে শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী পদে মুকুন্দ মুরারি ভগবানের নামান্তর কিংবা মুকুন্দ দত্ত ও মুরারি গুপ্ত নামক পার্শ্বচরদ্বয়—তাহা ঠিক বলা যায় না। ইহার পরে এক জায়গায় এই দুটি ছত্র আছে—"প্রভু বলে মোর প্রাণ মুকুন্দ মুরারি।
আসিয়া উদিত হও হৃদয়ে আমারি।"

তাম্রপর্ণা এ শ্রুতির মর্ম্ম যদি জান।
তবে কেন দুই তত্ত্ব এক বলি মান ॥
বেদান্তের সূক্ষ্ম কথা তুলি গোরারায়।
তন্ন তন্ন করি সব অর্জ্জুনে বুঝায় ॥
জীব আত্মা পরমাত্মা এই ভাবে রয়।
আত্মা মহাবৃক্ষ জীব তার পত্র হয় ॥
কি পাঠ পড়িলে তুমি পণ্ডিত ঠাকুর।
আতাল পাতাল কথা সব কর দূর ॥
ঈশ্বরের ছায়া মায়া তাতে লিপ্ত নয়।
তাহার ইচ্ছায় জীব হয় মায়াময় ॥
নাম বলে যেই মায়া ছাড়িবারে পারে।
সেই * * * হয় এ সংসারে ॥
মায়ার যবনিকা মধ্যে আছে এক জন।
যবনিকা তুলে তাঁরে কর দরশন ॥

এত বলি কৃষ্ণহে বলিয়া ডাক দিল।
সেস্থান অমনি যেন নিঃশব্দ হইল ॥
প্রভুর মুখেতে নাম শুনিয়াছি কত।
আজি কিন্তু দেহ মোর হৈল পুলকিত ॥*
রাম রাম বলি প্রভু ডাকিতে লাগিল।
সেস্থান তখন যেন বৈকুণ্ঠ হইল ॥
অনুকূল বায়ু তবে বহিতে লাগিল।
দলে দলে গ্রাম্যলোক আসি দেখা দিল ॥
শত শত লোক চারিদিকে দাঁড়াইয়া।
হরিনাম শুনিতেছে নিঃশব্দ হইয়া ॥
নাম শুনিবার যেন স্বর্গে দেবগণ।
মাথার উপরি আসি করিছে শ্রবণ ॥
ছুটিল পদ্মের গন্ধ বিমোহিত করি।
অজ্ঞান হইয়া নাম করে গৌর হরি ॥

প্রভুর মুখের পানে সবার নয়ন।
ঝর ঝর করি অশ্রু পড়ে অনুক্ষণ ॥
বড় বড় মহারাষ্ট্রী আসি দলে দলে।
শুনিতে লাগিল নাম মিলিয়া সকলে ॥
পশ্চাৎ ভাগেতে মুহি দেখি তাকাইয়া।
শত শত কুলবধূ আছে দাঁড়াইয়া ॥
ভক্তিভরে হরিনাম শুনিছে সকলে।
নারীগণ অশ্রুজল মুছিচে আঁচলে ॥
অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্ন্যাসী জুটিয়া।
হরিনাম শুনিতেছে নয়ন মুদিয়া ॥
উপদেশে এই দেশ মাতাইলা প্রভু।
এমন প্রভাব মুহি দেখি নাই কভু ॥
কখন তামিল বুলি গোরারায়।
কভু বা সংস্কৃত বলি শ্রোতারে মাতায় ॥ *
এইরূপে হরিনাম করিতে করিতে।
অজ্ঞান হইয়া প্রভু লাগিল নাচিতে ॥
এলাইল জটাজুট খসিল কৌপীন।
ধুলায় ধুসর অঙ্গ যেন অতি দীন ॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু অজ্ঞান হইয়া।
ভূমির উপরে তবে পড়ে আছাড়িয়া ॥

পড়িয়া রহিল প্রভু জড়ের সমান।
ইহা দেখি লোক সব হৈল আগুয়ান ॥
কেহ জল আনি দেয় প্রভুর বদনে।
কেহবা ধরিয়া তোলে অতি সাবধানে ॥
দুই দণ্ড পরে প্রভু উঠিল বসিয়া।
হরিধ্বনি করে সবে আশ্চার্য্য হইয়া

অপরাহ্নে এক বিপ্র ভিক্ষা আনি দিল।
বৃক্ষতলে প্রভু মোর ভোগ লাগাইল ॥

---

* গোবিন্দ দিনরাত্র এই অদম্য ভাবের পাগলের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার ভাবের সর্ব্বদা উদ্রেক হইত না, কোন কোন দিন হইত।

* করচার একস্থলে আছে—"এই দেশে তীর্থ পর্য্যটিয়া দীর্ঘকাল। সকলের ভাষা বুঝে শচীর দুলাল।"

গুর্জরী নগর ছাড়ি মোর গোরারায়।
পূর্ণ নগর প্রভু যাইবারে চায়॥
সাতদিন ইষ্টগোষ্ঠী কভু না করিল।
একেবারে বিজাপুর পর্ব্বত উঠিলা॥
পথের সম্বল মাত্র আছে হরিনাম।
পর্ব্বতে উঠিয়া প্রভু করিলা বিশ্রাম॥
এইস্থানে পর্ব্বতের শিখরে উঠিয়া।
আনন্দ পাইল হরগৌরী নিরখিয়া॥
পর্ব্বত হইতে নামি চৈতন্য গোঁসাই।
চলিলা উত্তরে মুহি পিছে পিছে যাই॥

একেবারে দেখা গেল সহ্য কুলাচল।
কুলাচল দেখি প্রভু আনন্দে বিহ্বল॥
মহেন্দ্র মলয় গিরি দেখেছি নয়নে।
সহ্যগিরি শোভা আহা না যায় কথনে॥
দূর হৈতে নীলবর্ণ রেখা যায়।
সেই স্থানে দেখিবারে মোর প্রভু ধায়॥

গম্ভীর ভাবেতে গিরি আছে দাঁড়াইয়া।
গিরি দেখি চিত্ত যেন উঠিল নাচিয়া॥
প্রভু বলে এই গিরি আনন্দের ধাম।
আনন্দের ধাম বলি করিলা প্রণাম॥
সহ্যকুলাচল দেখি হয় অগ্রসর।
পুলকে পূরিল যেন প্রভু বিশ্বম্ভর॥
চলিলা উত্তরে সহ্য গিরি ত্যাগ করি।
অপার আনন্দ মুখে বলে হরি হরি॥
কোন অভিলাষ নাই অতি দীনবেশ।
ভক্তিরসে ভাসাইলা প্রভু নানা দেশ॥
কৌপীন পরণে ধূলা মাখা সর্ব্বগায়।
দেখিলে পাগল বটে এই মনে হয়॥

ক্রমে গোরাচাঁদ পূর্ণনগরে আইলা।
বহুত পণ্ডিত তথা আসি ঝাঁকি দিল॥
বহু লোক করে হেথা শাস্ত্র অধ্যয়ন।
ক্রমে ক্রমে বহু লোক দিলা দরশন॥
অচ্ছসর নামে এক জলাশয় আছে।
বসিলা নিমাই মোর গিয়া তার কাছে॥
বিস্তৃত বকুল বৃক্ষ শোভে তদুপরি।
মোত্র প্রভু বৈসে তার তলে আড্ডা করি॥
শত শত পণ্ডিত বিরাজে এই খানে।
রাত্রিদিন নানা শাস্ত্র পণ্ডিতে বাখানে॥
শত শত পড়ুয়া আসিয়া এই খানে।
নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে গুরুস্থানে॥
এই স্থানে বহু লোক নিপুণ বিদ্যায়।
শত শত চতুষ্পাঠী মধ্যে শোভা পায়॥
ভাগবত যেই জন করে অধ্যয়ন।
তাহারে পণ্ডিত বলি মানে সর্ব্বজন॥
গীতা আর ভাগবত যেই নাহি জানে।
তাহারে পণ্ডিত বলি কেহ নাহি মানে॥
একই পণ্ডিত ভাগবত ব্যাখ্যা করে।
তাহা শুনি প্রভুর নয়নে অশ্রু ঝরে॥

এক জন ব্রহ্মবাদী পণ্ডিত আইল।
তার সব তর্কবাদ প্রভু খণ্ডাইল॥
অনেক বৈষ্ণব সাধু একত্র হইয়া।
প্রভুর ভকতি দেখি উঠিল জাগিয়া॥
নয়ন মুদিয়া প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
নয়ন বহিয়া অশ্রু পড়ে বক্ষঃস্থলে॥
প্রভু বলে মোর প্রাণ মুকুন্দ মুরারি।
আসিয়া উদিত হও হৃদয়ে আমারি॥
রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিময় বিশ্বাধার।
কৃষ্ণ বিনা এ বিশ্বের কেবা লয় ভার॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যার লোমকূপে।
সেই প্রাণকৃষ্ণে মুহি হেরিব কিরূপে॥
মাটি খেয়ে মার কোলে মুখ বিস্তারিল।
অমনি জননী মুখে ব্রহ্মাণ্ড দেখিল।

সেই কৃষ্ণ লাগি মোর ব্যাকুল অন্তর।
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর হয়েছে কাতর॥

একজন পণ্ডিত বলিলা আসি কাছে।
এই সরোবর মধ্যে তব কৃষ্ণ আছে॥
এই বাণী শুনি প্রভু চমকি উঠিলা।
লোমাঞ্চিত কলেবরে উঠে দাণ্ডাইলা॥
এমন অশ্রুর বেগ কভু দেখি নাই।
কৃষ্ণের বিরহে কেঁদে আকুল নিমাই॥
কৃষ্ণ বলি ফুলে ফুলে কান্দিতে লাগিল।
বলে কৃষ্ণ বিনা প্রাণ বিফল হইল॥
অশ্রুজলে ভিজাইলা পৃথিবীর কোল।
কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে মুখে বলে হরিবোল॥
একবার বলে মোরে একি বিড়ম্বনা।
কৃষ্ণ বিনা আর প্রাণে সহেনা যাতনা॥

পুনরপি সেইজন বলে ত আসিয়া।
সন্ন্যাসী তোমার কৃষ্ণ জলে লুকাইয়া॥
এইবারে মহাপ্রভু শুনি তার বাণী।
প্রেমাবেশে জলে ঝাঁপ দিলেন অমনি॥
সরোবর মধ্যে পড়ি বহুতর লোক।
ডাঙ্গায় প্রভুরে তুলি করে নানা শোক॥
যেইজন ব'লেছিল কৃষ্ণ আছে জলে।
সমস্ত পণ্ডিত তারে মন্দ কথা বলে॥

প্রভু বলে কেন বৃথা ভৎর্সনা মহারাজে।
জলে স্থলে শূন্যে কৃষ্ণ নিয়ত বিরাজে॥
আশে কৃষ্ণ পাশে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগময়।
সেই দেখিবারে পায় যেই ভক্ত হয়॥
ভক্তিই পরম তত্ত্ব সংসার ভিতরে।
ভক্তিমান মুক্তি শিরে পদাঘাত করে॥
যেজন মায়ার চক্র বুঝিতে না পারে।
বড়ই দুর্ভাগ্য সে হয় এ সংসারে॥

মিছা হিটা * মিছা ভিটা মিছা বাড়ী ঘর।
খাবার লাগিয়া মূর্খ বিকল অন্তর॥
কেবা আত্মপর হয় কেবা পিতা মাতা।
কার গলে হাত দিয়া বল তুমি ভ্রাতা॥
স্ত্রীপুরুষে ভেদ নাই চর্ম্মগত ভেদ। †
এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতেছে বেদ॥
মোহ অন্ধকারে জীব আপনা পাশরি।
বদনেতে একবার নাহি বলে হরি॥
ঐশ্বর্য্যের মিছা গর্ব্ব না করিও ভাই।
হরেকৃষ্ণ বলি কাল কাটাও সদাই॥
এই বিশ্ব ঢাকিয়াছে পাপ অন্ধকারে।
হরি ভিন্ন কিছু সত্য নাহিক সংসারে॥
পাখী দুটী দেহবৃক্ষ যেদিন ছাড়িবে।
সেইদিন জড় দেহ পড়িয়া রহিবে॥
জাগিয়া স্বপন আর কেন দেখ ভাই।
কেহ না বাঁচিবে চির মরিবে সবাই॥
এস ভাই সবে মিলে হরিধ্বনি করি।
নাম শুনে কৃতান্ত কাঁপিবে থর হরি॥
বড়ই প্রভাবী রাজাধিরাজ সম্রাট।
একদিন অবশ্য ভাঙ্গিবে রাজ্যহাট॥
রাজ্য করে মহারাজ আপনার দাপে।
তবে কেন তাঁর চিত্ত দহে তিন তাপে॥
বহুমূল্য মণিমুক্তা সঙ্গে নাহি যাবে।
অসার অনিত্য ধন বুঝ অনুভাবে॥
ভক্তিসহ হরে কৃষ্ণ বল ভাই মুখে।
সকলে থাকিবে তবে সদানন্দ সুখে॥
মায়ায় মোহিত হয়ে ভুলিয়াছ সব।
কিসের লাগিয়া সবে করহ গৌরব॥

---

* হিটা ?

† "অভেদ পুরুষ নারী যে দিন জানিবে।
সেদিন প্রেমের তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফুরিবে॥
করচা ৯ পৃষ্ঠা॥

সপ্ত কুলাচল কালে ঘুচিয়া যাইবে।
জড় জগতের মধ্যে কিছুনা রহিবে ॥
ভক্তিসহ ভাব সেই সত্য সনাতন।
আঁটিয়া ধরহ সবে তাঁহার চরণ ॥
সর্ব্বতাপ হরিবেন প্রভু গদাধর।
বৈকুণ্ঠ সমান হবে এই চরাচর ॥
বিষয় বিভবে লিপ্ত হয় যেই জন।
কাটিতে না পারে সেই বিষম বন্ধন ॥
ইচ্ছাকরি যেই জন পড়য়ে বন্ধনে।
তাহারে বিষম মূর্খ কহে সর্ব্বজনে ॥
হরিনাম অস্ত্রে কাট মায়ার বন্ধন।
অনায়াসে নিত্যধামে করিবে গমন ॥
জন্ম মৃত্যু জরা নাহি হবে বার বার।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাক ঘুচিবে আঁধার ॥
প্রারব্ধ কাটাও সবে অতি দীন ভাবে।
তবে শোক তাপ দুঃখ দূরে চলি যাবে ॥

ঝাঁকিল * বহুত লোক প্রভুরে দেখিতে।
অসংখ্য পণ্ডিত আসে বিচার করিতে ॥
কেহ বলে এ সন্ন্যাসী মানুষ ত নয়।
কেহ বলে এই জন মহাজন হয় ॥
কাহারো কথায় প্রভু বাক্য নাহি কহে।
হরিনামে দুনয়নে প্রেমধারা বহে ॥
দুই চক্ষু মুদি প্রভু হরিনাম করে।
উলটি পালটি পড়ে ভূমির উপরে ॥

প্রভু বলে কোন তীর্থে যাব অতঃপর।
পথ বাতালিয়া দেহ কোথা ভোলেশ্বর ॥
পাটস গ্রামের কাছে আছে গোর ঘাট।
সেইখানে ভোলেশ্বর নামে মহাপাট ॥

ভোলেশ্বরে মহাদেব করেন বিরাজ।
এই উপদেশ দিলা তুন্নু মহারাজ ॥
তুন্নু নামে বিপ্রবর বড়ই পণ্ডিত।
তাহার কথায় প্রভু হইলা বিদিত ॥

তুন্নু বলে ভোলেশ্বর আছে সেই খানে।
শুনি ৷ চলিলা প্রভু শিব বিগুমানে ॥
ভোলেশ্বরে মেলা হয় বৎসর বৎসর।
শুনিয়া প্রভুর তবে নাচিল অন্তর ॥
মোর পানে চেয়ে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
বলে চল ভোলেশ্বর যাই পিছাইয়া ॥
পর্ব্বতে পর্ব্বতে তবে বহু পথ হাটি।
ভোলেশ্বরে গিয়া দেখি তীর্থ পরিপাটি ॥
প্রকাণ্ড মন্দির আছে পর্ব্বত উপরে।
তার মধ্যে দেখিলাম প্রভু ভোলেশ্বরে ॥
এইখানে সিদ্ধকূপ আছে বিগুমান।
তার জল তুলি তবে প্রভু করে স্নান ॥
ভোলেশ্বর দেখি প্রভুর প্রেম উপজিল।
জোড় হস্তে স্তব স্তুতি বহুত করিল ॥
অজ্ঞান হইয়া গোরা পড়িয়া ধরায়।
উলটি পালটি কত গড়াগড়ি যায় ॥

ভোলেশ্বর দরশন করি গোরা রায়।
নিকটে দেবলেশ্বর দেখিবারে ধায় ॥
দেখিয়া দেবলেশ্বর প্রভু গুণমণি।
প্রণাম করিয়া তবে লুঠায় ধরণি ॥
প্রেমে গদ গদ হয়ে বহুস্তব করে।
প্রভুরে দেখিতে লোক আসে ভক্তিভরে ॥
বিরাজে দেবলেশ্বর পর্ব্বত উপরি।
তার বহুদূরে শোভে জিজুরী নগরী ॥

খাণ্ডবা নামেতে দেব আছে জিজুরীতে।
প্রভুর সহিতে যাই খাণ্ডবা দেখিতে ॥
যে নারীর বিবাহ না হয় নানা বাদে।
তার পরিণয় হয় খাণ্ডবা প্রসাদে ॥

---

* ঝাঁকিল—ঝুঁকিয়া পড়িল, দলে দলে উপস্থিত হইল।

খাণ্ডবার কাছে কন্যা পিতামাতা আনি।
খাণ্ডবারে কন্যা দেয় বহু ভক্তি মানি॥
দরিদ্র পিতার কন্যা এখানে থাকিয়া।
খাণ্ডবার সেবা করে আদর করিয়া॥
খাণ্ডবারে পতি ভাবি কত শত নারী।
ক্রমে ক্রমে হইয়াছে পথের ভিকারী॥
প্রতারিত হয়ে সবে খাণ্ডবার স্থানে।
বেশ্যাবৃত্তি কত নারী করিছে এখানে॥
খাণ্ডবার পত্নী বলি পাপ কর্ম্ম করে।
তাহাদের বড়ই দুর্গতি হয় পরে॥
তীর্থ করিবারে এথা আসে বহুজন।
কৌশলে তাদের করে নরকে পাতন॥
এইস্থানে আসে যত দরিদ্র কুমারী।
বিয়া করে বলে মোরা খাণ্ডবার নারী॥
ইহা শুনি দেখিবারে প্রভু নারীগণে।
উপস্থিত হৈলা তথা অতি সঙ্গোপনে॥
ইহাদের ডাকে লোকে মুরারি বলিয়া।
প্রভুর হইল দয়া মুরারি দেখিয়া॥
মুরারি গণের দুঃখ শুনিলে শ্রবণে।
দয়া উপজয়ে অতি নিঠুরের মনে॥
কেমন নিঠুর পিতা বলিতে না পারি।
কেমনে মুরারি করে আপন কুমারী॥
এই বাক্য শুনি প্রভু যত নারীগণে।
উদ্ধার করিতে যায় মুরারিপ্রাঙ্গণে॥
মুহি বলি সে স্থানেতে গিয়া কাজ নাই।
না শুনিলা মোর বাণী চৈতন্য গোঁসাই॥

মুরারিপল্লীর মধ্যে মোর প্রভু গিয়া।
পবিত্র করিল সবে হরিনাম দিয়া॥
রমণীগণের দুঃখ সহিতে না পারি।
উদ্ধার করিতে চাহে যতেক মুরারি॥
আশ্চর্য্য প্রভুর ভাব শুনি নিজ কাণে।
ক্রমে ক্রমে বহুনারী আসে এই স্থানে॥

নারীগণে বলে প্রভু কর হরিনাম।
নাম বলে অবশ্য পাইবে নিত্যধাম॥
বড়ই দয়াল হরি অগতির গতি।
তাঁহাকে ভাবহ সবে নিজ নিজ পতি॥
কৃষ্ণকে পাইতে পতি যত গোপীগণ।
কাত্যায়নী ব্রত করে হয়ে শুদ্ধমন॥
কৃষ্ণ পতি হইলে না রবে ভবভয়।
কৃষ্ণ সকলের পতি জানহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সদা ডাক ভক্তি ভরে।
সর্ব্বদা বলহ মুখে হরে কৃষ্ণ হরে॥

এত বলি প্রভু মোর নাম আরম্ভিল।
অমনি তাঁহার দেহ পুলকে পূরিল॥
দেখিয়া প্রভুর ভাব যত নারীগণ।
পূজিতে লাগিলা সবে প্রভুর চরণ॥
প্রভুবলে ভিক্ষা করি গৃহস্থের দ্বারে।
নিতান্ত অস্পৃশ্য মুহি ছুঁওনা আমারে॥
ভক্তি করি হরি বল ঘুচিবেক তাপ।
নামবলে ভস্ম হবে সকলের পাপ॥
না বুঝিয়া যেই জন পাপে মগ্ন হয়।
হরি নাম বলে তার পাপ হয় ক্ষয়॥

উপদেশ শুনি যত খাণ্ডবার নারী।
প্রভুর নিকটে দাঁড়াইলা সারি সারি॥
আসিয়া ইন্দিরা বাই কর জোড়ে কয়।
দয়া কর আমারে সন্ন্যাসী মহাশয়॥
বৃদ্ধ হইয়াছি মুহি কুমর্ম্ম করিয়া।
উদ্ধার করহ মোরে পদধূলি দিয়া॥
এত বলি ইন্দিরা ধূলায় লুটি যায়।
নামদিয়া প্রভু উদ্ধারিল ইন্দিরায়॥
হরিনাম পেয়ে তবে ইন্দিরা সুন্দরী।
গৃহ থেকে বাহিরিল সব ত্যাগ করি॥
সেই দিন হৈতে যত খাণ্ডবার নারী।
মত্ত হৈলা হরিনামে চক্ষে বহে বারি॥

এমন দয়াল প্রভু কভু দেখি নাই ।
কত পাপী উদ্ধারিল লেখা জোখা নাই ॥
মুরারিগণের ভক্তি দেখিয়া নয়নে ।
প্রভাতে যাইতে চাহে চোরানন্দী বনে
গ্রাম্যলোক বলে সেথা কিবা প্রয়োজন ।
পাপের আকর হয় চোরানন্দী বন ॥
চোরানন্দী বনে বহু ডাকাতের বাস ।
সেখানে যাইতে কেন কর অভিলাষ ॥
প্রভুবলে যাব মুহি চোরানন্দী বন ।
চোরানন্দী দেখে সিদ্ধ হবে প্রয়োজন ॥
গ্রাম্যলোক বলে সেথা না যাও সন্ন্যাসী
সাধুর গমন সেথা নাহি ভালবাসি ॥
বহুচোর বহু দস্যু থাকে সেই স্থানে ।
জীবন সংশয় হবে যাইলে সেথানে ॥

প্রভু বলে কিবা মোর লবে দস্যুগণ ।
এখনি সেখানে মুহি করিব গমন ॥
রাম স্বামী বলে প্রভু চোরানন্দী বন ।
কোন তীর্থ নহে তথা কিবা প্রয়োজন ॥
যদি কোন অমঙ্গল করে দস্যুগণ ।
তোমার বিরহে লোক ত্যজিবে জীবন ॥

প্রভু বলে ভয় নাহি কর রাম স্বামী ।
হরিনামে দস্যুগণে মাতাইব আমি ॥
এত বলি প্রভু চোরানন্দীতে চলিল ।
চোরানন্দী গিয়া বৃক্ষতলায় বসিল ॥
এই স্থানে আড্ডা করি বহু দুষ্টজন ।
ডাকাতি করিয়া করে জীবন যাপন ॥
একজন লোক আসি কাঁই মাই করি ।
কি কহিল আমি সব বুঝিতে না পারি ॥
তার বাক্য বুঝি সব প্রভু সমজিয়া ।
কাঁই মাই করি তারে দিলেন বুঝিয়া ॥
সেই লোক ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল ।
ইতি উতি তাকাইয়া বনে প্রবেশিল ॥

নারোজী নামেতে এক মহাবলবান্ ।
অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে করি হৈল আগুয়ান ॥
দুই চারিজন ক্রমে আসি দেখা দিলা ।
সন্ন্যাসী দেখিয়া সবে প্রণাম করিলা ॥
নারোজী বলিলা তুমি চল মোর স্থানে ।
আজিকার রজনীতে থাকিবে সেখানে ॥
নারোজীর কথা শুনি প্রভু তবে বলে ।
রাত্রি কাটাইব আজি থাকি বৃক্ষতলে ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য নারোজী শ্রবণে ।
ভিক্ষা আনি দিতে বলে দুই চারি জনে
নারোজীর কথা শুনি ছুটিল সবাই ।
যোগাসনে হরিনামে বসিল নিমাই ।
কেহ কাষ্ঠ চিনি আনে কেহ বা তণ্ডুল ।
কেহ দুগ্ধ কেহ ঘৃত কেহ ফল মূল ॥
রাশি রাশি খাদ্য আনি তারা যোগাইল ।
বহু খাদ্য দেখে মোর লালসা বাড়িল ॥
বহু দেশ ভ্রমিলাম প্রভুর সহিতে ।
এত খাদ্য কোন স্থানে না পাই দেখিতে ॥
নানা দ্রব্য যোগাইয়া চারিদিক ঘেরি ।
দাঁড়াইলা নরোজীর লোক সারি সারি ॥

হরিনাম করিতে করিতে প্রভু মোর ।
সেইকালে কৃষ্ণ প্রেমে হইলা বিভোর ॥
কোথা রহে দুগ্ধ চিনি কোথায় তণ্ডুল ।
পদস্পর্শে ছিন্ন ভিন্ন হৈলা ফল মূল ॥
দুই চারি জন বলে কেমন সন্ন্যাসী ।
ইচ্ছা করি নষ্ট করে খাদ্যদ্রব্য রাশি ॥
নারোজী বলিল কভু দেখি নাই হেন ।
সন্ন্যাসী দেখিয়া মোর প্রাণ কাঁদে কেন ॥
কত পাপ করিয়াছি কে পারে বলিতে ।
আজি কেন ইচ্ছা হয় কৌপীন পরিতে ॥
কিসের লাগিয়া আজি প্রাণ মোর কাঁদে ।
আমি কি দিলাম পদ সন্ন্যাসীর ফাঁদে ॥

নষ্ট হৈল সব দ্রব্য নাহি কর ভয়।
পুনঃ যোগাইব আনি এই দ্রব্য চয় ॥

এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নারোজী আপনি।
এক দৃষ্টে চেয়ে দেখে গোরা গুণমণি ॥
প্রভুর নয়ন বাহি অশ্রুধারা বহে।
পুতুলের প্রায় সবে দাঁড়াইয়া রহে ॥
এই কথা শুনি ক্রমে ডাকাতের দল।
একে একে দেখা দিল ছাড়ি বনস্থল ॥
অপরাহ্ণ কালে মোর গোরা গুণমণি।
প্রেমে মূরছিত হয়ে পড়িলা ধরনী ॥
প্রেমে গদগদ তনু ধূলায় ধূসর।
অশ্রুধারা হৃদয়েতে পড়ে দর দর ॥

কান্দিয়া নারোজী বলে শুনহ সন্ন্যাসী।
কি মন্ত্র পড়িলে তুমি বলহ প্রকাশি ॥
দেখিয়া তোমার ভাব হয় মোর মনে।
আর না করিব পাপ থাকি এই বনে ॥
ষাটি বর্ষ বয়ঃক্রম হয়েছে আমার।
পাপ কার্য্য না করিব ছাড়িব সংসার ॥
অতি দুরাচার আমি ব্রাহ্মণতনয়।
মোরে পদধূলি দিতে না কর সংশয় ॥
পুত্রকন্যা নাহি মোর নাহিক সংসার।
তবে কেন পাপ কর্ম্ম করি আমি আর ॥
উদর পোষণ হয় লোকে ভিক্ষা দিলে।
তবে কেন থাকি মুহি দস্যুসহ মিলে ॥
বড় ঘৃণা হইয়াছে কুকর্ম্মের প্রতি।
আর না রহিব মুহি দস্যুদলপতি ॥
এত বলি নারোজী দলের প্রতি চায়।
অস্ত্র শস্ত্র সেই দণ্ডে টানিয়া ফেলায় ॥

প্রভু কহে নারোজী আমার কথা শুন।
আর কত কহিব তোমারে পুনঃ পুনঃ ॥
কৌপীন পরিয়া কর লজ্জা নিবারণ।
মাগিয়া খাচিয়া কর উদর পোষণ ॥

কাহার লাগিয়া অর্থ করহ সঞ্চয়।
পিতা মাতা ভাই বন্ধু কেহ কার নয় ॥
এক মুষ্টি অন্নে যদি দেহরক্ষা হয়।
তবে কেন পাপে কর অর্থের সঞ্চয় ॥
অঞ্জলি পাত্রেতে পিয় ঝরণার জল।
বহু পাত্র সংগ্রহ করিয়া কিবা ফল ॥
কুবের সমান যত আছে ধনিগণ।
একদিন প্রেতপুরে করিবে গমন ॥
যে পথে দরিদ্র যাবে এ দেহ ত্যজিয়া।
অবশ্য সম্রাট যাবে সেই পথ দিয়া ॥
আমার আমার করি বৃথা কেন মর।
প্রেম ভক্তি সহ ভাই হরিনাম কর ॥

এই উপদেশ শুনি নারোজী ব্রাহ্মণ।
আমাদের সঙ্গে চাহে করিতে গমন ॥
নারোজী কহিলা সব তীর্থ দেখাইব।
তীর্থে তীর্থে আপনার পেছনে যাইব ॥
এত দিন চক্ষু অন্ধ ছিল ভ্রান্তি ধূমে।
আজি হৈতে অস্ত্র শস্ত্র ফেলিলাম ভূমে ॥
এই হস্তে কত নরহত্যা করিয়াছি।
এই মুখে কত জনে কটু বলিয়াছি ॥
আর না রহিব মুহি ডাকাতের পতি।
কি পথ দেখালে মোরে অগতির গতি ॥
জঙ্গলের মধ্যে থাকি সদা লুকাইয়া।
পাপে দেহ জর জর না দেখি ভাবিয়া ॥

এত বলি দস্যুপতি সব তেয়াগিয়া।
চলিল প্রভুর সঙ্গে কৌপীন পরিয়া ॥
কে কোথা চলিয়া গেল তবে দস্যুগণ।
নারোজী মোদের সঙ্গে করে আগমন ॥
তার পরে চোরানন্দী কানন হইতে।
যাত্রা করি চলে প্রভু খণ্ডুলা দেখিতে ॥
মূলানদী বহে এথা অতি বেগবতী।
খণ্ডুলায় গিয়া প্রভু কহে মোর প্রতি ॥

প্রভু বলে এই নদী পুণ্যতীর্থ হয়।
এখানে করিলে স্নান পাপ হবে ক্ষয়॥
প্রভুর আজ্ঞায় মুহি সিনান করিয়া।
নগরের মধ্যে যাই ভিক্ষার লাগিয়া॥
নারোজী ঠাকুর মোর পিছে পিছে যায়।
ভিক্ষা করি ফিরিলাম অধিক বেলায়॥

ক্রমে দুই চারিজন খণ্ডলা নিবাসী।
প্রভুর নিয়ড়ে সব দেখাদিল আসি॥
শুদ্ধমনে চারি ধারে বসিলা সকলে।
কেহ বলে চল প্রভু আমার মহলে॥
বড় আতিথেয় হয় যত খণ্ডলিয়া।
টানাটানি করে সবে প্রভুরে লইয়া॥
অবশেষে সকলে বিবাদ বাধাইল।
খুনাখুনি করিবারে প্রস্তুত হইল॥
এক জন বলে মুহি আগে দেখিয়াছি।
আর জন বলে আমি ভিক্ষা আনিয়াছি॥
এইরূপে বিবাদ করয়ে পরস্পরে।
ভাব দেখি প্রভু মোর হাসিলা অন্তরে॥
এক জন ধনী বলে আমার বাগানে।
ভিক্ষা দিব আজি গিয়া রহ সেই খানে॥
পরিধানে বস্ত্র নাই একি বিড়ম্বনা।
একখানি বস্ত্র দিতে করেছি বাসনা॥
যদি কিছু অর্থ চাহ পথের লাগিয়া।
যা চাহিবে তাই দিব তখনি আনিয়া॥

হাসিয়া কহেন প্রভু শুন মহারাজ।
বিলাস বিভবে মোর নাহি কোন কাজ॥
পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র বহু করি মানি।
কোন প্রয়োজন অর্থে নাহি এই জানি॥
বিভবের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে অহঙ্কার।
সেই অহঙ্কারে বাড়ে কলুষের ভার॥
এই যে ব্রহ্মাণ্ড তুমি দেখিছ নয়নে।
কোথায় চলিয়া যাবে ভাবি দেখ মনে॥
বিলাস বিভব সব বিলুপ্ত হইবে।
কেবল ব্রহ্মাণ্ডপতি বিরাজ করিবে॥
ভিক্ষা আনিয়াছে মোর সঙ্গী দুইজন। *
অধিক ভিক্ষায় আর কিবা প্রয়োজন॥
কোনরূপে দেহ রক্ষা না করিলে নয়।
তাই কোন দিন কিছু ভিক্ষা নিতে হয়॥
তবে বহু খাদ্য লয়ে বল কি হইবে।
দরিদ্র দুঃখীরে দেহ অভাব পূরিবে॥
প্রেমসহ হরি বল বসি বৃক্ষ-তলে।
বন্ধন কাটিতে তবে পারিবে সকলে॥
মায়ার বন্ধনে থাকি কোন সুখ নাই।
প্রেম ভক্তি সহ মুখে হরি বল ভাই॥
ঈশ্বরের প্রেম ভক্তি রসেতে গঠন।
ভক্তে জানে বিষামৃতে একত্র মিলন॥
কালসূত্রে স্বর্গ ভোগ যেই কৃষ্ণ ভজে।
বৈকুণ্ঠে নরক তার যেই কৃষ্ণ ত্যজে॥ †

এত বলি প্রভু মোর বাক্য না কহিল।
নয়ন মুদিয়া হরি বলিতে লাগিল॥
পুলকের ভরে জটা খসিয়া পড়িল।
খুলে গেল বহির্বাস নাচিতে লাগিল॥
প্রেমেতে বিভোর অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
কি কব প্রেমের কথা কহিতে বিস্তর॥
হরিনাম করি রাত্রি বসিয়া কাটায়।
কাছে বসি স্বেদবারি নারোজী মুছায়॥

প্রভাতে উঠিয়া প্রভু নাসিক নগরে।
চলিলা করিতে তীর্থ বিশুদ্ধ অন্তরে॥

---

* নারোজী এবং গোবিন্দ।

† যে ব্যক্তি দৈব যোগে (কাল সূত্রে) কৃষ্ণকে ভজনা করে তাহারই স্বর্গ ভোগ হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি কৃষ্ণকে ত্যাগ করে সে বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ও নরক ভোগ করে।

শূর্পণখা রাক্ষসীর নাসিকা ছেদন।
এই স্থানে করেছিলা ঠাকুর লক্ষণ ॥
ইহার উত্তর ভাগে ত্রিম্বুকের কাছে।
রামের কুটীর ক্ষেত্র বিদ্যমান আছে ॥
সেই খানে মহাপ্রভু করিয়া গমন।
স্তব স্তুতি করি শেষে করিলা কীর্ত্তন ॥
রামের চরণচিহ্ন আছে এই খানে।
ইহা শুনি ধাইয়া চলিল বন পানে ॥
নিবিড় বনের মধ্যে ঝরণার ধারে।
চরণ দুখানি শোভে প্রস্তর উপরে ॥
চরণের চিহ্ন প্রভু করিয়া পরশ।
গাঢ়তর প্রেমভরে হইলা অবশ ॥
পুলকে মাথার জটা নাচিয়া উঠিল।
সেই ক্ষীণ দেহ যেন ফুলিতে লাগিল ॥
প্রভু বলে কোথা রাম প্রাণের ঈশ্বর।
হৃদয়ে দেখা দিয়া জুড়াহ অন্তর ॥
অবশেষে মোর কণ্ঠ আঁকড়ি ধরিয়া।
কোথা মোর রাম বলি উঠিল কান্দিয়া ॥

পদ্মগন্ধ বাহিরিছে প্রভুর শরীরে।
সমীরণ বহিতে লাগিল ধীরে ধীরে।
কি কব প্রেমের কথা কহিতে ডরাই।
এমন আশ্চর্য্য ভাব কভু দেখি নাই ॥
কৃষ্ণ হে বলিয়া ডাকে কথায় কথায়।
পাগলের ন্যায় কভু ইতি উতি চায় ॥
কি জানি কাহারে ডাকে আকাশে চাহিয়া।
কখন চমকি উঠে কি যেন দেখিয়া ॥
উপবাসে কেটে যায় দুই এক দিন।
অন্ন না খাইয়া দেহ হইয়াছে ক্ষীণ ॥

তার পরে পঞ্চবটী করিয়া প্রবেশ।
লক্ষণের প্রতিষ্ঠিত দেখিলা গণেশ ॥
একদিন গুহামধ্যে পঞ্চবটী বনে।
ভিক্ষা হতে এসে মুহি দেখি সঙ্গোপনে ॥

নিথর নিঃশব্দ সেই জনশূন্য স্থান।
মাঝে মাঝে বাস করে দুই চারি জন ॥
ঝিম ঝিম করিতেছে বনের ভিতর।
চক্ষু মুদি কি ভাবিছে গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥
অঙ্গ হৈতে বাহির হয়েছে তেজরাশি।
ধ্যান করিতেছে মোর নবীন সন্ন্যাসী ॥
এই ভাব হেরে মোর ধাঁধিল নয়ন।
গুড়ি গুড়ি কাছে যাই করিতে দর্শন ॥
নারোজী গিয়াছে কোথা ফল আনিবারে।
দাণ্ডাইয়া রহিলাম মুহি এক ধারে ॥
পদশব্দ পেয়ে প্রভু যেন আচম্বিতে।
সব ভাব সংবরিল দেখিতে দেখিতে ॥
কোথা হতে ফল মূল নারোজী আহরি।
দাঁড়াইলা সম্মুখেতে জোড় হাত করি ॥
ভোগ দিয়া কিঞ্চিৎ খাইয়া গোরা রায়।
বসিয়া বসিয়া সব রজনী কাটায় ॥

পঞ্চবটী তেয়াগিয়া মোর গৌর হরি।
প্রভাতে চলিয়া যায় দমন নগরী ॥
একদিন দমন নগরে না রহিল।
দমন ছাড়িয়া প্রভু উত্তরে চলিল ॥
তার পর পক্ষকাল ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া।
পথে পথে কাটাইলা গোরা বিনোদিয়া ॥

সুরথ প্রতিষ্ঠিত অষ্টভুজার মন্দির

ক্রমে ক্রমে সুরথের রাজ্যে চলি যায়।
অষ্টভুজা দেখি প্রভু ধরণী লুটায় ॥
অষ্টভুজা ভগবতী দেখিয়া নয়নে।
তিন দিন বাস করে প্রভু সেই খানে ॥
অষ্টভুজা প্রতিষ্ঠিত সুরথ রাজার।
ভগবতী দেখে হৈল আনন্দ অপার ॥
দেবীর মন্দিরে ছিল একই সন্ন্যাসী।
প্রভুরে পুছিতে কিছু হৈলা অভিলাষী ॥

স্থাসী বলে এস এস সন্ন্যাসী গোঁসাই।
তোমায় সমান সাধু কভু দেখি নাই॥
তোমারে দেখিয়া ভক্তি উপজিছে মনে।
সংসার সাগর বল তরিব কেমনে॥
কিরূপে ভজিতে হয় পরম ঈশ্বর।
ইহা বলি ব্যাকুলতা ঘুচাও আমার॥

প্রভু বলে সার তত্ত্ব কিছু নাহি জানি।
মনের আঁধার সব ঘুচাবে ভবানী॥
সুন্দর নায়ক দেখি সামান্য নায়িকা।
যেই ভাবে দেখে তারে হয়ে রাগাত্মিকা॥
সেই ভাবে কৃষ্ণকে ডাকহ বার বার।
আপনি ঘুচিয়া যাবে মনের আঁধার॥

কহিতে কহিতে কথা একই ব্রাহ্মণ।
ছাগ বলি দিতে আসে দেবীর সদন॥
প্রভু বলে বলি দাও ভক্ষণের তরে।
নাহি জান কোথায় হইবে গতি পরে॥
পবিত্র মূরতি দেবী শাস্ত্রের বচন।
কেমনে করেন তিনি অভক্ষ্য ভক্ষণ॥
লক্ষ বলি দিয়াছিল সুরথ ভূপতি।
প্রেত পুরে লক্ষ অসি পড়ে তার প্রতি॥
আলোচনা নাহি কর শাস্ত্রের বচন।
পশু হিংসা করি কর ধর্ম্ম আচরণ॥
মাংসাশী রাক্ষসগণ খাইবার তরে।
ব্যবস্থা দিয়াছে পশু হিংসা করিবারে॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
জীবে দয়া কর হবে আনন্দ উদয়॥
আঁটি সাঁটি করি মায়া করেছে বন্ধন।
বিনা অস্ত্রে কিরূপেতে করিবে ছেদন॥
তামস আহারে রতি তাই মেষ ছাগ।
কাটিতে দেবীর কাছে কর অনুরাগ॥
পশু হিংসা করিয়া পাইবে পরিত্রাণ।
সেই লাগি আনিছ করিতে বলিদান॥
আত্মারে বাহির কর শরীর হইতে।
মৃত দেহ মধ্যে আত্মা পার কি পূরিতে॥
দেবীর সম্মুখে যদি কেহ ভক্তি ভরে।
নরবলি রূপে তব শিরশ্ছেদ করে॥
কেমন তোমার চিত্ত করে বল ভাই।
পশু ছাড়ি দেহ মুহি চক্ষে দেখে যাই॥
অষ্টভুজা ভগবতী মত্স্যমাংস খাবে।
একথা শুনিলে সাধু হাসিয়া উড়াবে॥
সনাতন ধর্ম্মে দেহ নিজ নিজ মন।
শাস্ত্র অনুসারে ছাড় মন্দ আচরণ॥
পরম বৈষ্ণবী দেবী মাংস নাহি খায়।
তবে কেন বলিদানে ভুলাও তাঁহায়॥
করিলে জীবের হিংসা যদি ধর্ম্ম হয়।
তবে কেন দস্যুগণে সাধু নাহি কয়॥
প্রতিদিন মৎস্যজীবী বহু মৎস্য মারে।
তবে কেন ধার্ম্মিক না কহিব তাহারে?
নরহত্যা পশুহত্যা হয় মহা পাপ।
এই পাপ আচরিলে বাড়িবে ত্রিতাপ॥
অষ্টভুজা ভগবতী দেখিবারে গিয়া।
এই উপদেশ দিলা শাস্ত্র বিচারিয়া॥

দুর্গারে পূজিতে এসেছিল যেই জন।
ভক্তি করি প্রভু বাক্য করিলা শ্রবণ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য বৈরাগ্য হইল।
বলির ছাগল তবে ব্রাহ্মণ ছাড়িল॥
পুষ্প আর বিল্বদলে পূজি বিপ্রবর।
আনন্দে ফিরিয়া গেল আপনার ঘর॥
দেবীর সম্মুখে প্রভু আঁটিয়া বসিল।
জোড় হস্তে ভবানীর স্তব আরম্ভিল॥

স্তুতি নতি ভবানীরে করি গোরা রায়।
মহাতীর্থে তাপতী নদীর দিকে ধায়॥
তিন সন্ধ্যা স্নান করি তাপতীর জলে।
বামন দেবের মূর্ত্তি দেখিবারে চলে॥

একই প্রান্তর ভূমে তাপতীর কাছে।
বামন দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে ॥
বলি রাজা এই মূর্ত্তি করিলা স্থাপন।
তাপতী হইল তীর্থ ইহার কারণ ॥
বামন করিলা স্নান তাপতীর জলে।
সেই লাগি তাপতীরে মহাতীর্থ বলে ॥
বামন দেবের পদে নমস্কার করি।
যজ্ঞ কুণ্ড দেখিবারে যায় গৌর হরি ॥

ভঁরোচ নগরে যজ্ঞ কুণ্ড দেখিবারে।
তাপতী ছাড়িয়া যায় নর্ম্মদা ধারে ॥
ভঁরোচেতে যজ্ঞ কুণ্ড বলিরাজা করে।
কুণ্ড দেখিবারে যায় প্রফুল্ল অন্তরে ॥
প্রকাণ্ড কুণ্ডের খাত দেখিয়া নয়নে।
অপার আনন্দ হইল চৈতন্যের মনে ॥

মহাতীর্থ নর্ম্মদায় সিনান করিয়া।
বরোদা নগরে যায় গোরা বিনোদিয়া ॥
বরোদার পূর্ব্বভাগে ডাঁকোরজী ঠাকুর।
ডাঁকোরজী দেখিতে ইচ্ছা হইল প্রভুর ॥
ডাঁকোরজীর আঙ্গিনায় প্রকাণ্ড নমাল।
তার নিয়ে দাণ্ডাইলা শচীর দুলাল ॥
ডাঁকোরজী দেখিয়া প্রভু নতি স্তুতি করি।
ফিরিয়া আইলা পুনঃ বরোদা নগরী ॥
বরোদার রাজা বড় পুণ্যবান্ হয়।
গোবিন্দ সেবায় রত রাজা মহাশয় ॥
গোবিন্দের মন্দির স্বহস্তে মুক্ত করে।
অম্বরীষ সম রাজা ঘোষে পরস্পরে ॥
সদা ব্যস্ত মহারাজ গোবিন্দের লাগি।
গোবিন্দ সেবায় রাজা সদা অনুরাগী ॥
স্বহস্তে তুলিয়া রাজা তুলসীমঞ্জরী।
গোবিন্দের পাদপদ্মে দেন ভক্তি করি ॥
সন্ধ্যাকালে গোবিন্দের বাড়ী গোরা যায়।
গোবিন্দ দেখিয়া প্রেমে মূর্চ্ছিত ধরায় ॥

ছিন্ন এক বহির্বাস পাগলের বেশ।
সদা উন্মত্ত প্রভু কৃষ্ণেতে আবেশ ॥
সব অঙ্গে ধূলা মাখা মুদ্রিত নয়ন।
গোবিন্দ দেখিয়া অশ্রু করে বরিষণ ॥

তিন দিন পরে এথা বিপদ ঘটিল।
জ্বর রোগে নারোজীর মরণ ঘটিল ॥
মৃত্যু কালে সম্মুখে বসিয়া গোরা রায়।
পদ্ম হস্ত বুলাইলা নারোজীর গায় ॥
যেই কালে নারোজীর নয়ন মুদিল।
আপনি শ্রীমুখে কর্ণে কৃষ্ণনাম দিল ॥
নারোজী ঠাকুর হয় বড় ভাগ্যবান্।
তার কানে কৃষ্ণনাম দিলা ভগবান্ ॥
নারোজী মরণকালে জোড় হাত করি।
তাকায়ে প্রভুর দিকে বলে হরি হরি ॥
নারোজীরে কোলে করি প্রভু বিশ্বম্ভর।
তমালের তল হৈতে করে স্থানান্তর ॥
ভিক্ষা করি নারোজীর সমাধি হইল।
সমাধি বেড়িয়া প্রভু কীর্ত্তন করিল ॥

এই কথা মহারাজ শুনি কাণা কাণি।
সন্ন্যাসীরে ঝাঁকি দিতে * আইলা আপনি ॥
প্রভুরে দেখিয়া রাজা প্রণাম করিল।
ভাল মন্দ কোন কথা প্রভু না কহিল ॥
আদরেতে রাজা বলে ভিক্ষা করিবারে।
প্রভু বলে ভিক্ষা পাই গৃহস্থের দ্বারে ॥
বিলাসের ভিক্ষায় নাহিক প্রয়োজন।
তব দ্বারে ভিক্ষা নাহি চাহি একারণ ॥
হাত জোড়ি রাজা কহে ভিক্ষা লইবারে।
অগত্যা লইতে ভিক্ষা কহিলা আমারে ॥

* ঝাঁকি দিতে—গুণাগুণ বুঝিতে।

প্রভুর ইঙ্গিতে তবে ভূপতির ঠাঁই।
সামান্য লোকের ন্যায় মুষ্টি ভিক্ষা চাই ॥
ভিক্ষা দিয়া মহারাজ করিলা গমন।
নিত্য ক্রিয়া গোরা চাঁদ করে সমাপণ ॥

পশ্চিমেতে প্রভাতে উঠিয়া চলে যাই।
কিছু দূর গিয়া মোরা মহানদী পাই ॥
বড় বেগবতী নদী দেখিতে সুন্দর।
তার মধ্যে বেগে চলে বিস্তর পাথর ॥
নদী পার হয়ে মোর গোরা বিনোদিয়া।
আমেদাবাদের কাছে পৌহুছিলা গিয়া ॥
আশ্চর্য্য আমেদাবাদ জাঁকের সহর।
কতই উদ্যান কত গৃহ মনোহর ॥
বড় বড় অট্টালিকা মধ্যে শোভা পায়।
নিরত দেশের লোক অতিথি সেবায় ॥
গ্রাম্য লোক অতিথিরে দেবতুল্য মানে।
অতিথির সেবা তারা করে প্রাণপণে ॥
প্রভুর রূপেতে লোক মোহিত হইয়া।
ভক্তি ভাবে চারিদিকে দাঁড়ায় আসিয়া ॥
কেহ বলে শুন শুন নবীন সন্ন্যাসী।
ভিক্ষা দেই সেবা কর মোর গৃহে আসি ॥
প্রভু বলে না যাইব গৃহীর আগারে।
আজি রাত্রি কাটাইব নন্দিনীর ধারে ॥

নন্দিনী বাগান এক বাগিচা সুন্দর।
তার ধারে আড্ডা করে প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
ইহা দেখি গ্রাম্য লোক ভিক্ষা আনি দিল।
রজনীতে গোরা চাঁদ ভোগ লাগাইল ॥
বহু লোক জন আসি প্রভুরে বেষ্টিয়া।
ভক্তি ভরে কথা কহে সন্ন্যাসী দেখিয়া ॥
এক জন পণ্ডিত আসিয়া দেখা দিল।
শ্রীভাগবতের শ্লোক পড়িতে লাগিল ॥

প্রভু বলে কৃষ্ণগুণ গাহ ভাল করি।
ইচ্ছা হয় শ্লোক শুনি সমস্ত পাশরি ॥
ভাগবত নিত্য তুমি কর আলোচনা।
তোমারে দেখিলে ঘুচে সংসার যাতনা ॥
প্রতিদিন কর তুমি কৃষ্ণগুণগান।
ধন্য ধন্য বিপ্র তুমি বড় ভাগ্যবান্ ॥
প্রভুর সহিত বিপ্র করি আলাপন।
সমস্ত লোকেরে ডাকি কহিলা তখন ॥
ভাল করি কর সবে সন্ন্যাসীর সেবা।
সন্ন্যাসী সামান্য নহে হবে কোন দেবা ॥
ইহারে দেখিলে হয় বৈরাগ্য উদয়।
সামান্য মানুষ নহে জানিহ নিশ্চয় ॥
না পারি লোকের বুলি সমস্ত বুঝিতে।
যাহা পারি তাহা লিখি আকার ইঙ্গিতে ॥
এই দেশে তীর্থ পর্য্যটিয়া দীর্ঘকাল।
সকলের বুলি বুঝে শচীর দুলাল ॥
দুই চারি বাত কভু প্রভুরে পুছিয়া।
করচা করিয়া রাখি মনে বিচরিয়া ॥
যেই লীলা দেখিলাম আপন নয়নে।
করচা করিয়া রাখি অতি সঙ্গোপনে ॥
সদা উন্মত্ত প্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে।
তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ায় দেশে দেশে ॥

আমেদাবাদের মধ্যে বহু লোক জুটি।
প্রভুরে দেখিতে সব আসে গুটি গুটি ॥
বহু লোক চারি পাশে দেখি গোরা রায়।
আনন্দে মাতিয়া নাম সকলে বিলায় ॥
প্রভু বলে ভক্তি ভরে নাম কর সবে।
সব তাপ দূরে যাবে দুঃখ নাহি রবে ॥
কাহাকেও না করিবে ঘৃণা গর্ব্ব ভরে।
গর্ব্ব শূন্য হয়ে বল হরে কৃষ্ণ হরে ॥
বিদ্যার গৌরবে নহে পণ্ডিত সে জন।
ভক্তি রসে যে জনের শুদ্ধ নাহি মন ॥

কোটি বিঘ্ন যেই জন তৃণ সম গণি।
প্রেমে মত্ত হয় তারে ভক্ত বলি মানি ॥
প্রেম ভক্তি সার তত্ব শ্রুতি ইহা কহে।
প্রেমে মত্ত হরিভক্ত মুক্তি নাহি চাহে ॥
প্রেম ভক্তি হয় যার কণ্ঠের ভূষণ।
নিত্য পরিকর হয় কৃষ্ণের সে জন ॥
কৃষ্ণপ্রেম শিখরিণী * যে করে আস্বাদ।
সেবিতে তাহার পদ না করি বিবাদ ॥
এই দেহে যেই জন কাটিয়া বন্ধন।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয় ঠাকুর সেজন ॥
মহামায়া জ্ঞানচক্ষে ধূলি প্রক্ষেপিয়া।
দিয়াছে চৈতন্যে জড়ে গ্রন্থি লাগাইয়া ॥
সে কারণ মূর্খ লোক এই চরাচরে।
মুগ্ধ হয়ে জড় দেহে আত্মবুদ্ধি করে ॥
জড় দেহে অভিমান ছাড়ে যেই জন।
মাথার ঠাকুর সেই বেদের কথন ॥
কৃষ্ণ প্রেমে নিমগন পরম বৈষ্ণব।
বহু গণ্ডগোল করি না করে কৈতব ॥
বেদান্তের মুখ্য অর্থ যেই নাহি জানে।
সেই জন জীব ব্রহ্মে এক করি মানে ॥
এত বলি পর দিন গোরা বিনোদিয়া।
চলিলা পশ্চিম ভাগে নগর ছাড়িয়া ॥
কিছু দূর গিয়া দেখি নদী শুভ্রামতী।
* * * * * ॥
নদী পারে গিয়া দেখি দুই চারি জন।
দ্বারকায় যাইতেছে তীর্থের কারণ ॥
দেখিলাম তার মধ্যে বাঙ্গালি দুজনে।
মহাভক্ত রামানন্দ গোবিন্দ চরণে ॥

বহু কাল পরে গৌড়বাসীরে দেখিয়া।
আনন্দে মানস যেন উঠিল নাচিয়া ॥

পুছিলাম রামানন্দে কোথা তব ঘর।
রামানন্দ বলে ভাই কুলীন নগর ॥
শুভ্রামতী নদী মধ্যে প্রভু করে স্নান।
হেন কালে রামানন্দ করে আলাপন ॥
রামানন্দ বলে তুমি চলেছ কোথায়।
মুহি বলি প্রভু সঙ্গে যাই দ্বারকায় ॥
চৈতন্য দেবের নাম রামানন্দ শুনি।
প্রফুল্ল বদন যেন হইল অমনি ॥
ধাইয়া গিয়া রামানন্দ প্রণাম করিল।
দুই চারি বাত তারে চৈতন্য পুছিল ॥
পরম বৈষ্ণব হয় রামানন্দ দাস।
রামানন্দ দাসে প্রভু দিলেন আশ্বাস ॥
প্রভু বলে রামানন্দ তোমারে দেখিয়া।
গৌড়ের ভাব মনে উঠিল জাগিয়া ॥
কত দিন গৃহত্যাগ করিয়াছ তুমি।
কত দিন আসিয়াছ এই পুণ্যভূমি ॥
চল তবে এক সঙ্গে দ্বারকা যাইব।
আনন্দে দ্বারকাধীশে সকলে হেরিব ॥

এত শুনি প্রভুমুখে রামানন্দ দাস।
থাকিতে প্রভুর সঙ্গে পাইল উল্লাস ॥
সিনান করিয়া প্রভু ধীরে ধীরে যায়।
ঘোগা নামে গণ্ডগ্রামে আসিয়া পৌছায় ॥

বারমুখী নামে বেশ্যা থাকে এই ঠাঁই। *
তাহার ধনের কথা কহিবার নাই ॥

---

* শিখরিণী—অমৃত, দধি মিশ্রিত একরূপ সুগন্ধ মিষ্ট দ্রব্য।

* ভক্তমালে এই বারমুখীর বিষয় উল্লিখিত আছে। নাভাজি এই গণিকার কথা প্রায় ঠিক রূপই শুনিয়াছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেবের নাম ঘোগা অঞ্চলের লোক জানিত না, কিংবা মনে রাখে নাই, এই জন্য তাঁহাকে ভক্তমাল প্রণেতা নাভাজি শুধু বৈষ্ণব মহান্ত বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। এক দল বৈষ্ণব তাহার বাগিচায় গিয়াছিলেন, এরূপ ভক্তমালে লিখিত আছে।

বেশ্যাবৃত্তি করি সাধিয়াছ বহু ধন।
বহু মুল্য হয় তার বসন ভূষণ ॥
প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে বারমুখী থাকে।
হরিতে ধনীর ধন ফিরে পাকে পাকে ॥
পেশয়াজি পরিধানে ডগমগি চায়।
কত শত কামাচার তার গৃহে যায় ॥
বহু দাস দাসী লয়ে থাকে এই খানে।
জাক পশারের কথা সর্ব্ব লোকে জানে ॥

বাস্তবিক চৈতন্যদেবের সঙ্গে তখন শুধু গোবিন্দ কর্ম্মকার ছিলেন না, কুলীন গ্রামবাসী গোবিন্দচরণ ও রামানন্দ বসুও ছিলেন। ইঁহারা সকলেই বৈষ্ণব ছিলেন, সুতরাং বৈষ্ণব দলের কথা যে তিনি লিখিয়াছিলেন, তাহা ঠিকই লিখিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর নাম গোত্র কেহ জিজ্ঞাসা করে না। এজন্য অজ্ঞাত দেশে চৈতন্যদেবের নাম অবিদিত ছিল, কিংবা জানা থাকিলেও পরবর্ত্তী জন-শ্রুতি তাহা স্মরণ করিয়া রাখে নাই।

করচার প্রতিবাদী দল বলিতেছেন কেহ ভক্তমাল হইতে বিবরণটি লইয়া তাহা করচায় জুড়িয়া দিয়াছে। যদি চরিতামৃত কিংবা অন্য বৈষ্ণব গ্রন্থের সঙ্গে বর্ণনা মিলিয়া যায়, তবে তাঁহারা অনুমান করেন যে, করচা সেই বিবরণগুলি নকল করিয়াছে, যদি গরমিল হয় তবে বলেন, করচা খাটি নহে। তাঁহাদের যুক্তি অনেকটা শার্থের করাতের ন্যায়, যাইতে আসিতে দুই দিকেই কাটে। নকল-বাজ্ কোন প্রাচীন পুস্তক হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু প্রচলিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সঙ্গে বর্ণনা গরমিল করিবার সাহস তাহার থাকা স্বাভাবিক নহে। ভক্তমালের বর্ণনায় চৈতন্যের সহিত বারমুখীর সাক্ষাতের পরের ঘটনাও কিছু আছে। আমরা নাভাজির অনুবাদক কৃষ্ণদাসের বিবরণটির কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"বেশ্যা এক হয় অতি ধনাঢ্য সুন্দরী।
পুষ্করিণী বাগিচা বেড়া ভৃত্য সহচরী ॥
অনেক বৈষ্ণবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
উত্তরিলা একদিন তার বাগিচাতে ॥
জলে স্থলে অতি পরিষ্কার দেখিয়া।
তৃপ্ত হৈল সাধুগণ সুচ্ছায়া পাইয়া ॥
বারমুখী নিজ গৃহ বালাখানা হৈতে।
ঝরকাতে উকি মারি লাগিল দেখিতে ॥

আহা কি আশ্চর্য্য যার নাহিক উপমা।
বৈষ্ণব দরশনে যে কতেক মহিমা ॥

* * * * *

অতএব ছি ছি মুই ত্যজি হেন অর্থ।
দেহ পণ করিব নিতান্ত পরমার্থ ॥
এতেক চিন্তিয়া বেশ্যা অমনি উঠিল।
থলি ভরি এক থাল মোহর লইল ॥
চলিলেন ধীরে ধীরে মহন্তের স্থানে।
গৃহ হইতে নিকশিয়া যথা সাধুগণে ॥
পরম সুন্দরী রত্ন ভূষণে ভূষিতা।
থমকিয়া চলিল কামিনী মনোনীতা ॥

* * * * *

তবে নিজ পরিচয় যথার্থ কহিল।
মহান্ত কহিয়ে তব হউক ভাল ভাল ॥
কৃষ্ণে যদি মতি তব ঐকান্তিক হয়।
তবে তো কৃতার্থ তুমি চিন্তা কি আছয় ॥
এক পরামর্শ আমি কহি যে তোমারে।
তোমার মানস পূর্ণ হইবে অদূরে ॥
মোহরের থলি রঙ্গনাথের চরণে।
রাখিয়া শরণ লও গিয়া কায়মনে ॥
অবশ্য করিবে দয়া ঠাকুর তোমারে।
বারমুখী কহিল উপেক্ষা কেন মোরে ॥
কান্দিতে কান্দিতে মোহরের থলি লৈয়া।
চলিলেন আপনাকে ধিক্কার করিয়া ॥
রঙ্গনাথ ঠাকুর সিন্ধুকে বলি রাখি।
কান্দয়ে বিলাপ করি বদন নিরখি ॥
বেশ্যা বলি পূজারী সে দ্রব্য না লইল।
চুড়া বানাইয়া দেহ পশ্চাৎ কহিল ॥
ঘরেতে যাইয়া বহু অর্থ ব্যয় করি।
নানা রত্ন চুরি আর মণি মুক্তা ঝুরি ॥

প্রকাণ্ড বাগিচা নাম পিয়ার কানন।
কাননের ধারে প্রভু করিলা গমন ॥
অতি বড় নিম্ব বৃক্ষ আছে এই স্থানে।
কি ভাবিয়া প্রভু গিয়া বসিলা সেখানে ॥
আজ্ঞা পেয়ে মুহি যাই গৃহস্থের দ্বারে।
ফল মূল আদি কিছু ভিক্ষা করিবারে ॥

যেখানে যে গহনা সাজয়ে রঙ্গনাথে।
বানাইয়া লৈয়া গেল আপনার সাথে ॥
পূজারি কহেন পুনঃ বেশ্যার সামগ্রী।
কভু নাহি হয় ইহা ঠাকুরের যোগী ॥
ইহা শুনি তার মুখ মলিন হইল।
অশ্রু ধারা দুনয়নে পড়িতে লাগিল ॥
ঘরে গিয়া উপবাসী পড়িয়া রহিল।
পরাণ ছাড়িব বলি প্রতিজ্ঞা করিল ॥
দয়াল হরি না বাছিল উত্তম মধ্যম।
যেই প্রীতি করে সেই হয় প্রিয় মম ॥
পুজারীরে আদেশ করেন ক্রোধে হরি।
শীঘ্র বারমুখীরে আনহ স্তুতি করি ॥
বারমুখী নিজ হস্তে পরাবে গহনা।
তুমি তারে শিষ্য কর না করিহ ঘৃণা ॥
পুজারী কাঁপয়ে ডরে তখনই চলিল।
মিনতি করিয়া গিয়া ডাকিয়া আনিল ॥
তার নিজ হস্তে অলঙ্কার পরাইয়া।
সেবক করিয়া গিয়া মন্ত্র উপদেশ দিয়া ॥
বারমুখী ঠাকুরাণী আনন্দ সাগরে।
প্রেমানন্দে মধুপান করিয়া সাঁতারে ॥
সর্ব্বস্ব লুটায়ে কৈল মহামহোৎসব।
বিষ ত্যজি পান কৈল কমল আসব ॥

এই বিবরণের সঙ্গে করচার প্রদত্ত ঘটনা মিলাইয়া পড়িলে দেখা যাইবে, জন-প্রবাদ ও চাক্ষুষ ঘটনার কি প্রভেদ! করচায় যে সকল খুঁটি নাটি কথা আছে, যথা বালাজি নামক দুষ্ট বিপ্রের কথা—বাগানের নামটি পিয়ারী কানন, বারমুখীর মীরা নামক দাসীর কথা—এ সমস্তই বাস্তব ছবি। ভক্তমালে স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনা আনিয়া বর্ণনাটির জন-প্রবাদ মূলক বাহুল্য প্রতিপন্ন করিতেছে।

ভিক্ষা করি আইলাম দিবা দ্বিপ্রহরে।
ভোগ লাগাইলা প্রভু প্রফুল্ল অন্তরে ॥
প্রসাদ পাইনু তবে মোরা তিন জনে।
মুহি রামানন্দ আর গোবিন্দ চরণে ॥

হাসিয়া গোবিন্দ মুহি মিতে বলি ডাকি।
প্রভু বলে রামানন্দে কেন দেহ ফাকি ॥
গোবিন্দ যদ্যপি মিতে হইল তোমার।
তবে রামানন্দ মিতে হইল আমার ॥
হাসিতে হাসিতে রামানন্দে মিতে বলি।
নাম আরম্ভিলা প্রভু দিয়া করতালি ॥
প্রভু মুখে রামানন্দ একথা শুনিয়া।
এক পার্শ্বে দাণ্ডাইলা হাত কচালিয়া ॥

বহুতর লোক জুটে নাম শুনিবারে।
অশ্রুবহে প্রভুর নয়নে শত ধারে ॥
পিচকিরি সম অশ্রু বহিতে লাগিল।
তাহা দেখি ঘোগাবাসী আশ্চর্য্য হইল ॥
দেখিয়া প্রভুর সেই হরিসঙ্কীর্ত্তন।
মাতিয়া উঠিল প্রেমে দুই চারি জন ॥
গ্রাম্য লোক জনের নয়নে বহে বারি।
বহু লোক আসি দাড়াইলা সারি সারি ॥
কেমন ভক্তির ভাব কহনে না যায়।
অনিমিষে প্রভুর বদন পানে চায় ॥
কখন হাসিছে প্রভু কখন কাঁদিছে।
কখন বা বাহু তুলি নাচিছে গাইছে ॥
থর থর কাঁপে কভু ঘর্ম্ম বারি বহে।
কখন বা প্রেমাবেশে চুপ করি রহে ॥
কখন টলিছে রোমাঞ্চিত কলেবরে।
প্রাণ কৃষ্ণ বলি কভু ডাকে উচ্চস্বরে ॥
ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত নবীন সন্ন্যাসী।
এই কথা কাণা কাণি করে ঘোগাবাসী ॥
হরি হরি বলিতে আনন্দ ধারাবহে।
পুতুলের প্রায় সবে দাণ্ডাইয়া রহে ॥

আধ নিমীলিত চক্ষু জটা এলায়েছে।
ধূলা মাটী মেখে অঙ্গ মলিন হয়েছে ॥
কোথায় প্রাণের কৃষ্ণ এই বলি ডাকে।
কখন বা হাত তুলি উর্দ্ধ মুখে থাকে ॥
গোবিন্দ রে কাঁহা কৃষ্ণ মিলাও আনিয়া।
কোথায় প্রাণের কৃষ্ণ দেহ দেখাইয়া ॥
এক বার ঐ বলি ধাইয়া যাইল।
বাহু পশারিয়া নিম্বে জড়ায়ে ধরিল ॥
ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত হইল নিমাই।
এমন উন্মাদ মুহি কভু দেখি নাই ॥
বহু দিন সঙ্গে থাকি ফিরি নানা দেশ।
দেখি নাই কেনে দিন এমন আবেশ ॥
রামানন্দ গোবিন্দ চরণ দুই ধারে।
তালি দিয়া হরি ধ্বনি করে বারে বারে ॥

প্রকাণ্ড এক গর্ত্ত ছিল সড়কের ধারে।
আবেশে গড়ায়ে পড়ে তাহার ভিতরে ॥
এক জন দুষ্ট আসি করি হানা পানা।
প্রভুরে বলিলা কেন কর প্রবঞ্চনা ॥
গ্রাম্য লোকে ভুলাইয়া অর্থ লবে হরি।
তাই বেড়াইছ তুমি হরিধ্বনি করি ॥
সন্ন্যাসীর পরীক্ষা লইতে আসিয়াছি।
কত শত কপট সন্ন্যাসী দেখিয়াছি ॥
সে পাষণ্ড এই কথা কহিলা যখন।
প্রহার করিতে তাঁরে চাহে গ্রাম্য জন ॥
প্রভু বলে ভাই সব মারিবে কাহারে।
হরিনাম সুধা পান করাও উহারে ॥
পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হয়েছে উহার।
উহার বদনে সুধা দেহ এক ধার ॥
ভক্তি বিনা শুকায়েছে উহার হৃদয়।
নাম দিয়া নাশহ উহার যমভয় ॥
মরুভূমি সম হয় পাষণ্ডের মন।
উৎপাদিকা শক্তি তাহে করহ অর্পণ ॥

এস সাধু মোর কাছে হরিনাম দিব।
তোমার পাপের ভার উতারিয়া নিব ॥
সব তাপ দুর হবে এই মন্ত্র বলে।
হরিনাম মন্ত্র পাঠে সত্ত ফল ফলে ॥
এই মহামন্ত্র পাঠ করে যেই জন।
সে পাপী নরকে কভু না করে গমন ॥
এমন সুলভ মন্ত্র থাকিতে জগতে।
পাপী কেন অনর্থক ফিরে মন্দ পথে ॥

এত বলি মহাপ্রভু তার কাছে গিয়া।
হরিনাম সুধা কর্ণে দিলেন ঢালিয়া ॥
দয়াল চৈতন্য জীবে করিতে নিস্তার।
ভ্রমিছেন ইতি উতি হয়ে নির্ব্বিকার ॥

জানালা হইতে দেখি এসব ব্যাপার
বারমুখী মনে মনে করয়ে বিচার ॥
আশ্চর্য্য প্রভুর দয়া দেখিয়া নয়নে।
আপনারে ধিক দেয় বসিয়া নির্জ্জনে ॥
বারমুখী বলে ছি ছি অর্থের লাগিয়া।
দিনে শত বার দেহ ফেলাই যেচিয়া ॥
পাপমূর্ত্তি পরপুরুষের সঙ্গে মেলি।
ছি ছি নিত্য নিত্য আমি করি কাম-কেলি ॥
এই যে সন্ন্যাসী দেখি ঈশ্বর সমান।
সব ছাড়ি যাই মুহি এর বিগুমান ॥
সন্ন্যাসীর টাকা কড়ি সঙ্গে কিছু নাই।
তবে কেন উহারে দেখিয়া সুখ পাই ॥
কেন বা নরক ভোগ ঘরে বসে করি।
আমার প্রতি কি দয়া না করিবে হরি ॥
বালাজী দুষ্টের কাণে কি মন্ত্র পড়িয়া।
এই ত সন্ন্যাসী দিলা উদ্ধার করিয়া ॥
ইহার নিকটে গিয়া পাপ ক্ষয় করি।
কাছে গিয়া জড়াইয়া পদ চাপি ধরি ॥

জানালা হইতে ইহা বারমুখী বলে।
তার কথা শুনে সুখী হইলা সকলে ॥

লোক জন চারি ধারে একথা তুলিয়া।
মহা কোলাহল করে হাসিয়া হাসিয়া॥
ক্ষণকাল পরে বেশ্যা নামিয়া আসিল।
মিরানামে তার দাসী পেছনে চলিল॥
বারমুখী বলে তবে বিনয়ে মিরারে।
আজি হৈতে সর্ব্ব ধন দিলাম তোমারে॥
বহু অর্থ আছে মোর সব তুচ্ছ করি।
আজি হৈতে হইলাম পথের ভিকারী॥
এলাইয়া দিলা কেশ বারমুখী দাসী।
স্থির বিদ্যুতের পাশে যেন মেঘরাশি॥
নিতম্ব ছাড়িয়া পড়ে দীর্ঘ কেশ জাল।
নয়ন মুদিয়া রহে শচীর দুলাল॥
আশ্চর্য্য রূপের ছটা সকলে দেখিয়া।
তাহার বদন পানে রহে তাকাইয়া॥
বারমুখী হাত জোড়ি কহে বার বার।
বন্ধন কাটিয়া দেহ সন্ন্যাসী আমার॥
বড়ই পাপিষ্ঠ মুহি নরকের কীট।
যদি দয়া নাহি কর যাব পিট পিট॥
দাসীরে বলিয়া দেহ কিসে ত্রাণ পাব।
মরণান্তে যমভয় কিরূপে এড়াব॥

এই পাপ দেহে আর কিবা প্রয়োজন।
এত বলি দীর্ঘ কেশ করিলা ছেদন॥
সামান্য বসন পরি লজ্জা নিবারিল।
জোড় হস্তে প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইল॥
প্রভু বলে বারমুখী দুই চারি কথা।
তোমারে কহিয়া দেই করহ সর্ব্বথা॥
এই স্থানে করি তুমি তুলসী কানন।
তার মাঝে থাকি কর কৃষ্ণের সাধন॥
তুমি কৃষ্ণ তুমি হরি বারমুখী বলে।
এই মাত্র বলি পড়ে প্রভু-পদতলে॥
বারমুখী পদতলে যখন পড়িল।
তিন চারি পদ প্রভু অমনি হটিল॥

আর যত লোক ছিল কাছে দাঁড়াইয়া।
ধন্য ধন্য করে সবে বেশ্যারে দেখিয়া॥

মিরাবাই দাসী বহু কান্দিতে লাগিল।
হাসিমুখে বারমুখী তাহারে কহিল॥
কাণ দিয়া শুন মিরা আমার বচন।
তোমারে দিলাম মোর যত আছে ধন॥
ভাল রূপে সেবা কোরো অতিথি আইলে।
হরিনামে মন দিও বসিয়া বিরলে॥
না করিবে পাপ কর্ম্ম মোর দিব্য লাগে।
ভজিবে শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেম অনুরাগে॥
প্রেম করা ভাল বটে ধূর্ত্ত সহ নয়।
কৃষ্ণের সহিত মিরা করিও প্রণয়॥
দেহ মন প্রাণ সব কৃষ্ণে সমর্পিবে।
তাহা হৈলে নিত্য ধন কৃষ্ণেরে পাইবে॥
শুনহ আমার কথা মিরা মন দিয়া।
কারো সঙ্গ না করিবে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া॥
অবশ্য কৃষ্ণের কৃপা তোমারে হইবে।
প্রাণপণে কৃষ্ণ ধনে কভু না ছাড়িবে॥
প্রভুর কৃপায় মোর কেটেছে বন্ধন।
আজি হৈতে বাসস্থান তুলসী কানন॥
এত বলি বারমুখী লয়ে জপমালা।
তুলসী কানন করে ভুলি সব জ্বালা॥
বারমুখী কুলটারে প্রভু ভক্তি দিয়া।
সোমনাথ দেখিবারে চলিল ধাইয়া॥
জাফেরাবাদের দিকে প্রভু চলি যায়।
বহু কষ্টে তিন দিনে পৌছায় তথায়॥

জাফরাবাদ লোক বড় দুঃখী হয়।
কিন্তু অতিথির বহু সম্মান করয়॥
গ্রামবাসী বহু লোক ভিক্ষা আনি দিল।
রুটি করি প্রভু মোর ভোগ লাগাইল॥
প্রবেশিয়া একজন মালীর বাগানে।
যাপিলাম রাত্রি মোরা আনন্দিত মনে॥

প্রভাতে উঠিয়া মোরা সোমনাথে যাই।
ছয় দিন পরে গিয়া সেখানে পৌঁছাই॥

নাহিক পূর্ব্বের শোভা নাহি সে মন্দির।
দুঃখের অবস্থা দেখি চক্ষে বহে নীর॥
ঢিবি ঢাবা ভাঙ্গা চিহ্ন আছে সেই খানে।
দেখিয়া আঘাত বড় লাগিল পরাণে॥
মন্দির বাড়ীর শোভা গিয়াছে চলিয়া।
ইহা দেখি প্রভু মোর আকুল কাঁদিয়া॥
কান্দিয়া আমার প্রভু বলিতে লাগিল।
দুরাত্মা যবন আসি কি দশা করিল॥
কোথা লুকাইলে প্রভু যবনের ভয়ে।
একবার দেখাদিয়া জুড়াও হৃদয়ে॥
হায় হায় ইহ দুঃখ কহনে না যায়
সোমনাথে উদ্দেশিয়া কান্দে গোরা রায়॥

প্রভু বলে এত শোভা কেবা হরে নিল।
অর্থের লাগিয়া দুষ্ট এদশা করিল॥
অহে প্রভু সোমনাথ তোমারে দেখিতে।
আকু বাকু করে প্রাণ না পারি সহিতে॥
তোমার বিরহ আর সহ্য নাহি হয়।
তোমারে উদ্দেশ করি ফাটিছে হৃদয়॥
হায় হায় ভক্তগণ কি পাপ করিল।
কি পাপে তোমারে দেব আর না হেরিল॥
তোমার বিরহে শত শত পাণ্ডাগণ।
দুঃখের সাগরে আছে হয়ে নিমগন॥
তুমি কি যবন ভয়ে কৈলাসে যাইয়া।
প্রিয় ভক্তগণে এবে রহিলে ভুলিয়া॥
এ সকল দেখি মোর হৃদয় ফাটিছে।
বুকের মাঝারে অশ্রু বাহিয়া পড়িছে॥
আহা মরি ভগ্নশেষ রয়েছে পড়িয়া।
পাপ চক্ষুঃ সহ্য করে কেমন করিয়া॥
এস প্রভু সোমনাথ অন্তরে আমার।
হৃদয়ের মধ্যে হেরি মুরতি তোমার॥
কোথায় লুকালে প্রভু না দেখি তোমারে।
কেমন করিছে প্রাণ কহিব কাহারে॥
হায় হায় গঙ্গাধর তোমারে দেখিতে।
আর না আসিবে লোক বিদেশ হইতে॥
দেখিতে আসিত যাত্রী গৌরব করিয়া।
এবে কিন্তু সে গৌরব গিয়াছে মুছিয়া॥
দ্বেষ ভরে যবনেরা অত্যাচার করি।
মণি মুক্তা আদি আদি ধন লইয়াছে হরি॥
হায় প্রভু স্মরহর কোথায় রহিলে।
কৃপা করি ভক্ত জনে দেখা নাহি দিলে॥

এই রূপে প্রভু মোর পরিতাপ করে।
হেন কালে ঝড় উঠে আকাশ উপরে॥
ধূলা উড়ে চারিদিক কৈলা অন্ধকার।
পাণ্ডাগণ বন্ধ করে কুটীরের দ্বার॥
বাহিরের দ্বারে বসি আমরা সকলে।
হরিবোলা প্রভু আসি বসে মধ্যস্থলে॥

হেনকালে অবধৌত সন্ন্যাসী আসিয়া।
বার বার গোরা চাঁদে দেখে তাকাইয়া॥
সব গায় ভস্ম মাখা নাহিক বসন।
উভ করি জটা বাঁধা আশ্চর্য্য গঠন॥
লোহিত বরণ তাঁর হয় চক্ষুর্দ্বয়।
মুখে হর হর শব্দ পবিত্র হৃদয়॥
ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি দেখিতে সুন্দর।
আশীর্ব্বাদ করে আসি ঊর্দ্ধ করি কর॥
উঠিলা আমার প্রভু তাঁহারে দেখিয়া।
অন্তর্হিত হৈলা তবে কি যেন বলিয়া॥
ধূলা উড়ে চারিদিক্ করেছে আঁধার।
অবধৌত কোথা গেল নাহি দেখি আর॥ *

* লেখার ভাবে মনে হয়, যেন গোবিন্দ দাস এই সন্ন্যাসীকে শিব (সোমনাথ) বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন, যদিও তিনি একথা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই।

ঈষৎ হাসিয়া তবে চৈতন্য আমার।
সোমনাথ পরিক্রম করে তিন বার॥
মুহি রামানন্দ আর গোবিন্দ চরণ।
প্রভুর সহিত করি হরি সংকীর্ত্তন॥
সোমনাথ ঠাকুরের প্রীতির লাগিয়া।
কীর্ত্তন করেন প্রভু প্রেমেতে গলিয়া॥
দুই চারি জন পাণ্ডা আসিয়া মিলিল।
আমাদের কাছে কিছু মাগিতে লাগিল॥
হাসিয়া বলিয়া প্রভু সন্ন্যাসীর ঠাঁই।
টাকা কড়ি অন্নবস্ত্র কিছু দিতে নাই॥
এই বাত শুনি কাণে গোবিন্দ চরণ।
দুই মুদ্রা পাণ্ডা হস্তে করিলা অর্পণ॥
পবিত্র কুণ্ডের ধারে পাণ্ডা লয়ে যায়।
জল লয়ে প্রভু মোর দিলেন মাথায়॥

সোমনাথ ছাড়ি মোরা জুনাগড়ে যাই।
বড় গ্রাম বটে কিন্তু কোন তীর্থ নাই॥
চারি দিকে বহু অট্টালিকা শোভা পায়।
জুনাগড়ে দুদিন কাটে গোরা রায়॥
রণছোড় জীর সেবা আছে এক ঠাঁই।
সন্ধ্যাকালে দর্শন করিতে তথা যাই॥
মিরাজী নামেতে বিপ্রবর সেবা করে।
মোর গিয়া উপস্থিত হই তার ঘরে॥
ভক্তি সহ মিরাজিউ আদর করিল।
তাহার বাড়িতে প্রভু রজনী যাপিল॥
দুগ্ধ চিনি আটা আনি ব্রাহ্মণ যোগায়।
আনন্দ করিয়া প্রভু রজনী কাটায়॥

নিকটে গৃণার গিরি অতি মনোহর।
তাহার নিকটে যায় প্রভু বিশ্বম্ভর॥
মিরাজী নিকটে আসি ভক্তিসহকারে।
প্রভুরে থাকিতে বিপ্র কহে বারে বারে॥
বিনয় করিয়া প্রভু ব্রাহ্মণেরে বলে।
গৃণার পাহাড়ে মোরা যাইব সকলে॥
গুরুদত্ত চরণ দেখিব সেই খানে।
ছেড়ে দেহ এই ভিক্ষা চাহি তব স্থানে॥
শুনিয়া প্রভুর কথা বিপ্র মহাশয়।
ভাল মন্দ আর কোন কথা নাহি কয়॥

যাত্রা করি বাহিরায় চৈতন্য গোঁসাই।
ছায়ার মতন মোরা পিছে পিছে যাই॥
একদল সন্ন্যাসী আসিয়া এইখানে।
বসিয়া আছেন সবে বিরস বয়ানে॥
ভর্গদেব নামে তাঁহাদের দলপতি।
পীড়িত হইয়া তথা করেন বসতি॥
বৃক্ষতলে ভর্গদেব ছটফট করে।
উপনীত হৈলা প্রভু সেখানে সত্বরে॥
ভর্গদেবে পীড়িত দেখিয়া গোরা রায়।
আমারে আদেশ করে তাহার সেবায়॥
মুহি রামানন্দ আর গোবিন্দ চরণ।
রোগীর সেবায় লেগে যাই তিন জন॥
প্রভু কহে নিম্বরস পিয়াইতে তারে।
নিম্বরস করি মোরা পিয়াই তাহারে॥

রোগ হৈতে ভর্গদেব পেয়ে অব্যাহতি।
প্রভুর চরণে করে অসংখ্য প্রণতি॥
ভর্গদেব উঠিয়া প্রভুর স্তব করে।
হাত কচালিয়া ভর্গ বলে ভক্তিভরে॥
মোরে কৃপা কর প্রভু তুমি দয়াময়।
তোমার লাগিয়া ব্যগ্র হতেছে হৃদয়॥
অধমেরে রোগ হৈতে করিলে নিস্তার।
কৃপা করি মায়া-পাশ কাটহ আমার॥
কার কাছে ফাকি দেহ নবীন সন্ন্যাসী।
তোমার চরণ পেতে মুহি অভিলাষী॥
ক্ষুদ্র জনে দয়া যদি নাহি করা হয়।
তবে কেন তোমারে কহিব দয়াময়॥
বৃদ্ধ হইয়াছি মুহি নয়নের ভুল।
তোমার হৃদয়ে দেখি সোণার পুতুল॥

সকলে তোমারে কহে সোণার বরণ।
কৃষ্ণবর্ণ দেখে কিন্তু আমার নয়ন ॥
তাই বলি চক্ষু দোষ ঘটেছে আমার।
দয়া করি এ পাপীরে করহ উদ্ধার ॥

কৃপা করি ভর্গদেবে শক্তি সঞ্চারিল।
অমনি তাহার চিত্তে ভক্তি উথলিল ॥
কি কহিল ভর্গদেবে প্রভু আঁখি ঠারি।
অমনি তাহার চক্ষে বহে অশ্রু বারি ॥
সন্ন্যাসীর চেলা সূক্ষ্ম তত্ত্ব না বুঝিল।
প্রভুর সহিত ভর্গ গৃণারে চলিল ॥
গৃণার পাহাড় বড় উচ্চতর হয়।
গুরুদত্ত চরণযুগল সেথা রয় ॥
গৃণারের উচ্চশিরে চরণ যুগল।
চরণ দেখিতে চলে সন্ন্যাসীর দল ॥
প্রভাতে চরণযুগ দেখিবারে যাই।
অপরাহ্নে চরণের নিকটে পৌঁছাই ॥
প্রস্তর উপরি শোভে দুখানি চরণ।
চরণ দেখিয়া প্রভু করিলা বন্দন ॥
ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ শোভয়ে পদতলে।
পাদপদ্ম দেখি প্রভু হরি হরি বলে ॥
একজন পাণ্ডা ইহ * থাকে নিরন্তর।
চরণের কথা তারে পুছে বিশ্বম্ভর ॥
পাণ্ডা বলে যদুগণ যখন মরিল।
তখন শ্রীবলদেব এখানে আইল ॥
বলদেব আসি এথা তপের কারণ।
তপ আরম্ভিলা প্রভু করি যোগাসন ॥
যোগাসনে বলদেব তপেতে বসিল।
প্রভাসে যাদবগণ যুদ্ধ আরম্ভিল ॥
মধু পানে মত্ত হয়ে যত যদু বীর।
পরস্পরে যুদ্ধ করে ছুটিল রুধির ॥

সাত্যকি প্রভৃতি ছিল যত বীরগণ
একে একে যমালয়ে করিল গমন ॥
কৃষ্ণের ইচ্ছায় সব যদুগণ মরে।
শেষে দেখা দিলা কৃষ্ণ পর্ব্বত উপরে ॥

এই খানে বলদেবে দেখি যদুপতি।
কহিতে লাগিলা প্রভু আপনার গতি ॥
বলদেবে কহে কৃষ্ণ গোলোকে যাইব।
সিদ্ধ হৈল নিজ কার্য্য আর না রহিব ॥
যাদবগণের পাপে পৃথিবী পূরিল।
এই জন্য যদুগণ উচ্ছন্ন হইল ॥
মোর লাগি কান্দে যদি পাণ্ডুপুত্রগণ।
তাহাদের শোক তুমি করিবে মোচন ॥
প্রাণ হৈতে প্রিয় বস্তু দ্রুপদকুমারী।
তারে আগে শান্ত কৈর এই ভিক্ষা করি ॥

এত শুনি বলদেব উঠিল কান্দিয়া।
এই বাক্য বলে তবে বিনয় করিয়া ॥
বিদুর উদ্ধব আদি যত ভক্ত আছে।
তুমি গেলে কি বলিব তাহাদের কাছে ॥
কোন চিহ্ন রেখে যাহ তাহাদের লাগি।
যে চিহ্ন দেখিবে তারা হয়ে অনুরাগী ॥
তুমিত তাদের প্রাণ জানিয়া শুনিয়া।
গোলোকে যাইবে তুমি কেমন করিয়া ॥
কৃষ্ণবই তাহারা ত কিছু নাহি জানে।
কিরূপে তাদের ফেলি যাবে নিজ স্থানে ॥
পাঞ্চালী করিবে যবে হাহাকার ধ্বনি।
কি বলে বুঝাব তারে বুঝহ আপনি ॥
এত শুনি কৃষ্ণ এথা পদভর দিলা।
অমনি চরণচিহ্ন এখানে রহিলা ॥

এই কথা বলি পাণ্ডা বুঝাইয়া দিল।
অমনি প্রভুর হৃদে প্রেম উপজিল ॥
আনন্দের ধাম গোরা প্রেম নিকেতন।
স্থির দৃষ্টে পদচিহ্ন করে দরশন ॥

* ইহ=এস্থানে।

দেখিতে দেখিতে চিহ্ন প্রেমের নিঝর।
সহসা উথলি তাঁর উঠিল অন্তর॥
ভাবে গদ গদ প্রভু ধীরে ধীরে বলে।
পাণ্ডা ভাই তুমি সাধু কি রত্ন দেখালে॥
নিত্য তুমি সুখলাভ কর দরশনে।
তব সম পুণ্যবান্ দেখি না নয়নে॥
পাষাণ হৃদয়ে যদি এ চিহ্ন পড়িত।
ব্রহ্মানন্দ সুখ তবে নিত্য উপজিত॥
পদচিহ্নে রাখি শির গোরা বিনোদিয়া।
তদুপরি বার বার পড়ে লোটাইয়া॥
বেত্রযষ্টি সম সেই ক্ষীণ কলেবর।
ফুলিয়া উঠিল প্রেমে পেয়ে অবসর॥
চরণ পরশি প্রভু নয়ন মুদিল।
হৃদয় বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল॥
পদ প্রদক্ষিণ করে করতালি দিয়া।
কটিবন্ধ জটাবন্ধ পড়িল খসিয়া॥

ভাব দেখি রামানন্দ অজ্ঞান হইল।
গোবিন্দ চরণ ভূমে লোটায়ে পড়িল॥
পর্ব্বত হইতে নামি মোর গোরা রায়।
ভদ্র নামে নদীতীরে রজনী কাটায়॥
প্রভাতে উঠিয়া সবে নদী পারে যাই।
ধন্বিধর ঝারি ক্রমে দেখিবারে পাই॥
অত্যন্ত বিস্তৃত হয় ধন্বিধর ঝারি।
ঝারি খণ্ড দেখে ত্রাস হইল আমারি॥
সিংহ ব্যাঘ্র নানা জন্তু থাকে এই স্থানে।
ইহা ভাবি ভয় বড় হইল পরাণে॥
ইঙ্গিতে বুঝিয়া প্রভু মোর অভিলাষ।
হাসিয়া বলিলা কেন বৃথা কর ত্রাস॥
হরিনামে যমভয় যদি দূর হয়।
তবে কেন ঝারি খণ্ড দেখে পাও ভয়॥

দলশুদ্ধ লয়ে মোরা হই ষোল জন।
ঝারি মধ্যে প্রবেশিলা শচীর নন্দন॥

জঙ্গলের শোভা হয় অতি মনোহর।
কি কব শোভার কথা কহিতে বিস্তর॥
কত বন্য পুষ্প ফুটি গন্ধ যোগাইছে।
কত শত বৃক্ষ লতা বাতাসে দুলিছে॥
ডালে বসি নানা পক্ষী করিতেছে গান।
সে গান শুনিলে হয় আকুল পরাণ॥
মধ্যে এক পথ মাত্র দুধারে জঙ্গল।
মাঝে মাঝে দেখা যায় সন্ন্যাসীর দল॥
মাথার উপর সূর্য্য দেখিবারে পাই।
অমনি ক্ষুধার তরে ইতি উতি চাই॥
ভিক্ষার লাগিয়া এবে কার দ্বারে যাব।
গ্রাম্য লোক নাহি এথা ভিক্ষা কোথা পাব॥
দুই ধারে নানা বৃক্ষে ধরিয়াছে ফল।
ফল দেখে আমার বাড়িল কুতূহল॥
আশ্চর্য্য ফলের কথা কহিতে না পারি।
কত ফল পাকিয়া শোভিছে সারি সারি॥
কামরাঙ্গা সম হয় ফলের গঠন।
হেন ফল কভু করি নাই আস্বাদন॥
আশে পাশে পড়িয়াছে ফল রাশি রাশি।
দুই হাতে ফল খায় যতেক সন্ন্যাসী॥
আজ্ঞা বিনা ফল নাহি খাইবারে পারি।
কিন্তু ফল দেখে লোভ হইল আমারি॥
গুটিকত ফল লই প্রভুর কারণ।
অপরাহ্নে প্রভু ফল করে নিবেদন॥
দুই চারি ফল তবে আস্বাদ করিয়া।
মোদের খাইতে বলে গোরা নিবেদিয়া॥
উদর পুরিয়া ফল যত পারি খাই।
খড়িয়ার মধ্যে লই আর যত পাই॥
টুপ টাপ খায় ফল গোবিন্দ চরণ।
রামানন্দ ধীরে ধীরে করে আস্বাদন॥
আশ্চর্য্য ফলের গুণ দেখিল সকলে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দুই হরে সেই বন্য ফলে॥
চৌশিরা সিজ সম যেই গাছ শোভে।
আশ্চর্য্য তাহার ফল খাই অতি লোভে॥

যত খাই নানা ফল দেখিবারে পাই।
খড়িয়াতে লই আর পেট ভোরে খাই॥
মানুষের গন্ধ নাই নিবিড় জঙ্গলে।
মাঝে মাঝে হরিধ্বনি করিছে সকলে॥

না হইতে সন্ধ্যা পথে হইল আঁধার।
এক বৃক্ষতলে বৈসে শচীর কুমার॥
মাঝে মাঝে রাজা স্থান দিয়াছে করিয়া।
সেই স্থানে প্রভু সঙ্গে উতরাই গিয়া॥
বন্য কার্চ্চে ঘেরা স্থান ঘর দ্বার নাই।
সন্ন্যাসীরা এই খানে বসিলা সবাই॥
করতালি দিয়া প্রভু নাম আরম্ভিল।
নাম শুনি সন্ন্যাসীরা মাতিয়া উঠিল॥
কাষ্ঠ আহরিয়া দিলা অগ্নিকুণ্ড জ্বালি
ভর্গদেব নাম করে দিয়া করতালি॥
সেই জঙ্গলের মাঝে ভয় নাহি পাই।
হরিনাম করি সবে রজনী পোহাই॥
পরদিন প্রাতঃকালে হরিধ্বনি করি।
বাহির হইলা গোরা স্মরিয়া শ্রীহরি॥
যত পথ যাই তত জঙ্গল গভীর।
দেখিলে সে ঝারি খণ্ড কাঁপয়ে শরীর॥
বহুদূর গিয়া পাই ক্ষুদ্র এক খাল।
সেই খানে স্নান করে শচীর দুলাল॥
স্নান করি দ্রুতগতি অগ্রে চলে যাই।
কতদূর অগ্রে গিয়া বসিলা সবাই॥
ফল আনিবারে প্রভু রামানন্দে বলে।
রামানন্দ ফল আনি রাখে সেই স্থলে॥
নানাবিধ ফল আনে সংগ্রহ করিয়া।
পূজা করি ভোগ দেয় গোরা বিনোদিয়া॥
এমন মধুর ফল কভু দেখি নাই।
সবে মিলি উদর পূরিয়া ফল খাই॥
সহস্র লোকের খাদ্য পথে পড়ে থাকে।
ঈশ্বরের কত দয়া কহিব কাহাকে॥

মধ্যাহ্নে সারিয়া কাজ মোরা চলে যাই।
অপরাহ্নে গিয়া সবে আর আড্ডা পাই॥
জঙ্গলের পাশে স্থান ঘেরা খুঁটি দিয়া।
সেই স্থানে প্রবেশিলা গোরা বিনোদিয়া॥

কাষ্ঠ আনি সন্ন্যাসীরা আগুণ জ্বালিল।
করতালি দিয়া প্রভু গান আরম্ভিল॥
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হরে।
যখন তখন প্রভু এই গান করে॥
গাইতে গাইতে দেখি হইল অস্থির
পুলকে পূরিল প্রভু কাঁপিল শরীর॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিল গোরা রায়।
দেখিয়া তাঁহার ভাব ভর্গ ফুকারায়॥ *

পরদিন যাই চলে প্রভাতে উঠিয়া।
এক দল যাত্রী পথে আসিছে ফিরিয়া॥
পথমধ্যে দেখা যবে হৈল দুই দলে।
আনন্দেতে হরিধ্বনি করিল সকলে॥
এইরূপে সাত দিনে ধন্বিধর ঝারি।
পার হয়ে যাই সবে আনন্দ বিথারি॥

নিকটে অমরাপুরী গোপীতলা নাম।
সেই খানে যাই সবে আনন্দের ধাম॥
ইহাকে প্রভাস তীর্থ বলে সর্ব্বজনে।
প্রভাস দেখিয়া বড় প্রীতি পাই মনে॥
যদুগণ যেখানে ত্যজিল কলেবর।
সেই খানে প্রভু গিয়া কান্দিলা বিস্তর॥
মধু পানে মত্ত হয়ে যত যদুবীর।
পরস্পর যুদ্ধ করি ত্যজিল শরীর॥

---

* ফুকরায়—মাঝে মাঝে কাঁদিয়া ওঠাকে "ফুকরায়" বলে।

কেবা নিজ কেবা পর না করি গণন।
কৃষ্ণের ইচ্ছায় মরে যদুবীর গণ ॥
চারুদেষ্ণ স্বরত্নি সাত্যকি যুযুধান।
শাম্ব গদ প্রভৃতি যতেক মতিমান ॥
পরস্পর যুদ্ধ করি মরে সেই খানে।
বিরস বদনে প্রভু কান্দে সেই স্থানে ॥
কান্দিয়া এতেক হর্ষ কেহ নাহি পায়।
কান্দিয়া আনন্দ প্রভু ধরায় ছড়ায় ॥
জগতের শোক দুঃখ করিতে হরণ।
প্রচারে হরির নাম যখন তখন ॥
হরিনাম প্রেম ভক্তি হরির ভজন।
শিক্ষা দেয় জগজনে প্রভু সর্ব্বক্ষণ ॥
দিন নাই রাত্রি নাই ফিরি দ্বারে দ্বারে।
বিতরে হরির নাম জগৎ মাঝারে ॥
কে লবে রে হরিনাম হও আগুয়ান।
বিনা মূল্যে এই রত্ন করি সবে দান ॥
অমূল্য রতন সবে লহ যত্ন করি।
অনায়াসে সংসার-সাগর যাবে তরি ॥
একবার মুখে উচ্চারিলে হরিনাম।
বন্ধন কাটিবে যাবে সবে নিত্যধাম ॥
বড়ই কঠিন গ্রন্থি মায়ার দড়িতে।
হরিনাম অস্ত্র ভিন্ন কে পারে কাটিতে ॥

এই কথা বলি প্রভু ফিরে দ্বারে দ্বারে।
প্রেমরস ছড়াইলা জগৎ সংসারে ॥
অমরাপুরীর লোক একত্র জুটিয়া।
আনন্দ পাইল সবে প্রভুরে দেখিয়া ॥
পাগলের ন্যায় যেন ইতি উতি ধায়।
আবেশে উন্মত্ত হয়ে ঘুরিয়া বেড়ায় ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে কভু যেন জ্ঞান হারা।
মিশিয়া গিয়াছে ঊর্দ্ধে নয়নের তারা ॥
পৃষ্ঠদেশে এলায়ে পড়েছে জটাভার।
হৃদয় মাঝারে অশ্রু পড়ে অনিবার ॥

পাগলের মত বেশ শিথিল অম্বর।
সর্ব্বাঙ্গে উড়িছে খড়ি ধূলায় ধূসর ॥
কোথায় যজ্ঞের কুণ্ড বলে গোরা রায়।
পাণ্ডাগণ সঙ্গে থাকি প্রভাস দেখায় ॥

প্রভাসের দক্ষিণ ভাগেতে মোরা যাই।
সেই খানে গিয়া কুণ্ড দেখিবারে পাই ॥
এই কুণ্ড কাটি যদুপতি যজ্ঞ করে।
সেই যজ্ঞে যদুগণ যুদ্ধ করি মরে ॥
সেই খানে সত্যভামা করি কাম্য বন।
মাঝে মাঝে কৃষ্ণসহ করি আগমন ॥
পরম আনন্দে বাস করিতেন সতী।
সেই স্থান দেখিয়া গৌরাঙ্গ মহামতি ॥
কান্দিয়া উঠিলা প্রভু করিয়া চীৎকার।
ফুকারি ফুকারি প্রভু কান্দে অনিবার ॥
ক্রমে দশজন পাণ্ডা আসিয়া জুটিল।
একে একে সব স্থান দেখাতে লাগিল ॥

এই খানে ইষ্ট গোষ্ঠী তিন দিন করি।
যাইতে কহিলা পরে দ্বারকা নগরী ॥
প্রভাসেতে আর তীর্থ দেখিবার নাই।
পহিলা আশ্বিনে মোরা দ্বারকায় যাই ॥
কৃষ্ণনাম করিতে করিতে প্রভু যায়।
সমুদ্রের ধারে ধারে যাই দ্বারকায় ॥
সাগরের খাড়ি পাই চারি দিন পরে।
পার হৈতে হইবেক দড়ার উপরে ॥
দড়ার উপর দিয়া দ্বারকায় যাই।
রৈবতক নামে গিরি দেখিবারে পাই ॥

ভাবে ঢুলু ঢুলু গোরা পর্ব্বত দেখিয়া।
মুচকি মুচকি প্রভু উঠিল হাসিয়া ॥
কি যেন করিয়া মনে প্রফুল্ল বয়ানে।
মহাপ্রভু হাসিয়া চাহিলা মোর পানে ॥

মোর পানে চেয়ে বলে দ্বারকায় গিয়া।
চরিতার্থ হও সবে প্রণাম করিয়া॥
সব অঙ্গে মাখ রজঃ অতি ভক্তি করি।
দেখিলে পুণ্যের ফলে দ্বারকা নগরী॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব জনমের সুকৃতের বলে।
দ্বারকা নগরী আজি দেখিলা সকলে॥
এত শুনি সবে মিলি প্রণাম করিল।
গোরার আনন্দ কূপ উথলি উঠিল॥
হরিবোল হরিবোল বলিতে বলিতে।
ক্রমে উতরিয়া প্রভু হেলিতে দুলিতে॥
ভাবসিন্ধু উথলিল মর্য্যাদা * লঙ্ঘিয়া।
কার সাধ্য রাখে আর প্রভুরে ধরিয়া॥
উলটি পালটি পড়ে পৃথিবী উপরে।
ক্রমে ক্রমে প্রবেশিল পুরীর ভিতরে॥
লোমাঞ্চিত কলেবর কাঁপিতে লাগিল।
নয়ন ফাটিয়া যেন অশ্রু বাহিরিল॥
কোথা হে দ্বারকাধীশ এই কথা বলি।
অশ্রুজলে ভাসাইলা দ্বারবতী স্থলী॥
সব এলোথেলো জটা খসিয়া পড়িল।
অতি উচ্চরবে গোরা কাঁদিয়া উঠিল॥
কি কব ভাবের কথা কহনে না যায়।
বার বার কৃষ্ণ বলি প্রভু ফুকরায়।
দ্বারকাধীশের বাড়ী যবে প্রবেশিলা।
অমনি দ্বিগুণ ভাবে আনন্দে মাতিলা॥
কদম্বের ন্যায় শিহরিল কলেবর।
উলটি পালটি পড়ি ধূলায় ধূসর॥
ভাবে মাতোয়ারা প্রভু ঢুলু ঢুলু চায়।
দ্বারকাধীশের আগে ধরণি লোটায়॥
চারিদিকে পড়ে যেন ভক্তি উছলিয়া।
ফুলে ফুলে কান্দে মোর গোরা বিনোদিয়া॥

নয়ন মুদিয়া কভু অন্তরেতে চায়।
অন্তরের মধ্যে যেন কি দেখিতে পায়॥
কখন বা উর্দ্ধমুখে তাকাইয়া রহে।
নয়ন হইতে অশ্রু দর দর বহে॥
কৃষ্ণেরে দেখিয়া তনু পুলকে পূরিল।
এক দৃষ্টে তাঁর প্রতি চাহিয়া রহিল॥
শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করে তিন বার।
নম্র হয়ে প্রতিবার করে নমস্কার॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গোরা বিনোদিয়া।
তাহা দেখি ভর্গদেব পড়ে লোটাইয়া॥
দ্বারকার মধ্যে ক্রমে হৈল জানা জানি।
সকলে প্রভুর কথা করে কাণা কাণি॥
কেহ বলে সন্ন্যাসী দেখিতে চল ভাই।
এমন সন্ন্যাসী কেহ কভু দেখে নাই॥
কি কব ইহার কথা কহনে না যায়।
এমন সন্ন্যাসী বুঝি না আছে ধরায়।
এমন আশ্চর্য্য ভাব কভু দেখি নাই।
সন্ন্যাসীর রূপে গুণে বলিহারি যাই॥
দেখিলে তাহারে ভক্তি উপজয়ে মনে।
অশ্রু আসি দেখা দেয় আপনি নয়নে॥
ইচ্ছা হয় সন্ন্যাসীর সঙ্গে চলে যাই।
বন্ধন কাটয়ে তারে দেখ যদি ভাই॥
দেখিলে সংসারে আর নাহি থাকে রুচি।
সেরূপ দেখিলে পাপী হয় সদ্য শুচি॥
এমন দয়াল আর নাহি দেখা যায়।
দয়া করে হরিনাম সকলে বিলায়॥
মাথা ভরা জটা পরিধানে বহির্বাস।
দেখিলে তাহার রূপ পূরে অভিলাষ॥
ঈশ্বরের অবতার দেখে বোধ হয়।
ভক্তিরসে পূর্ণ সদা তাহার হৃদয়॥
ভাবাবেশে সদা মত্ত নবীন সন্ন্যাসী।
মাতাইয়া তুলিয়াছে দ্বারকা নিবাসী॥
কাম নাই ক্রোধ নাই নাহি অভিলাষ।
দ্বারকাধীশের প্রতি অটুট বিশ্বাস॥

---

* মর্য্যাদা—সীমা।

হরিনাম দান করে পাপীরে ডাকিয়া।
তাহাকে দেখিলে চিত্ত উঠে তপাসিয়া ॥
এক পক্ষ দ্বারকায় থাকি গোরা রায়।
দ্বারকাপতির কাছে নিত্য আসে যায় ॥
নিত্য গিয়া দরশন করে প্রাণ ভরি।
ভক্তি রসে মাতাইলা দ্বারকানগরী ॥

দ্বারকানিবাসী যত ভক্তিপরায়ণ।
প্রভুরে দেখিতে সবে করে আগমন ॥
সকলের সঙ্গে প্রভু ইষ্টগোষ্ঠী করে।
কীর্ত্তন করিয়া সবে নাচে প্রেমভরে ॥
ধর্ম্মের ভাবেতে পুরী করে টল মল।
সকলের চিত্ত যেন হইল নির্ম্মল ॥
মন্দমন্দ বায়ু সদা বহিতে লাগিল।
পুষ্পগন্ধে চারি দিক্ যেন আমোদিল ॥
সব লোক আনন্দিত প্রভুসঙ্গ পাইয়া।
কিবা নারী কিবা নর সবে আসে ধাইয়া ॥
চারিদিকে মঙ্গলের চিহ্ন দেখা দিল।
হরিনামে দিক সব প্রসন্ন হইল ॥
কিবা পাণ্ডা কিবা গৃহী সকলে মিলিয়া।
ধর্ম্ম উপদেশ শুনে শ্রবণ পাতিয়া ॥
যেই জন নাহি বুঝে তাহারে বুঝায়।
নানা বুলি বলি প্রভু তাহারে মাতায় ॥
কখন বা মোর প্রভু কাঁই মাই বলে।
কাঁই মাই বাত বলি বুঝায় সকলে ॥
কেমন বুঝায় লোকে সর্ব্ব শক্তিমান্। *
উপদেশ শুনি সবে হইল অজ্ঞান ॥

কিবা জ্ঞানী কিবা মূর্খ সকলে আসিয়া।
পুলকিত হৈল সবে প্রভুরে দেখিয়া ॥

এক দিন সন্ধ্যাকালে প্রভু ধীরে ধীরে।
উপনীত হৈলা গিয়া কৃষ্ণের মন্দিরে ॥
বহুতর লোক যায় প্রভুর পেছনে।
ভালমন্দ নাহি বলে শচীর নন্দনে ॥
মন্দিরের দ্বারে গিয়া অষ্টাঙ্গ করিল।
তাহা দেখি লোক সব গড়াগড়ি দিল ॥
জোড় হস্ত করি প্রভু বহু স্তব করে।
অমনি নয়ন হৈতে অশ্রুজল ঝরে ॥
প্রেমরসে ডগমগ প্রভুর হৃদয়।
যে দিকে তাকায় দেখে সব কৃষ্ণময় ॥
চক্ষু মুদি কৃষ্ণ বলি ডাকিতে লাগিল।
প্রেমভরে কলেবর শিহরি উঠিল ॥
সেইভাব যে জন না দেখেছে নয়নে।
মুহি অতি মূর্খ তারে বুঝাব কেমনে ॥
যেই খানে মরুক্ষেত্র কিছু মাত্র নাই।
সেখানে বহাল নদী চৈতন্য গোঁসাই ॥
সমস্ত দেশের মধ্যে পাপী না রহিল।
ভক্তি দিয়া পাপিগণে প্রভু উদ্ধারিল ॥
একদিন পাণ্ডাগণ আনন্দ করিয়া।
মহামহোৎসব করে ভোগ লাগাইয়া ॥
অতিথি বৈষ্ণবগণে করি নিমন্ত্রণ।
ক্ষীর দধি পুরী আদি করয়ে বণ্টন ॥
পঙ্গুদের মধ্যে গিয়া গোরা গুণমণি।
প্রসাদ বণ্টনপ্রভু করেন আপনি ॥
রজনীতে সবে মেলি কুটীরেতে যাই।
পরম আনন্দে মোরা রজনী কাটাই ॥
এইরূপে পক্ষকাল ইষ্টগোষ্ঠী করি।
পরদিন ছাড়ে প্রভু দ্বারকা নগরী ॥

প্রভু বলে এইবার নীলাচলে যাব।
নীলাচলে সবে মেলি আনন্দে কাটাব ॥
চল বিদ্যানগরে যাইব সবে মেলি।
একা না যাইব পুরী রামরায়ে ফেলি ॥

---

* যে দেশের লোকদের কথা বোঝা যায় না, তাঁহাদেরে যে তিনি কি ভাবে প্রাণের কথা বুঝাইয়া দেন, তাহা আশ্চর্য্য।

বড়ই ভজনানন্দী রামানন্দ হয়।
তার কথা মনে হৈলে জুড়ায় হৃদয় ॥
সাধকের শিরোমণি রামানন্দ রায়।
নির্জনে বসিয়া রায় কৃষ্ণগুণ গায় ॥
হরেকৃষ্ণ বলিতে যাহার অশ্রু বহে।
বিরক্ত বৈষ্ণব তারে ভাগবতে কহে ॥
মুচি যদি ভক্তি সহ ডাকে কৃষ্ণ ধনে।
কোটি নমস্কার করি তাহার চরণে ॥
কৃষ্ণভক্ত রামানন্দ হয় পূজনীয়।
রামানন্দরায় মোর প্রাণ হৈতে প্রিয় ॥
প্রাণের সমান রামানন্দে ভালবাসি।
পরম বৈষ্ণব রায় বিরক্ত সন্ন্যাসী ॥
বিষয়েতে অনাসক্ত হয় রাম রায়।
নিত্য রাধাকৃষ্ণে রায় দেখিবারে পায় ॥
বহু অর্থ রামানন্দ তৃণ সম গণি।
প্রেম সহ কৃষ্ণে ডাকে দিবস রজনী ॥
দেখিয়াছি কৃষ্ণ বলি ডাকিতে ডাকিতে।
প্রেমে মত্ত হয়ে রায় থাকয়ে কাঁপিতে ॥
কৃষ্ণ নামে প্রেম অশ্রু বিসর্জ্জন করে।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে পৃথিবী উপরে ॥
রায়ের বিরহ আর নাহি সহে প্রাণে।
চল শীঘ্র যাই সবে রায় সন্নিধানে ॥

এই কথা বলি প্রভু বাহির হইল।
শত শত লোক তাঁর পেছনে চলিল ॥
মিষ্টবাক্যে গ্রাম্য লোকে করিয়া বিদায়।
খাড়ীর নিকটে চলে মোর গোরা রায় ॥
ভর্গদেব দল বল লয়ে আপনার।
খাড়ীর ধারেতে আসে হইবারে পার ॥

একে একে সকলেতে পার হয়ে আসি।
গুজরাটে আসে মোর নদের সন্ন্যাসী ॥
আশ্বিনের শেষ দিনে বরদা নগরে।
ফিরে আসি প্রভু মোর হরিনাম করে ॥
গোবিন্দ চরণ মুহি ভিক্ষা করিবারে।
উপস্থিত হইলাম গৃহস্থের দ্বারে ॥
ফল মূল আটা চুণা যাহা ভিক্ষা পাই।
শুদ্ধভাবে সেই গুলি আনিয়া যোগাই ॥
বৃক্ষতলে আড্ডা করি প্রভু ভোগ দিল।
প্রসাদ পাইয়া সবে কৃতার্থ হইল ॥
পরদিন যাত্রা করি বরদা হইতে।
দক্ষিণ ভাগেতে প্রভু লাগিল চলিতে ॥

ষোল দিন পরে আসি নর্ম্মদার তীরে।
স্নান করি সবে মোরা নর্ম্মদার নীরে ॥
প্রভু বলে ভর্গদেব যাবে কোন স্থলে।
যাইবে কি মোর সঙ্গে তুমি নীলাচলে ॥
প্রভুর সম্মুখে ভর্গ হাত কচালিয়া।
বলে মুহি দক্ষিণেতে যাইব চলিয়া ॥
মোহন্ত আদিত্য রাজ বোম্ বোম্ নগরে
ভক্তি সহ রণছোড় জীর সেবা করে ॥
মোর পরণাম প্রভু করহ গ্রহণ।
কৃপা করি দেহ মোর মস্তকে চরণ ॥
এত বলি ভর্গদেব লুটায়ে পড়িল।
দুই হস্তে পদযুগ চাপিয়া ধরিল ॥
ভর্গ বলে তুমি কৃষ্ণ তুমি মোর হরি।
ভিক্ষা দেহ চরণ স্মরিয়া যেন মরি ॥
আপনার লীলা খেলা আপনি দেখিতে।
দ্বারকায় গেলে তুমি লোকেরে ছলিতে ॥
যাহোক মাথায় মোর দেহ পদ তুলি।
ভুলাইতে না পারিবে আর নাহি ভুলি ॥
প্রভু বলে ভর্গ তুমি কেন হেন কহ।
কেমনে এমন কথা আমারে বলহ ॥
পথে পথে ভ্রমি মুহি হয়ে উদাসীন।
অন্ন নাই বস্ত্র নাই অতি দীন হীন ॥

এই ছত্রের অর্থ ভাল বোঝা গেল না।

ভিক্ষার লাগিয়া মুহি ফিরি দ্বারে দ্বারে।
হেন বাক্য আর কভু না কহ আমারে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল সদা বিশ্বাস করিয়া।
কৃষ্ণেতে বিশ্বাস কৃষ্ণ দিবে মিলাইয়া॥
চিদানন্দ ঘন সেই পরাৎপর হরি।
ভাব তাঁর পাদপদ্ম ভবার্ণবে তরি॥
প্রেমভক্তি সহ ভাব হরির চরণ।
অবশ্য তোমারে তিনি দিবেন দর্শন॥
বড়ই দয়াল হরি ভক্ত জন প্রতি।
চিন্তা কর তাঁরে তিনি অগতির গতি॥

এত বলি ভর্গদেবে প্রভু পরশিল।
অমনি ভর্গের দেহ পবিত্র হইল॥
জোড়হাতে দাঁড়াইয়া ভর্গদেব চায়।
চরিতার্থ হয়ে শেষে লইল বিদায়॥
ভর্গসহ ছিল আর যতেক সন্ন্যাসী।
প্রভুর সম্মুখে সবে দাঁড়াইলা আসি॥
একে একে প্রভুর চরণে প্রণমিল।
মিষ্ট বাক্যে প্রভু সবে বিদায় করিল॥

ভর্গদেব চলি গেলা দক্ষিণ বিভাগে।
প্রভু নীলাচলে যাত্রা করে অনুরাগে॥
মুহি রামানন্দ আর গোবিন্দ চরণ।
নর্ম্মদার ধারে করি সেদিন যাপন॥
পরদিন নর্ম্মদার ধারে ধারে যাই।
দোহদ নগরে গিয়া সকলে পৌঁছাই॥
কিছু আটা আনিলাম মুহি ভিক্ষা করি।
রুটি করি ভোগ দেয় প্রভু গৌর হরি॥
রজনী কাটাই মোরা দোহদ নগরে।
বৃক্ষতলে গোরাচাঁদ হরি ধ্বনি করে॥

প্রভাতে উঠিয়া কুক্ষী নগরেতে যাই।
অনেক বৈষ্ণব এথা দেখিবারে পাই॥
যথা যাই তথা দেখি তুলসী কানন।
গ্রাম্য লোক মাত্রে দেখি কৃষ্ণপরায়ণ॥

সন্ধ্যাকালে সব লোক হরিধ্বনি করে।
ইহা দেখি প্রভু মোর আনন্দে শিহরে॥
এই স্থানে থাকে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
তার ঘরে আছে এক লক্ষ্মীজনার্দ্দন॥
ভক্তি সহ পূজে বিপ্র লক্ষ্মীজনার্দ্দনে।
ইহা শুনি প্রভু যায় তাঁহার ভবনে॥
আতিবিথি * করে বিপ্র প্রভুরে দেখিয়া।
বহু অভ্যর্থনা করে অতিথি ভাবিয়া॥
বিপ্রবলে আমি হই দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
আমার ভবনে কেন কৈলা পদার্পণ॥
সন্ন্যাসীর সেবা মুই করিব কেমনে।
ধর্ম্ম নষ্ট হৈল বুঝি আমার ভবনে॥
প্রভু বলে কোন চিন্তা না কর ঠাকুর।
যার সৃষ্টি তিনি খাদ্য দিবেন প্রচুর॥
কার জন্য কেবা ভাবে সকলি ত ভুল।
সর্ব্বদা ভাবেন কৃষ্ণ শুন এই স্থূল॥
কর্ত্তা বলে খেতে দেই আমিহ সকলে।
তবে কেন বন্ধুহীন খায় বৃক্ষ তলে॥

বন মধ্যে ক্ষুদ্র কীটে কে দেয় আহার।
তবে কেন বিপ্র তুমি ভাব মিছে আর॥
হেনকালে এক বৈশ্য ব্রাহ্মণের ঘরে।
দুগ্ধ চিনি আটা আনি যোগায় তাহারে॥
বৈশ্য বলে শুন শুন ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
তোমার উপরে কৃপা হয়েছে প্রভুর॥
স্বপ্নে দেখিয়াছি তব লক্ষ্মীজনার্দ্দন।
পায়স খাইতে চাহে আমার সদন॥
নররূপে নারায়ণ তব গৃহে থাকে।
স্বপ্নে নারায়ণ ইহা দেখালে আমাকে॥
গত রাত্রি যোগে ইহা দেখেছি স্বপনে।
দুগ্ধ চিনি আনিয়াছি তাহার কারণে॥
নারায়ণে দেহ বিপ্র পায়স রান্ধিয়া।
এই কাণ্ড শুনি বিপ্র আকুল কান্দিয়া॥

---

* আতিবিথি—ব্যস্ততা প্রদর্শন।

বিপ্র বলে কোথা হৈতে আইল দুগ্ধ চিনি।
প্রভু বলে নারায়ণ যোগায় আপনি॥
বিপ্র বলে দুঃখী মুহি এ যে চমৎকার।
প্রভু বলে নারায়ণ * * *॥
বিপ্র বলে ভেবেছিনু তোমার লাগিয়া।
প্রভু বলে নারায়ণ দিলা যোগাইলা॥
প্রভুর বদনপানে বৈশ্য তাকাইয়া।
কি দেখিছে বার বার অজ্ঞান হইয়া॥

বিপ্র বলে বৈশ্য তুমি কি দেখিছ ভাই।
বৈশ্য বলে ধন্ধ লাগিয়াছে তাই চাই॥
শুন অহে বিপ্রবর কি কব তোমারে।
স্বপ্নে নররূপে মুহি দেখেছি ইহারে॥
এই কথা শুনি প্রভু বৈশ্যে কহে আর।
মিছে কেন গণ্ডগোল কর বার বার॥
কারে দেখিয়াছ তুমি অলীক স্বপনে।
তবে কেন গণ্ডগোল কর অকারণে॥
বৈশ্য ভাই তুমি সাধু বড় ভাগ্যবান্।
তাই স্বপ্নে দেখা দিলা প্রভু ভগবান্॥
সামান্য সন্ন্যাসী মুহি ভোজনের তরে।
উপস্থিত হইয়াছি ব্রাহ্মণের ঘরে॥

বিপ্র বলে ওকথায় কিবা প্রয়োজন।
অতিথির সেবা লাগি ভাবে নারায়ণ॥
প্রভুরে ব্রাহ্মণ তবে বলিলা কান্দিয়া।
আপনি লাগান ভোগ পায়স রান্ধিয়া॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু পায়স রান্ধিল।
নিকটে থাকিয়া বিপ্র টহল করিল॥
প্রসাদ পাইল সবে আনন্দ করিয়া।
নিজ হস্তে প্রভু দেন প্রসাদ বাটিয়া॥
মহা মহোৎসব হৈল ব্রাহ্মণের ঘরে।
পরদিন প্রাতে উঠি প্রভু যাত্রা করে॥
যাত্রাকালে নিকটে আসিয়া বিপ্রবর।
কাকুতি করিল কত জুড়ি দুটী কর॥

বিপ্রের নিকটে তবে লইয়া বিদায়।
বাহির হইল প্রাতে মোর গোরা রায়॥
ঘাঁতি দিয়াছিল * সেই বৈশ্য লুকাইয়া।
ধরিল প্রভুরে পথে পাছু পাছু গিয়া॥
চরণ ধরিয়া বৈশ্য কান্দিতে লাগিল।
দয়াল চৈতন্য তারে ধরিয়া তুলিল॥
প্রভু বলে সাধু তুমি কি করহ ভাই।
বৈশ্য বলে দয়া কর আমারে গোঁসাই॥
ছাড়িবার নহি চিনিয়াছি আপনারে।
পদধূলি দিয়া কৃপা করহ আমারে॥
হাসিয়া চৈতন্য প্রভু শ্রবণে তাহার।
সুমধুর হরিনাম দিলা একবার॥
তার পাপ ক্ষয় হৈল প্রভুর কৃপায়।
সর্ব্বত্যাগী হয়ে তবে বৈশ্য চলি যায়॥
প্রভুর কৃপায় বৈশ্য বিষয় ছাড়িয়া।
তুলসী কানন করি রহে দূরে গিয়া॥
লোকের সহিত নাহি করে আলাপন।
সদা ধ্যান করে কৃষ্ণ মুরলীবদন॥
মুখে বলে ওহে হরি মোরে দয়া কর।
কৃপা এপাপীর সব তাপ হর॥
কুটীরে বসিয়া থাকে গৃহে নাহি যায়।
হরি বলি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগে খায়॥

বৈশ্যরে করিয়া কৃপা প্রভু বিশ্বম্ভর।
চলিলা জঙ্গল দিয়া ছাড়িয়া নগর॥
গভীর জঙ্গল ভাঙ্গি মোরা সবে যাই।
দুদিন নগর গ্রাম দেখিতে না পাই॥
দুই দিন পরে যাই জঙ্গল ছাড়িয়া।
আমঝোরা নগরেতে পৌঁছাই গিয়া॥
ক্ষুধার জ্বালায় মোরা ছট ফট করি।
নির্ব্বিকার প্রভু মোর বলে হরি হরি॥

---

* ঘাঁতি দিয়াছিল — গুপ্ত হইয়াছিল

প্রভু বলে হরি যবে খাদ্য মিলাইবে।
সেইদিন ভক্ষ্য পেয়ে আসিয়া জুটিবে॥
দুই সের আটা মুহি ভিক্ষা করে আনি।
ষোল খানা রুটি প্রভু করিলা আপনি॥
হেনকালে এক নারী বালক লইয়া।
বলে কিছু দেহ মরি ক্ষুধায় জ্বলিয়া॥
অন্ন নাই বস্ত্র নাই খেতে নাহি পাই।
পথে পথে শিশু সঙ্গে ভিক্ষা মেগে খাই॥
শুনিয়া তাহার বাণী প্রভু দয়াময়।
আপনার ভাগ তুলে দিলেন তাহায়॥
দুঃখিনী চলিয়া গেল সন্তুষ্ট হইয়া।
অনাহারে দিলা প্রভু দিন কাটাইয়া॥
রজনীতে কিছু ফল ভিক্ষা মেগে আনি।
ফল সেবা করি প্রভু কাটায় রজনী॥
লক্ষ্মণের কুণ্ড এক আছে এইখানে।
প্রভাতে শুনিয়া মোরা যাই তথা স্নানে॥
নগরের প্রান্তে কুণ্ড অতি মনোহর।
পর্ব্বতে বেষ্টিত কুণ্ড অল্প পরিসর॥
পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ জানকী হইলা।
বাণ মারি এই কুণ্ড লক্ষ্মণ কাটিলা॥
লক্ষ্মণ-কুণ্ড বলি প্রসিদ্ধ হইল।
এই কুণ্ড মহাতীর্থ জানকী বলিল॥
অতি রমণীয় কুণ্ড অত্যন্ত গভীর।
স্নান করি সুশীতল হইল শরীর॥
এই তীর্থে স্নান করি গোরা দয়াময়।
হরিধ্বনি করে শুনি চিত্ত দ্রব হয়॥

পরদিন যাই বিন্ধ্যাগিরির উপর।
যেইখানে শোভা পায় মন্দুরা নগর॥
পর্ব্বতের মাঝে এক গুহার ভিতরে।
একজন তপস্বী থাকিয়া তপ করে॥
তপস্বীর কথা শুনি মোর গোরা রায়।
সেইখানে তপস্বীরে দেখিবারে যায়॥

ধ্যানেতে আছেন বসি সন্ন্যাসী ঠাকুর।
তপস্বীর মূর্ত্তি হয় অতি সুমধুর॥
গলিত কাঞ্চন সম অঙ্গের বরণ।
চারিদিকে বাহিরিছে তেজের কিরণ॥
দীর্ঘ দীর্ঘ নখ পড়িয়াছে পালটিয়া।
শ্বেত শ্মশ্রু পড়িয়াছে হৃদয় ঢাকিয়া॥
অস্থি চর্ম্ম অবশিষ্ট ক্ষীণ কলেবর।
দেখা যাইতেছে তাঁর শরীরে পঞ্জর॥
নিশ্চল ভাবেতে আছে উলঙ্গ হইয়া।
ভক্তির উদয় হৈল সে মূর্ত্তি দেখিয়া॥
কাঠের মূরতি সম দেখিবারে পাই।
চক্ষু মেলি বার বার মুখ পানে চাই॥
মহাপ্রভু সম্মুখে গিয়া দাণ্ডাইলা।
তপস্বী ভাঙ্গিয়া ধ্যান চাহিতে লাগিলা॥
যেই ক্ষণে চারি চক্ষে হইল মিলন।
অমনি তপস্বিবর হাসিলা তখন॥
তপস্বীর সঙ্গে প্রভু ইষ্টগোষ্ঠী করি।
পর্ব্বতের নিম্নে আসে মণ্ডুল নগরী॥

বামে শোভে বিন্ধ্যাগিরি নর্ম্মদা ডাহিনে।
তথা হৈতে দেবঘর যাই তিন দিনে॥
একজন কুষ্ঠরোগী ছিল দেবঘরে।
এই রোগী আদি নারায়ণ নাম ধরে॥
বণিকের শ্রেষ্ঠ হয় আদি নারায়ণ।
বহু ধন আছে কিন্তু সদা ক্ষুণ্ণ মন॥
গ্রামের বাহিরে এক বট বৃক্ষ আছে।
দয়াময় প্রভু গিয়া বৈসে তার কাছে॥
প্রভুর শোভায় চারি দিক আলো করে।
লোক জানাজানি ক্রমে হইল নগরে॥
সন্ন্যাসী দেখিতে আসে দুই চারি জন।
নগরেতে যাই মুহি ভিক্ষার কারণ॥
রামানন্দ যায় তবে পুষ্প আনিবারে।
গোবিন্দ চরণ গেলা নদীর কিনারে॥

সেদিন ভিক্ষায় পাই আতপ তণ্ডুল।
রামানন্দ লয়ে আসে নানাবিধ ফুল॥
স্নান করি প্রভু মোর পূজা আরম্ভিল।
গোবিন্দ চরণ শুষ্ক কাষ্ঠ আনি দিল॥
ভোগ দিয়া নাম আরম্ভিলা গোরা রায়।
করিতে করিতে নাম পুলক বাঢ়য়॥
প্রেমে গদ গদ তনু নাচিতে লাগিল।
অজ্ঞান হইয়া শেষে ধরায় পড়িল॥
এই কথা শুনি তথা বহু লোক আছে।
সেই কুষ্ঠ রোগী আসি দাঁড়াইলা পাশে॥

নারায়ণ আসি কাঁদে জুড়ি দুটী কর।
নিস্তার করহ বলি কাঁদিলা বিস্তর॥
পরম বৈষ্ণব হয় আদি নারায়ণ।
তাহারে করিতে দিলা প্রসাদ ভক্ষণ
ভক্তিসহ প্রসাদ করিয়া উপযোগ।
তখনি তাহার দূর হৈল কুষ্ঠ রোগ॥
কুষ্ঠ রোগ দূর হৈল প্রসাদ পাইয়া।
বহু রোগী আসে এই সংবাদ শুনিয়া॥
সঙ্কট দেখিয়া প্রভু চাহিতে লাগিল।
মোর পানে চেয়ে তবে ইঙ্গিত করিল॥
যাত্রা করিলাম মুহি খড়ুম লইয়া।
সেই ছলে প্রভু চলে নগর ছাড়িয়া॥
আদি নারায়ণ তবে সঙ্গে সঙ্গে যায়।
প্রভু বলে মুক্ত হৈলে কৃষ্ণের কৃপায়॥
তবে কেন মোর সঙ্গে কর আগমন।
ঘরে গিয়া ভাব সদা কৃষ্ণের চরণ॥
আদি নারায়ণ বলে ঘরে নাহি যাব।
দেশে দেশে আপনার সঙ্গেতে ফিরিব॥
প্রভু বলে ঘরে গিয়া ভোগ কর ধন। *
নারায়ণ বলে ধনে কিবা প্রয়োজন॥
যদি মোরে সঙ্গে নাহি লহ দয়াময়।
কুটীর বান্ধিয়া মুহি যাপিব সময়॥
প্রভু বলে কর গিয়া তুলসী কানন।
সেই খানে বসি কর সময় যাপন॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সব ত্যাগ করি।
আদি নারায়ণ মুখে বলে হরি হরি॥
সাধু শ্রেষ্ঠ হৈল সেই আদি নারায়ণ।
কৃষ্ণ নাম করি করে সময় যাপন॥
চরণে প্রণাম করি আদি নারায়ণ।
করিলা প্রভুর কাছে বিদায় গ্রহণ॥

ত্রিশ ক্রোশ দূরে হয় **শিবানী** নগর।
দুই দিনে সেই খানে যায় বিশ্বম্ভর॥
মলয় পর্ব্বত শিবানীর পূর্ব্ব ভাগে
সেইখানে যায় প্রভু কৃষ্ণ অনুরাগে॥
মলয় পর্ব্বত প্রভু করি দরশন।
চণ্ডীপুর নগরেতে করে আগমন॥
চণ্ডীপুরে চণ্ডী দেবী দরশন করি।
রায়পুর যায় গোরা স্মরিয়া শ্রীহরি॥
বহুলোক রায়পুরে দরশন আশে।
উপস্থিত হৈলা আসি চৈতন্যের পাশে॥
জীবের দুর্দ্দশা দেখি মোর গোরা রায়।
ঘরে ঘরে হরিনাম আনন্দে বিলায়॥

প্রভু **বিদ্যানগর** আইলা অতঃপর।
রামানন্দ দেখা করে যোড় করি কর॥
রামানন্দ রায় আসি প্রণাম করিলা।
হাত ধরি তুলি প্রভু তারে কোল দিলা
পরম বৈষ্ণব রায় দূরে পিছাইয়া।
কান্দিতে লাগিল বহু বিনয় করিয়া॥
প্রভু বলে রায় তুহু চল মোর সাথে।
এক সঙ্গে গিয়া হেরি প্রভু জগন্নাথে॥

* এই ব্যক্তি সঙ্গে থাকিলে চৈতন্যদেবের অলৌকিক শক্তির কথা প্রচার হইবে এবং বহু রোগী তাঁহার পাছে পাছে ছুটিবে, এই আশঙ্কায় সম্ভবতঃ তিনি তাহাকে সঙ্গে নিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন।

তুমি আমি আর ভট্ট নীলাচলে গিয়া।
করিব হরির নাম সাধ মিটাইয়া ॥
তব সঙ্গে তত্ত্ব কথায় বড় সুখ পাব।
এস তুমি মোর সঙ্গে নীলাচলে যাব ॥
আপনি চলুন অগ্রে রায় ইহা বলে।
কিছু দিন পরে মুহি যাব নীলাচলে ॥ *

এত শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
চলিলা উত্তর ভাগে প্রভাতে উঠিয়া ॥
সেই দিন অতিক্রম করি বহু দূর।
ছয় দিনে চারি জনে যাই রত্নপুর ॥
রত্নপুর ছাড়ি মোরা মহানদী পাই।
তার ধারে ধারে সবে পূর্ব্বভাগে যাই ॥
কিছু দূরে মহাপ্রভু স্বর্ণগড়ে গিয়া।
নগরের শোভা প্রভু দেখে নিরখিয়া ॥
আশ্চর্য্য গড়ের শোভা কি কহিব আর।
চারি দিক দেখিয়া লাগিল চমৎকার ॥

শান্তীশ্বর নামে রাজা এই গড়ে থাকে।
এই কথা দূত গিয়া বলিলা রাজাকে ॥
মোদের সংবাদ শুনি রাজা মহাশয়।
প্রভুরে দেখিতে আসে করিয়া বিনয় ॥
পরম ধার্ম্মিক রাজা প্রভুরে দেখিয়া।
জোড় হস্তে ভূমিতলে পড়ে লোটাইয়া ॥
রাজা বলে শুনহ সন্ন্যাসী মহাশয়।
পবিত্র করহ আজি আমার আলয় ॥
আজি কৃপা করি ভিক্ষা লহ মোর ঘরে
এই বলি রাজা বহু স্তব স্তুতি করে ॥
ইহা শুনি প্রভু তাকাইয়া মোর পানে।
ভিক্ষা চাহিলাম মুহি ভূপতির স্থানে ॥
প্রচুর আনিয়া ভিক্ষা মহারাজ দিলা।
ভিক্ষা দিয়া জোড় হস্তে দাঁড়ায়ে রহিলা ॥
অপরাহ্নে মহারাজ বিদায় হইল।
বৃক্ষতলে মহাপ্রভু রজনী যাপিল ॥

প্রভাতে সম্বলপুর সবে মোরা যাই।
সন্ধ্যার সময়ে গিয়া সেখানে পৌছাই ॥
পর্ব্বতে বেষ্টিত পুরী বড় শোভা পায়।
আনন্দে সম্বলপুরে রজনী কাটায় ॥
দশ ক্রোশ দূরে হয় ভ্রমরা নগরী।
সেই খানে মহাপ্রভু হৈলা আগুসারী ॥
বহু বৈষ্ণবের বাস ভ্রমরা নগরে।
এই খানে চারি দিন প্রভু বাস করে ॥
বিষ্ণু রুদ্র নামে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণ।
এই খানে থাকি করে কৃষ্ণের সেবন ॥
বিষ্ণু রুদ্র বিপ্র হয় বড় ভক্তিমান্।
তারে দেখিবারে প্রভু হৈলা আগুয়ান্ ॥
বিষ্ণু রুদ্র সহ প্রভু ইষ্টগোষ্ঠী করি।
আনন্দে চলিয়া যায় প্রতাপনগরী ॥
এই নগরীর লোকে হরিনাম দিয়া।
দাসপাল নগরেতে গেলেন চলিয়া ॥

---

* এখানে চৈতন্য চরিতামৃতের সঙ্গে করচার বর্ণনার বেশ ঐক্য আছে।

"প্রভু কহে এথা মোর এ নিমিত্ত আগমন।
তোমা লয়ে নীলাচলে করিব গমন ॥
রায় কহে প্রভু আগে চল নীলাচল।
মোর সঙ্গে হাতী ঘোড়া সৈন্য কোলাহল ॥
দিন দশে ইহা সব করি সমাধান।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ ॥
চৈ, চ মধ্য ৯। ১৬৬

এখানে আমাদের এই বক্তব্য যে যে স্থানে মহাপ্রভুর প্রসিদ্ধ পরিকরেরা উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহাদের মুখে শুনিয়া চরিতকারেরা বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই সেই স্থানের বর্ণনার সঙ্গে করচার বিশেষ ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু যেখানে গ্রন্থকারেরা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহাদের পুস্তকের তত্তৎ স্থলের সঙ্গে করচার বিবরণের প্রায়ই অনৈক্য দৃষ্ট হয়।

পাষণ্ড মায়াবী দুঃখী যে যেখানে ছিল।
হরিনাম দিয়া প্রভু সবে মাতাইল॥
সর্ব্বদা থাকয়ে গোরা আনন্দে মাতিয়া।
কত পাপী উদ্ধারিলা হরি নাম দিয়া॥
পর দিন রসালকুণ্ডেতে মোরা যাই
সেই স্থানে কূর্ম্ম দেবে দেখিবারে পাই॥
কূর্ম্মদেবে দেখি প্রভু প্রেমে মাতয়ারা।
ঝর ঝর দুনয়নে বহে অশ্রুধারা॥
জোড় হস্তে বহু স্তব কূর্ম্মদেবে করে।
আছাড়িয়া পড়ে প্রভু ভূমির উপরে॥
রসালকুণ্ডের লোক বড় ভক্তিহীন।
ইহা দেখি প্রভু তথা রহে তিন দিন॥
কিবা নর কিবা নারী সকলে ডাকিয়া।
উদ্ধার করেন প্রভু হরিনাম দিয়া॥
প্রভুর কৃপায় সবে মাতিয়া উঠিল।
ভক্তিসহ হরিনাম করিতে লাগিল॥
এইস্থানে ছিল এক মাড়ুয়া ব্রাহ্মণ।
তার পুত্র প্রভুসঙ্গে করিল মিলন॥
ব্রাহ্মণের পুত্র বলে মোরে দয়া কর।
পদধূলি দিয়া প্রভু মোর দুঃখ হর॥
অত্যন্ত পাষণ্ড মুহি কিছু নাহি জানি।
ভক্তি দিয়া মোরে ত্রাণ করহ আপনি॥
মোর পিতা কৃষ্ণনাম সহ্য নাহি করে।
কৃপা করি ভক্তি দেহ তাঁহার অন্তরে॥
এই দুঃখ বড় পিতা কৃষ্ণদ্বেষী হয়।
তাঁর মনে ভক্তি দেহ প্রভু দয়াময়॥
বৈষ্ণব দেখিলে পিতা করে তিরস্কার।
দয়া করি ঘুচাও সমস্ত পাপ তাঁর॥
শুনিয়াছি তুমি নাকি কৃপার আলয়।
এই ভিক্ষা দেহ মোরে অহে দয়াময়॥

শুনিয়া শিশুর পৃষ্ঠে প্রভু হাত দিলা।
অমনি তাহার চিত্তে ভক্তি উপজিলা॥

এই কথা শুনি বিপ্র ক্রোধে অন্ধ হৈয়া।
যষ্টি হাতে প্রভুর নিকটে এলো ধাইয়া॥
বিপ্র বলে শুন অরে ভণ্ড দুরাচার।
এক মাত্র পুত্র নষ্ট করিলি আমার॥
এই যষ্টি দিয়া তোরে আঘাত করিব।
কে তোরে করিবে রক্ষা এখনি দেখিব॥
জোড় হস্তে কান্দি বলে ব্রাহ্মণ কুমার।
দয়াময় অপরাধ ক্ষমহ পিতার॥
নিতান্ত অজ্ঞান পিতা না চিনে তোমায়ে।
চরণের দাস বলি ক্ষমহ আমারে॥
এই শুনি মাড়ুয়ারে তাড়না করিয়া।
দুই চারি জন লোক উঠিল ঝাঁকিয়া॥
মাড়ুয়া ব্রাহ্মণ কারু বাক্য না শুনিল।
যষ্টিহাতে চৈতন্যেরে মারিতে উঠিল॥ *
বিপ্র বলে মোর পুত্রে বৈষ্ণব করিয়া।
সঙ্গে করে লয়ে যাবি তুই ভুলাইয়া॥
ছেলে ভুলাইয়া তুমি যাইবে কোথায়।
এইবার দণ্ড করি বুঝিব তোমায়॥
বহুত সন্ন্যাসী মুহি দেখেছি নয়নে।
এইবার শিক্ষা তুহি পাবি মোর স্থানে॥

* গোবিন্দের করচা ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে সমস্ত সরল সত্য কথা লিখিবার এরূপ সাহস দৃষ্ট হয় না। মেদিনীপুরে ধনী কেশব সামন্ত তাঁহার উপদেশ গ্রাহ্য করে নাই, (১৬ পৃঃ), অপরাপর স্থলেও এইরূপ বর্ণনা আছে, "কোথাকার পাগল এসেছে কেহ বলে" ৩৯ পৃঃ। "কেহ বলে ওরে ভাই সেই ক্ষেপা যায়। হরি হরি বলি সবে ক্ষেপাও ইহায়॥" (৩৯ পৃঃ) এইরূপ উল্লেখ অনেক স্থলে আছে। পরবর্ত্তী সাহিত্যে চৈতন্যদেব একেবারে বিগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে এতটুকু অসম্মানকর কথা কাহারও সহ্য হয় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই স্পষ্টবাদী লেখকের চৈতন্যভক্তি অতুলনীয়। পাপী তাপীরা প্রভুকে সর্ব্বদাই চিনিতে পারে নাই, তাহাতে কি তাঁহার গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে? না সত্য কথার আলোকে তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়াছে?

হাসিয়া চৈতন্য বলে শুন মোর ভাই।
আমারে মারিতে হৈলে হরিনাম চাই ॥
যত বার হরিনাম মুখে উচ্চারিবে।
ততবার যষ্ট্যাঘাত করিতে পাইবে ॥
ক্রোধ করি যদি মোরে মারিবারে চাহ।
তবে হরে কৃষ্ণ নাম বদনে বলহ ॥
এই দেখ পৃষ্ঠ পাতি দিলাম তোমারে।
একবার হরি বলি মারহ আমারে ॥
পুনঃ এই কথা শুনি বিপ্রের তনয়।
হাত জোড়ি প্রভুর সম্মুখে পুনঃ কয় ॥

শিশু বলে প্রভু ক্ষমা করহ পিতারে।
নরক হইতে ত্রাণ করহ উহাঁরে ॥
আপনার পাদপদ্মে এই ভিক্ষা চাই।
লোকে যেন নাহি বলে নিঠুর নিমাই ॥
তবে তারে বলে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
জনম লইলে তুমি যে বংশে আসিয়া ॥
সেই বংশে কাহারো নরক ভয় নাই।
কোটি পুরুষের হবে বৈকুণ্ঠেতে ঠাঁই ॥
এত কহি ব্রাহ্মণের প্রতি তাকাইয়া।
বলে বিপ্র হরি বল আমারে মারিয়া ॥
তোমার কঠিন হিয়া মরুস্থলী প্রায়।
রসাল হউক আজি কৃষ্ণের কৃপায় ॥
মোরে মার তাহে বিপ্র কোন ক্ষতি নাই।
একবার হরে কৃষ্ণ মুখে বল ভাই।
শুনি হেন বাক্য বিপ্র কাঁদিয়া উঠিল ॥
ভয়েতে প্রস্রাব বস্ত্রে করিয়া ফেলিল।
ভয়ে জড় সড় বিপ্র দেখিতে না পায়।
আনন্দে আকুল হয়ে পড়িল ধরায় ॥
প্রভুর প্রভাবে বিপ্র আকুল হইয়া।
দুই হাতে দুই পদ ধরিল চাপিয়া ॥
বিপ্র বলে দয়াময় নিবেদি তোমারে।
নরক হইতে ত্রাণ করহ আমারে ॥

অপরাধ করে বড় পাইয়াছি ভয়।
কৃপা করি অপরাধ ক্ষম দয়াময় ॥
না বুঝিয়া কত কথা বলেছি তোমারে।
দণ্ড দাও রক্ষা কর যে হয় বিচারে ॥

ব্রাহ্মণের দৈন্য দেখি গোরা বিনোদিয়া।
হরিনাম সুধা কর্ণে দিলেঃ ঢালিয়া ॥
কৃতার্থ হইল বিপ্র শুদ্ধ হৈল মন।
বিদায় লইল শেষে ধরিয়া চরণ ॥
পাষণ্ড ব্রাহ্মণে প্রভু করিয়া উদ্ধার।
ঋষিকুল্যা নদীতীরে হৈল আগুসার।
নদীর উভয় তীরে বহু ঋষি থাকে।
সবে মিলি অভ্যর্থনা করিল গোরাকে ॥
যবে প্রভু ঋষিকুল্যা নদীতে আইলা।
এই বার্ত্তা ক্রমে গিয়া পুরীতে পৌছিলা ॥
তিন রাত্রি থাকি প্রভু ঋষিকুল্যা ধামে।
ঋষিকুল্যা পবিত্র করিলা হরিনামে ॥

আলালনাথের কাছে প্রভু যবে আসে। *
গদাধর মুরারি ছুটিয়া আইল পাশে ॥
খঞ্জন আচার্য্য আসে গাঢ় অনুরাগে।
খোঁড়া বটে তবু আইসে সকলের আগে ॥
সার্ব্বভৌম আসে দুই ডঙ্কা বাজাইয়া।
নরহরি দেখা দেয় নিশান লইয়া ॥

* চৈতন্যচরিতামৃতেও আছে যে আলালনাথে সংবাদ পাইয়া পরিকরেরা আসিয়া জুটিয়াছিলেন।

জগদানন্দ দামোদর পণ্ডিত মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিল দেহে না ধরে আনন্দ ॥
গোপীনাথাচার্য্য চলে আনন্দিত হঞা।
প্রভুরে মিলিল সবে পথে লাগ পাঞা ॥
প্রেমাবেশে সবা কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে সবে করে আনন্দে কীর্ত্তন ॥
সার্ব্বভৌম ভটাচার্য্যে আনন্দে চলিলা।
সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিলা ॥
মধ্য, ৯ম পঃ ১৬৯।১৭১

হরিদাস রামদাস আর কৃষ্ণদাস।
ব্যগ্র হয়ে আসে সবে ঘন বহে শ্বাস॥
জগন্নাথ দাস আর দেবকী নন্দন।
ছোট হরিদাস আর গায়ক লক্ষ্মণ॥
বিষ্ণুদাস পুরীদাস আর দামোদর।
নারায়ণ তীর্থ আর দাস গিরিধর॥
গিরি পুরী সরস্বতী অসংখ্য ব্রাহ্মণ।
প্রভুরে দেখিতে সবে করে আগমন॥
রামশিঙা বাজাইতে বড়ই পণ্ডিত।
বলরাম দাস আসে হয়ে পুলকিত॥
শত শত পণ্ডিত গোঁসাই দেখা দিল।
আনন্দে আমার চিত্ত নাচিতে লাগিল।
কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ গান গায়।
এক মুখে সে আনন্দ কহনে না যায়॥
হাজার হাজার লোক প্রভুকে ঘেরিয়া।
নাম আরম্ভিলা সবে আনন্দে মাতিয়া॥
মুরারি মুকুন্দে প্রভু কোল দিতে গেলা।
হাঁটুর নিকটে গুপ্ত ঢলিয়া পড়িলা॥

সিদ্ধ কৃষ্ণদাস আসি প্রণাম করিল।
হাত ধরি তুলি তাঁরে প্রভু আলিঙ্গিল॥
একত্র মিলিয়া আর আর ভক্তগণ।
প্রভুকে লইতে সবে করে আগমন॥
মাদল বাজায় যত বৈষ্ণবের দল।
আনন্দে করয়ে প্রভুর আঁখি ছল ছল॥
কীর্ত্তন করয়ে যত বৈষ্ণব মিলিয়া।
মাথা ঢুলাইয়া নাচে গোরা বিনোদিয়া॥
খঞ্জনে দেখিয়া প্রভু দিয়া হরি বোল।
দুই বাহু পশারিয়া তারে দিলা কোল॥
নাচিতে লাগিল গোরা বাহু পশারিয়া।
সার্ব্বভৌম পদতলে পড়িল লুটিয়া॥
হাত জোড়ি সার্ব্বভৌম কহিতে লাগিল।
তোমার বিরহবাণ হৃদয়ে বিন্ধিল॥
বড় মূঢ় বলি তব বিরহ সহিয়া।
এতদিন আছি মুহি পরাণ ধরিয়া॥

দয়া করি পদতলে দল মোর দেহ।
তবে ত জানিব প্রভু মোর প্রতি স্নেহ॥
এত বলি সার্ব্বভৌম গড়াগড়ি যায়।
তাহারে তুলিয়া আলিঙ্গয়ে গোরা রায়॥
এইরূপে হরিধ্বনি করিতে করিতে।
প্রভুরে লইয়া সবে চলিলা পুরীতে॥
শ্বেত নীল বিচিত্র পতাকা শত শত।
গুড় গুড় শব্দ করি ডঙ্কা বাজে কত॥
কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দে মাতিয়া।
এক দৃষ্টে কত লোক রহিল চাপিয়া॥
হেলিতে দুলিতে যায় শচীর দুলাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥
হস্ত তুলি নাচিতে লাগিল গদাধর।
রঘুনাথ দাস নাচে আর দামোদর॥
প্রভু পুছে রঘুনাথে আদর করিয়া।
বড়ই আনন্দ পাই তোমারে দেখিয়া॥
রঘুনাথে কোল দিতে যান গোরা রায়।
রঘুনাথ পদতলে পড়িয়া লুটায়॥

মাঘের তৃতীয় দিনে মোর গোরা রায়।
সাঙ্গোপাঙ্গ সহ মিলি পুরীতে পৌঁছায়॥
অপরাহ্ণে মহাপ্রভু পুরীতে পৌঁছিলা।
কোটি কোটি লোক তথা আসি ঝাঁকি দিলা॥
ধূলাপায় প্রভু বহু লোক করি সাথ।
হেরিলেন মন্দিরে প্রবেশি জগন্নাথ॥
এক দৃষ্টে মহাবিষ্ণু দেখিতে দেখিতে।
দর দর প্রেম অশ্রু লাগিল বহিতে॥
একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়ে গোরা রায়।
অমনি আছাড় খেয়ে পড়িল ধরায়॥
এলাইল জটাজুট খসিল কৌপীন।
ধূলায় ধূসর তনু যেন অতি দীন॥
চারিদিকে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ।
সার্ব্বভৌম ক্রোড়ে তুলে করিলা ধারণ
লোমাঞ্চিত কলেবর কদম্বের প্রায়।
বহিতে লাগিল ঘর্ম্ম সহস্র ধারায়॥

চেতনা পাইয়া প্রভু উঠে দাঁড়াইলা।
একদৃষ্টে মহাবিষ্ণু দেখিতে লাগিলা ॥
সার্ব্বভৌম বলে প্রভু দেখি নিজরূপ।
উথলিয়া উঠিল তোমার ভাবকূপ ॥
আপনার মূর্ত্তি দেখি লোক শিখাইতে।
মহাভাবে মত্ত হয়ে লাগিলা কান্দিতে ॥
সম্মুখে অচল বিষ্ণু তুমি ত সচল।
তবে কেন কান্দি প্রভু কর বহু ছল ॥
তুমি ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
তবে কেন অন্ধ কর আমার নয়ন ॥
যে না বুঝে তার কাছে কর ভারি ভূরি।
মোর কাছে নিজরূপ না করিহ চুরি ॥
গোবর্দ্ধনধারী তুমি বৃন্দাবনপতি।
গোপীর জীবন তুমি অগতির গতি ॥
জনমিলে যদুবংশে তারা না চিনিল।
দুর্ভাগা যাদবগণ কিছু না বুঝিল ॥
হাতে পেয়ে না ছাড়িব মুহিত তোমারে।
বংশী ধরি নিজরূপ দেখাও আমারে ॥
তব বক্ষে স্বর্ণ পাঞ্চালিকা আছে লেখা।
যার তেজে কালরূপ নাহি যায় দেখা ॥

প্রভু বলে সার্ব্বভৌম আর কথা কহ।
আতাল পাতাল কথা কেন না বলহ ॥
মিছে ব্যগ্র হয়ে কেন কহ নানা বাত।
শুনিয়া তোমার বাক্য কর্ণে দেই হাত ॥
আমারে কহিয়া তুমি ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
কেন মোরে অপরাধী কর অকারণ ॥
তব মুখে কৃষ্ণকথা অমৃত সমান।
কহ ভট্ট কৃষ্ণকথা জুড়াক পরাণ ॥
ভট্ট বলে যাহা বলাইবে প্রভু তুমি।
তাহা ভিন্ন কি কহিব নর-পশু আমি ॥
প্রভু বলে বহু বাক্যে আর কাজ নাই।
চল আজি স্বস্থানেতে সবে মিলে যাই ॥
আরতি দেখিয়া কাশী মিশ্রের সদনে।
উপনীত হৈলা আসি সাঙ্গোপাঙ্গ সনে ॥

হেনকালে সার্ব্বভৌম প্রসাদ লইয়া।
সেইখানে উপনীত হইল আসিয়া ॥
প্রসাদ বন্টন করে গোরা বিনোদিয়া।
সকলে আনন্দ করে প্রসাদ পাইয়া ॥
প্রকাণ্ড আঙ্গিনা কাশী মিশ্রের সদনে।
বহুতর লোক আসে প্রভু দরশনে ॥
থাকিয়া মিশ্রের গৃহে গোরা দয়াময়।
পরম আনন্দে নিত্য কৃষ্ণগুণ গায় ॥
কত লোক আসে যায় কহিব কেমনে।
নিত্য নব নব সুখ মিশ্রের ভবনে ॥
লোক মুখে শুনিয়া প্রভুর আগমন।
কত গৌড়বাসী আসে করিতে দর্শন ॥
প্রসাদ আনয়ে নিত্য ভট্ট মহাশয়।
প্রসাদ পাইয়া প্রভুর আনন্দ উদয় ॥
আনন্দে প্রসাদ লয়ে গোরা বিনোদিয়া।
সকলের হাতে দেন প্রসাদ বাটিয়া ॥
নাম-সঙ্কীর্ত্তন হয় প্রসাদের আগে।
সকলে প্রসাদ খায় প্রেম অনুরাগে ॥
ধন্য হইলাম আজি এই কথা বলি।
আনন্দে সকলে নাচে দিয়া করতালি ॥
রামানন্দ বসু আর গোবিন্দ চরণ।
বিদায় লইয়া গৌড়ে করিলা গমন ॥
পুনরায় গৌরাঙ্গের দরশন লাগি।
শত শত লোক আসে হৈয়া অনুরাগী ॥
শ্রীবাস কেশব দাস সিদ্ধ হরিদাস।
সকলে মিলিয়া আসে চৈতন্যের পাশ ॥
শান্তাচার্য্য বিপ্রদাস রূপ সনাতন।
ঝাঁকি বাঁধি আইলা করিতে দরশন ॥
আনন্দে মাতিয়া সবে হরিনাম করে।
দয়াল চৈতন্য ভক্তি দেন ঘরে ঘরে ॥
কে লবে রে হরিনাম এস মোর ভাই।
ইহা বলি হরিনাম বিলায় নিমাই ॥
পাপী তাপী না রহিল প্রভুর কৃপায়।
হরিনাম দেন প্রভু যথায় তথায় ॥

মহাতীর্থ পুরী হৈল আনন্দের ধাম।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ করে হরিনাম॥
পশু পক্ষী নাচে নাম শ্রবণে শুনিয়া।
সম্মুখে সমুদ্র নাচে বাহু পশারিয়া॥
বুড়া নাচে যুবা নাচে নাচে শিশুগণ।
কুলবধূ পথে আসি করে দরশন॥
একদিকে নদীপতি নাচিতে লাগিল।
অন্যদিকে প্রেমসিন্ধু উথলি উঠিল॥
যেন প্রেমে মত্ত হয়ে বৃক্ষ লতাগণ।
হিম পাত ছলে করে অশ্রু বরষণ॥
নিত্য নব নব সুখ পুরীর মাঝারে।
যে দেখেছে সেই জানে কহিব কাহারে॥
বাজিছে মৃদঙ্গ ভেরী আর করতাল।
তার মধ্যে নাচে মোর শচীর দুলাল॥

বড় পটু রামদাস ভেরী বাজাইতে।
এইজন্য নিত্য আসে কীর্ত্তনের ভিতে॥
বড় ভক্ত রামদাস প্রেম অনুরাগে।
ভেরী বাজাইয়া চলে কীর্ত্তনের আগে॥
আনন্দে প্রতাপরুদ্র ছাড়ি রাজ্যপাট।
মিশ্রের ভবনে আসি নিত্য দেখে নাট॥
নগর কীর্ত্তনে যবে মহাপ্রভু যায়।
দীনবেশে মহারাজ পেছু পেছু ধায়॥
দুই হস্ত উর্দ্ধে তুলি অঙ্গ এলাইয়া।
নাচি নাচি যায় প্রভু প্রেমেতে মাতিয়া॥
আধ নিমীলিত চক্ষে উর্দ্ধভাগে চায়।
আছাড় খাইয়া কভু পড়য়ে ধরায়॥
হরিনামে মত্ত সবে কিবা নর নারী।
মত্ত হয়ে কুলবধূ ধায় সারি সারি॥
হাজার হাজার লোক চলে চারি ভিতে।
আগে আগে প্রভু যান নাচিতে নাচিতে॥
এইরূপে নাম করি দিবস কাটায়।
রায় সহ নিরজনে রজনী গোঁয়ায়॥
একদিন মহাপ্রভু কৃষ্ণ অনুরাগে।
মহাবিষ্ণু ধরিতে ধাইলা আগে ভাগে॥

কোন বাধা নাহি মানে অনুরাগে ধায়।
সম্মুখেতে আড়ি বাধি পড়িলা ধরায়॥
সেই দিন হৈতে প্রভু না যায় মন্দিরে।
দূর হৈতে প্রতিদিন দরশন করে॥
দাণ্ডাইয়া প্রভু ভোগ-মন্দিরের দ্বারে।
এক দৃষ্টে মহাবিষ্ণু দরশন করে॥
গরুড়ের স্তম্ভোপরি বাম হস্ত দিয়া।
দরশন করে প্রভু প্রেমেতে মাতিয়া॥
এইরূপে কিছু দিন থাকিয়া পুরীতে।
অনুরাগে জগন্নাথ লাগিলা দেখিতে॥
একদিন প্রভু মোর মিশ্রের ভবনে।
কৃষ্ণগুণ গান করে ভক্তগণ সনে॥
গোবিন্দ বলিয়া মোরে ডাক দিয়া পাছে।
যাইতে কহিলা মোরে আচার্য্যের কাছে॥
আজ্ঞা মাত্র পত্র সহ বিদায় লইয়া।
শান্তিপুরে যাত্রা করি প্রণাম করিয়া॥
পৃষ্ঠে হাত দিয়া প্রভু আশিস্ করিল।
মোর চক্ষে শত ধারা বহিতে লাগিল॥
প্রভু বলে নাহি কান্দ প্রাণের গোবিন্দ।
আচার্য্যে আনিয়া হেথা করহ আনন্দ॥
এই বাক্য শুনি মোর চক্ষে বারি বহে।
প্রভুর বিরহ বাণ প্রাণে নাহি সহে॥
প্রভুর বিরহ বেগ সহিব কেমনে।
নিদারুণ কষ্ট আসি উপজিল মনে *॥

(খণ্ডিত)

---

* ইহার পরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার কতকটা আভাষ চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে পাওয়া যায়। কিন্তু বেশী পাওয়া যায় প্রেম দাস-কৃত চৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদীতে।

শব্দসূচী

শব্দসূচী

প

ভ

ম

র

ল

ব

শ

স

হ

ভূমিকার প্রুফ অসুস্থতা-নিবন্ধন আমি দেখিতে পারি নাই, এজন্য তাহাতে অনেক ভুল রহিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে গুরুতরগুলি নিম্নে প্রদত্ত শুদ্ধিপত্রে নির্দিষ্ট হইল। মূল পুস্তকেও পূর্ব্বোক্ত কারণে কিছু কিছু ভুল রহিয়া গিয়াছে। আশা করি পাঠকগণ তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

ভূমিকার শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা পংক্তি			
৯—১০	পুর্ব্বে	স্থলে	পূর্ব্বে
„—১৫	মুগ্ধ	„	মুগ্ধ
১১—২৪	উচ্ছাস	„	উচ্ছ্বাস
১৫—২	পাণ্ড	„	পাণ্ডু
„—১২	চাক্ষুস	„	চাক্ষুষ
১৮—(পাদটীকায়)			
	genrations	„	generations
„—২৫	উড়ায়া	„	উড়াইয়া
২৩—১	আন্দলনের	„	আন্দোলনের
২৫—২	চুড়িয়া একাকাব	„	চূরিয়া একাকার
২৭—২	মুর্ত্তি	„	মূর্ত্তি
২৮—৩	সস্ত্র	„	শস্ত্র
৩০—৯	লজ্জতা	„	লজ্জিতা
৩২—২৩	সতেরে	„	সত্যেরে
„—২৪	প্রভুর	„	প্রভুর
„—২৫	পরে	„	পড়ে
„—২৬	প্রভূ	„	প্রভু
৩৬—১৬	সুপ্রসিদ্ধ	„	সুপ্রসিদ্ধ

পৃষ্ঠা পংক্তি			
৩৬—১৮	হিরিকে	স্থলে	হিড়িকে
৪২—৯	দাক্ষিণ্যাতে	„	দাক্ষিণাত্যে
৬১—৮	আখ্যত	„	আখ্যাত
৬২—৫	মীমাংশা	„	মীমাংসা
৬৩—১৩	শাস্ত্রকুসলী	„	শাস্ত্রকুশলী
৬৪—২৫	পাদোটীকার	„	পাদটীকার
৬৭—৭	৯ ফিট	„	৮ ফিট
৬৯—১	শিকর	„	শিকড়
„—২৬	অরাধ্যের	„	আরাধ্যের
৭১—৫	উচ্ছাসিত	„	উচ্ছ্বসিত
৭২—৭	সম্পুর্ণ	„	সম্পূর্ণ
„—১৭	মৃত্যু	„	মৃত্যু
„—২১	মহাপ্রকে	„	মহাপ্রভুকে
„—২২	সম্বন্ধে	„	সম্বন্ধে
„—২৬	আবাস্তর	„	অবান্তর
৭৩—২৪	স'ঙ্গে	„	সঙ্গে
৭৯—৫	লোকেরই	„	লোকেরও
৮৩—৩	স্বাতন্দ্র্য	„	স্বাতন্ত্র্য